গীতা চট্টোপাধ্যায়
বিজয় চট্টোপাধ্যায়
স্বজনেষু

লেখকের অন্যান্য বই

আকাশের নীচে মানুষ
মানুষের মহিমা
অতল জলের দিকে
মন্দ মেয়ের উপাখ্যান
সম্পর্ক
এক নায়িকার উপাখ্যান
এই ভুবনের ভার
ইস্পাতের ফলা
শান্তিপর্ব
মানুষী
অদিতির উপাখ্যান
সাধ-আহ্লাদ
চরিত্র
যুদ্ধযাত্রা
দুই দিগন্ত
জন্মভূমি
আলোছায়াময়
দায়দায়িত্ব
হৃদয়ের ঘ্রাণ
আক্রমণ
অন্ধকারে ফুলের গন্ধ
মানুষের জন্য
দায়বদ্ধ
চতুর্দিক
রামচরিত্র
ধর্মান্তর
সত্যমিথ্যা
মাটি আর নেই
মোহানার দিকে
বাঘবন্দী

স্বর্গের ছবি
একাকী অরণ্যে
বিন্দুমাত্র
শীর্ষবিন্দু
রাবণবধ পালা
তিনমূর্তির কীর্তি
সেনাপতি নিরুদ্দেশ
পাগল মামার চার ছেলে
হীরের টুকরো
আমাকে দেখুন ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ
আমাকে দেখুন (অখণ্ড)
সুখের পাখী অনেক দূরে
রৌদ্রঝলক
শঙ্খিনী
আমার নাম বকুল
নয়না
নিজের সঙ্গে দেখা
আলোয় ফেরা
পূর্বপার্বতী
মহাযুদ্ধের ঘোড়া ১ম, ২য়
সিন্ধুপারের পাখি
নোনাজল মিঠে মাটি
শ্রেষ্ঠ গল্প
স্বনির্বাচিত গল্প
গল্পসমগ্র ১
অনুপ্রবেশ
মোহর
ক্রান্তিকাল

লোকাল ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় জানালার ধার ঘেঁষে দূরমনস্কর মতো বসে আছেন নিখিলেশ—নিখিলেশ মজুমদার। তাঁর চোখদুটো বাইরের দিকে ফেরানো।

মার্চ মাস শেষ হতে চলল। এর মধ্যেই রীতিমতো গরম পড়তে শুরু করেছে। অন্যদিন আকাশের দিকে তাকানো যায় না। রোদের তাতে সেটা যেন ঝলসাতে থাকে। তপ্ত বাতাস সারা গায়ে আগুন মেখে এলোপাথাড়ি ছুটে যায়।

আজ কিন্তু রোদের ঝাঁঝ তেমন তীব্র নয়। আকাশের কোণে কোণে ঘন কালো কিছু মেঘ এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে। সেগুলোর আড়ালে সূর্যটা মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যে রোদটুকু আসছে তার উগ্রতা অনেক কম। আবহাওয়া অফিস সেই পরশু থেকে জানান দিচ্ছে, বঙ্গোপসাগরে হঠাৎ নাকি নিম্নচাপের সৃষ্টি হওয়ায় দু-একদিনের ভেতর কয়েক পশলা জোরালো বৃষ্টি হবে। আকাশের মেঘপুঞ্জের দিকে তাকালে মনে হয়, ভবিষ্যদ্বাণীটা সফল হলেও হতে পারে।

জানালার বাইরে যতদূর চোখ যায়, ধু ধু ফসলের মাঠ। আমন ধান শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়েছিল। তারপর রবিশস্যের মরসুমও শেষ। উঁচু আল দিয়ে ঘেরা চৌকো, তেকোণা, ছ'কোণা ইত্যাদি নানা মাপের ফাঁকা জমিগুলো নানারকম জ্যামিতিক নকশার মতো দেখাচ্ছে। শস্যহীন মাঠের ওপর দিয়ে বুনো শালিক বা টিয়ার ঝাঁক এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছে। বাতাসে ডানা মেলে অলসভাবে দাঁড় টানা ছাড়া তাদের যেন কোথাও যাবার তাড়া নেই। অনেক দূরে, মাঠ যেখানে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে, উঁচু উঁচু অসংখ্য গাছ সেখানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। মনে হয়, কেউ যেন ব্রাশ টেনে গাঢ় সবুজ রঙের মোটা একটা লাইন টেনে দিয়েছে।

কামরাটায় ঠাসাঠাসি না হলেও মোটামুটি ভিড় রয়েছে। মেঝেতে প্রচুর পোড়া বিড়ি আর সিগারেটের টুকরো, খালি দেশলাই-বাক্স আর সিগারেটের প্যাকেট, ধুলোবালি, ছেঁড়া কাগজ, ডাবের খোলা, কলার খোসা ছড়ানো। কামরাটা কস্মিনকালেও সাফ করা হয় কিনা সন্দেহ।

এবার নিখিলেশ মজুমদারের দিকে তাকানো যেতে পারে। তাঁর বয়স তেষট্টি চৌষট্টি। মাঝারি হাইটের তেলতেলে, মসৃণ চেহারা। লম্বাটে, ভরাট মুখ তাঁর। চওড়া কপাল, দৃঢ় চিবুক। এই বয়সেও মাথায় প্রচুর কাঁচাপাকা চুল, টান টান ত্বক এতটুকু কুঁচকে যায়নি। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, পায়ে স্ট্র্যাপ দেওয়া চপ্পল। চোখে পুরু ফ্রেমের দামি চশমা। নিখিলেশকে দেখামাত্র টের পাওয়া যায়, মানুষটি খুব সাধারণ নন। তাঁর তাকানো, বসার ভঙ্গি — এ সবের মধ্যে রয়েছে প্রখর এক ব্যক্তিত্ব। অন্য প্যাসেঞ্জারদের থেকে তিনি যে আলাদা, সেটা বলে না দিলেও চলে।

কামরার ভেতর কোথাও তাসের আড্ডা বসেছে। কোথাও রাজনীতি নিয়ে চিৎকার এবং পালটা চিৎকার। একধারে চলছে ফুটবল আর ক্রিকেট নিয়ে তুমুল হইচই। আরেক

ধারে সিনেমা নিয়ে প্রচণ্ড উত্তেজনা। শচীন তেণ্ডুলকার, ব্রায়ান লারা, মার্ক ওয়া, রোনাল্ডো, রোমারিও, বাতিস্তুতা, শাহরুখ খান, কাজল, মাধুরী দীক্ষিত — এইসব বিখ্যাত তারকার নাম সারা কামরায় বিস্ফোরণের মতো ফেটে ফেটে পড়েছে। এরই ফাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে হানা দিচ্ছে হকার। 'চাই গরম সিঙাড়া নিমকি', 'চাই সেফটি পিন, চুলের ফিতে, তরল আলতা, মাথার কিলিপ' কিংবা 'চাই শনি-সত্য নারায়ণের পাঁচালি, গোপাল ভাঁড়ের রসাল গল্প, ব্রত-কথা, পকেট পঞ্জিকা' ইত্যাদি। হকার ছাড়াও দেখা দিচ্ছে অগুনতি ভিখিরি। তাদের ভিক্ষে চাওয়ার হাজার রকম পদ্ধতি। কেউ ভাঙা চেরা চেরা গলায় গাইছে পুরনো রামপ্রসাদী, কেউ মাজা দুলিয়ে লেটেস্ট হিন্দি ফিল্মের চটকদার গান। কেউ এসব শিল্পকর্মের ভেতর না গিয়ে সোজাসুজি হাত পাতছে, 'অন্ধ নাচার বাবা, আপনারা দয়া না করলে বাঁচব না।' কেউ বলে, 'আমার স্বামী ক্যান্সারে ভুগছে বাবা। আপনারা না দেখলে ছেলেমেয়ে নিয়ে ভেসে যাব।' কেউ কৌটো নাড়ে, 'দাদারা, কাকারা, দিদিরা, মাসিমারা, আমাদের কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আপনাদের মুখ চেয়ে আছি। বাঁচান।' সব মিলিয়ে চারিদিক একেবারে সরগরম।

নিখিলেশ ঠায় একভাবেই বসে আছেন। কামরার ভেতরের বা বাইরের কোনও কিছু সম্পর্কেই তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। প্যাসেঞ্জারদের হই-হল্লা, ফেরিওলাদের ডাক, বা বাইরের অবারিত ফাঁকা মাঠের দৃশ্য তাঁর মস্তিষ্কে এতটুকু রেখাপাত করতে পারছে না। চারপাশের এই সব মানুষজন, এত শব্দসমষ্টির সঙ্গে তাঁর আদৌ সম্পর্ক নেই। সমস্ত কিছুই কেমন যেন অপরিচিত, অসংলগ্ন, যোগাযোগহীন। খুব বিক্ষিপ্তভাবে সেগুলো তাঁকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

নিখিলেশ তালবনিতে যাচ্ছেন। কলকাতা থেকে পাঁচাত্তর কিলোমিটার দূরের ওই শহরটায় মোটরেও যাওয়া যায়। চমৎকার একটা হাইওয়ে ওটার পাশ দিয়ে চলে গেছে। স্ত্রী-মেয়ে-জামাই-ভাগনী এবং দুই ছেলে তাঁদের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত টোয়োটা বা মারুতি-জেনে চড়ে ওঁকে আসতে বলেছিল। তারা সঙ্গেও আসতে চেয়েছিল। কেননা তাঁর মতো একটি মানুষের নিরাপত্তার কারণে একা কোথাও যাওয়া ঠিক নয়। নিখিলেশ এই শুভানুধ্যায়ীদের কথা কানেও তোলেন নি, কাউকে সঙ্গেও আনেননি। একরকম জেদ করেই একা একা লোকাল ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেমীর কামরায় উঠে বসেছেন।

গত পনেরো বছরে একবারও তিনি লোকাল ট্রেনে তালবনিতে যাননি। যা পনেরো কুড়ি বার গেছেন, তাও মোটরে। অঢেল আরাম এবং সুখে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া, নিখিলেশ এরকম কষ্টদায়ক ট্রেনযাত্রা বেছে নিলেন কেন? এর পেছনে সুচতুর একটি পরিকল্পনা রয়েছে। ট্রেনটা ঠিকঠাক চললে তালবনিতে পৌনে পাঁচটায় পৌঁছে যাবে। এই গরম কালে সন্ধে নামে দেরিতে। পৌনে পাঁচটায় যথেষ্ট আলো থাকবে। তাঁকে সেকেণ্ড ক্লাস কামরা থেকে গাদা গাদা প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে নামতে দেখলে তালবনির বাসিন্দারা ভাবতে পারে, তিনি সাধারণ মানুষেরই একজন। জনগণ থেকে নিজেকে একবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন নি। এই চালটা কতদূর কার্যকর হবে সে সম্পর্কে নিখিলেশের নিজের মনেই যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। তবু কোনও একটা জায়গা থেকে নতুন করে শুরু তো করতে

হবে। এই আরম্ভটা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত জরুরি, খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পাশের যাত্রীদের জামা-কাপড় থেকে হাওয়ার ঝাপটায় ঘামের উৎকট গন্ধ নাকে এসে লাগছে। তা ছাড়া কান-ফাটানো চিৎকার চেঁচামেচি তো রয়েছেই। পর্যাপ্ত আরামে নিখিলেশের গত পনেরো বছর কেটেছে, পৃথিবীর নোংরা মাটিতে ক'বার তাঁর পা পড়েছে, গুনে বলে দেওয়া যায়। বাড়ির বাইরে বেরুলে অ্যাম্বাসাডর, ফিয়েট বা তার চেয়েও দামি কোনও গাড়ি। বম্বে দিল্লি যেতে হলে বেশির ভাগ সময়ই প্লেনে, ক্বচিৎ কখনও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্রেনে। দেশের বাইরে যেতে হলে নাম-করা এয়ারলাইন্সের এক্সক্লুসিভ ক্লাশে। তাঁর পক্ষে ভাঙাচোরা চেহারার খাপচা খাপচা দাড়িওলা সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রীদের ঘামের গন্ধ বা হল্লা এক মিনিটও সহ্য করা সম্ভব নয় কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় ওঠার পর তাঁর সহনশীলতা কোনও অলৌকিক নিয়মে হঠাৎ যেন বেড়ে গেছে। যে উদ্দেশ্যে এত কাল বাদে কষ্টকর ট্রেনযাত্রাটা তিনি বেছে নিয়েছেন তার জন্য বিরাট পরিমাণে যা দরকার তা হল ধৈর্য এবং অপার সহিষ্ণুতা।

জানালার বাইরে চোখ রেখে তালবনির কথাই ভাবছিলেন নিখিলেশ। ওটা তাঁর নির্বাচন কেন্দ্র। প্রথম তিনবার তিনি ওখান থেকে বিপুল ভোটে জিতেছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছেন। প্রথম বার জেতার পর পাঁচ বছর তিনি এম এল এ হয়েই ছিলেন। দ্বিতীয় বার জিতে আসার পর মন্ত্রী হয়েছেন। তৃতীয় বারও তাই। খুব গুরুত্বপূর্ণ পোর্টফোলিও দু'বারই তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু চতুর্থ বার, অর্থাৎ গত জানুয়ারিতে যে নির্বাচন হয়েছে তার রেজাল্টটা চমকে দেবার মতো। একটানা তিনবার জেতার পর এবার তিনি হেরে গেছেন। যেমন তেমন হার নয়, তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর চেয়ে এক লাখ দশ হাজারেরও বেশি ভোট পেয়েছেন। বিধানসভা নির্বাচনে সর্বোচ্চ হারের যে সব রেকর্ড আছে, সেই তালিকায় এটিও যুক্ত হবে।

নিখিলেশ সম্পর্কে একটা 'মিথ' চালু আছে। তালবনিতে তিনি নাকি অপরাজেয়—ইনভিনসিবল। একই নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে পরপর তিনবার জেতা অভাবনীয় ব্যাপার। সেই অসাধ্য সাধনাটা তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। পনেরো বছর ধরে তালবনির ওপর দিয়ে তিনি যেন অশ্বমেধের দুরন্ত ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

খবরের কাগজওলারা লিখত, তালবনি হচ্ছে নিখিলেশের দুর্গ। এখানে তিনি নিজে না দাঁড়িয়ে যদি একটা ল্যাম্প পোস্টকেও দাঁড় করান, লোকে চোখ বুজে সেটাকেই ভোট দেবে। হঠাৎ কী এমন হয়েছে যাতে জনপ্রিয়তার সুউচ্চ মিনার থেকে তাঁর এরকম শোচনীয় পতন ঘটল!

ট্রেন এক একটা স্টেশনে থামে, বেশ কিছু যাত্রী নামিয়ে অল্প কয়েকজনকে তুলে ফের উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। গাড়ি যত তালবনির দিকে এগুচ্ছে, কামরা ক্রমশ ফাঁকা হয়ে আসছে।

নিখিলেশ লক্ষ করেননি, দু'টি যুবক এক কোণে বসে অনেকক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে আর নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে। দু'জনের চোখেমুখে বিস্ময়

তো রয়েছেই, তার চেয়ে বেশি যা আছে তা হল বিদ্বেষ। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় নিখিলেশকে দেখেও যেন ওরা বিশ্বাস করতে পারছে না। পৃথিবীতে এখনও মিরাকল তা হলে ঘটে! ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাস কামরায় নিখিলেশের ওঠাটা তেমনই একটা অভাবনীয় ঘটনা, অন্তত ওই যুবক দু'টির চোখে।

নিখিলেশ নিজের ভাবনার মধ্যে ডুবে ছিলেন। এবার তাঁর হারটা দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। খবরের কাগজওলারা তাদের নিজেদের মতো করে এর কারণ খুঁজতে চেষ্টা করেছে। তিনি যে রাজনৈতিক দলের মেম্বার তাদের ব্যাখা আরেক রকম। ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনরা যেভাবে বিশ্লেষণ করেছে তার সঙ্গে অন্যদের মতামত আদৌ মেলে না। স্ত্রী ছেলেমেয়ে এবং জামাইও এই পরাজয় সম্পর্কে তাদের ধারণা জানিয়ে দিয়েছে। চুপচাপ সব শুনেছেন নিখিলেশ, খবরের কাগজের লেখাগুলো খুঁটিয়ে পড়েছেন। তারপর তালবনিতে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আসার আগে যোগেন মাস্টারকে একটা চিঠি দিয়ে স্টেশনে আসতে লিখেছেন। এছাড়া তালবনির আর কাউকে কিছু জানাননি।

বেলা পড়ে এসেছিল। সূর্য পশ্চিম আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে অনেকখানি নেমে গেছে। ছন্নছাড়া মেঘগুলো ক্রমশ পরস্পরের কাছাকাছি এসে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। কবজি উলটে ঘড়ি দেখলেন নিখিলেশ। এখন চারটে বেজে পঁয়ত্রিশ। আর দশ মিনিটের ভেতর ট্রেনটা তালবনিতে পৌঁছে যাবে।

নিখিলেশের গা ঘেঁষে যারা বসে ছিল, তারা কেউ নেই। আগের স্টেশনগুলোতে নেমে গেছে। পরপর বেশ কয়েকটা সিট এখন খালি।

যে যুবক দু'টি দূর থেকে নিখিলেশকে দেখছিল তাদের একজন বেশ ঢ্যাঙা। রোগা, ক্ষয়াটে চেহারা তার। মুখটা লম্বাটে, ভাঙা গালে খাপচা খাপচা, পাতলা দাড়ি। চুল উষ্কখুষ্ক, চোখের তলায় কালচে ছোপ। ওর চাউনির ভেতর একটা বেপরোয়া ভঙ্গি আছে। দ্বিতীয় যুবকটি অতটা লম্বা নয়। তার মুখটা গোল, দাড়ি গোঁফ কামানো। প্রথম যুবকের মতো অতটা না হলেও সেও রোগা। তার কণ্ঠার হাড় চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে। তার চোখের দৃষ্টি তুলনায় শান্ত। দু'জনের বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। সারা গায়ে অপুষ্টি আর দারিদ্র্যের ছাপ। পরনে সস্তা ছিটের আধময়লা শার্ট আর ফুল প্যান্ট। একজনের পায়ে খেলো চটি, আরেক জনের তালি-মারা পুরনো বুট।

নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঢ্যাঙা যুবকটি উঠে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় যুবকটি নিচু গলায় বলে, 'না না, ঝামেলার দরকার নেই ললিত।'

প্রথম যুবকটি অর্থাৎ ললিত বলে, 'দ্যাখ দীনেশ, এমন চান্স লাইফে আর পাব না। ওকে আজ ছাড়ছি না।'

'ট্রেনের ভেতর ঝঞ্ঝাট টঞ্ঝাট করিস না। একটা কথা মনে রাখিস—'

'কী?'

'এই ইলেকশনে হেরে গেলেও লোকটা দু দু'বার মন্ত্রী হয়েছিল। গোলমাল করলে বিপদে ফেলে দেবে।'

'ভয় পাচ্ছিস?' কর্কশ গলায় ললিত বলে, 'ওর তো আমাদেরই ভয় পাওয়া উচিত। মনে নেই, আমাদের কত স্বপ্ন টপ্ন দেখিয়েছিল।'

উত্তর না দিয়ে দীনেশ ললিতের হাত ধরে থামাতে চেষ্টা করে। কিন্তু পেরে ওঠে না।

ট্রেন মাঠের মাঝখান দিয়ে সোজা ছুটতে ছুটতে এখন যেখানে এসে পৌঁছেছে সেখান থেকে রেল লাইন আধখানা বৃত্তের আকারে বেঁকে গেছে। ফলে ট্রেনটাকেও ঘুরে যেতে হচ্ছে। এতক্ষণ রোদ কামরার ভেতর এসে পড়েনি। জানালার পাশে বসে বাইরের দৃশ্যাবলীর দিকে তাকিয়ে থাকতে তাই অসুবিধা হচ্ছিল না নিখিলেশের। কিন্তু এবার পশ্চিম দিক থেকে পড়ন্ত বেলার রোদ সরাসরি তাঁর মুখের ওপর এসে পড়েছে। আকাশে মেঘ থাকায় অন্যদিনের মতো অতটা না হলেও রোদে বেশ ঝাঁঝ রয়েছে। জানালার ধার থেকে সরে আসতে গিয়ে ললিত আর দীনেশকে দেখতে পেলেন নিখিলেশ। ওরা তাঁর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে, যদিও দীনেশ এখনও তার সঙ্গীর হাত ধরে টানাটানি করছে।

বেশ অবাক হয়ে দু'জনেক কয়েক পলক দেখে নিলেন নিখিলেশ। তারপর ললিতকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে তোমাদের?'

ললিত বলল, 'আমি স্যার, আপনার কাছে আসতে চাইছিলাম। ও কিছুতেই আসতে দেবে না। তাই একটু টানাহ্যাঁচড়া চলছে।'

'তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও?'

'হ্যাঁ। সেই জন্যেই তো আসা।'

নিখিলেশ উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

ললিত বলল, 'স্যার, আপনাকে তো কোনওদিন ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাসে চড়ে তালবনি আসতে দেখিনি। যখনই এসেছেন—হাইওয়ে দিয়ে, দামি মোটরে চড়ে।'

নিখিলেশ বললেন, 'সবসময় মোটরে করে যেতে হবে, এমন কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম কি আছে?'

দীনেশ এখন আর ললিতকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে না। সে তার হাতটা ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

'না, তা নেই।' ললিত এবার খুব নিষ্পাপ মুখ করে জিজ্ঞেস করল, 'এভাবে যেতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না?'

নিখিলেশের হঠাৎ কেমন একটা খটকা লাগে। ললিতের প্রশ্নটা বাইরে থেকে যতই নিরীহ মনে হোক না, ওটার ভেতরে কি বিদ্রূপ বা শ্লেষ লুকনো রয়েছে?

যারা রাজনীতির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের সব সময়ই মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভীষণ জরুরি। ললিতের প্রশ্নের উত্তরটা হেসে হেসে তিনি এভাবেই দিলেন, 'কষ্ট কিসের? দেশের কোটি কোটি মানুষ তো ট্রেনের সেকেণ্ড ক্লাসেই ট্র্যাভেল করে। সে যাক, মনে হচ্ছে তোমরা আমাকে চেনো।'

ললিত বলল, 'শুধু আমরা কেন, হোল কান্ট্রির লোক আপনাকে চেনে। খবরের কাগজে আপনার ছবি বেরোয়, টিভিতে আপনি ইন্টারভিউ দেন। আপনাকে চিনব না?

তবে —'

'তবে কী?'

'আপনাকে আমরা অন্য সবার চেয়ে একটু বেশি করেই চিনি স্যার।'

ছোকরা ঠিক কী বলতে চাইছে, তাঁকে কোনও অস্বস্তিকর প্রসঙ্গের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। নিখিলেশ দ্রুত ভেবে নিলেন, তাঁকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। মুখের হাসিটি তিনি বিলীন হতে দেননি। খুব শান্ত গলায় বললেন, 'বেশি করে চিনি— এই কথাটার মানে কী?'

ললিত বলল, 'খুব সিম্পল স্যার। আপনার নির্বাচন কেন্দ্র তালবনিতে আমরা থাকি। আমরা ওখানকার ভোটার।'

তালবনিতে থাকে, এটুকু বললেই তো হ'ত, তার সঙ্গে ভোটারটা জুড়ে দিল কেন? ছোকরা কি কোনও রকম তির্যক ইঙ্গিত দিতে চাইছে? নিখিলেশ ঠিক বুঝতে পারলেন না। হাসিমুখেই বললেন, 'সাবালক হলে ভোটদানের অধিকার তো পাওয়াই যায়।'

ললিত বলল, 'তিনটে ইলেকশানে আমরা আপনাকে ভোট দিয়ে আসছি।'

'অনেক ধন্যবাদ।' হাসিমুখে তাকিয়ে থাকেন নিখিলেশ।

ললিত এবার বলল, 'স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

নিখিলেশ বললেন, 'হ্যাঁ, ক'রো না—'

'আপনি কি আমাদের দু'জনকে আগে কখনও দেখেছেন?'

এ জাতীয় প্রশ্নের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না নিখিলেশ। তাঁর মসৃণ কপাল সামান্য কুঁচকে গেল। স্মৃতির ভেতর কিছুক্ষণ হাতড়ালেন। আবছাভাবে মনে হল, হয়ত দেখেছেন, কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত নন। বললেন, 'ঠিক মনে করতে পারছি না।'

ললিত বলল, 'সেটাই স্বাভাবিক। আমরা দেশের বিশাল 'মাস'-এর মধ্যে পড়ি। জনগণের মধ্যে একাকার হয়ে মিশে থাকি। আলাদা কোনও আইডেনটিটি আমাদের নেই স্যার। মনে থাকবে কী করে? তবু—'

কথাবার্তা শুনে নিখিলেশের ধারণা হল, ছেলেটা বেশ শিক্ষিত। জিজ্ঞেস করলেন, 'তবু কী?'

বিমূঢ়ের মতো ললিতকে লক্ষ করতে থাকেন নিখিলেশ।

ললিত বলল, 'কাজ গোছানো হলে কে আর কার কথা মনে রাখে? বিশেষ করে আপনাদের মতো পলিটিসিয়ানরা। আপনাদের একমাত্র পারপাস হল, আমাদের মতো ইয়াং ম্যানদের ইউজ করে এম এল এ, এম পি, কি মিনিস্টার হওয়া—'

ছেলেটার কণ্ঠস্বর একেবারে পালটে গেছে। তাকে অত্যন্ত দুর্বিনীত এবং মারমুখী দেখাচ্ছে। এই মাত্র যা সে বলল তা খুবই আক্রমণাত্মক। কলকাতা থেকে নিখিলেশ যখন ট্রেনে উঠেছিলেন, প্যাসেঞ্জারদের কেউ তাঁকে সেভাবে লক্ষ করেনি। দু-একজন হয়ত আবছাভাবে চিনতে পেরেছে কিন্তু একজন প্রাক্তন মন্ত্রী দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তাদের সহযাত্রী হতে পারেন, সেটা তাদের পক্ষে অভাবনীয়। তারা ধন্দে পড়ে ভেবে থাকতে পারে, একরকম চেহারার দু'জন মানুষ পৃথিবীতে বিরল নয়। নিখিলেশের মতো দেখতে

কেউ হয়ত তাদের পাশে বসে চলেছে।

বেশির ভাগ প্যাসেঞ্জারই নেমে গেছে। যে ক'জন আছে, ছোকরার চড়া গলার হইচই শুনে যদি এদিকে ছুটে আসে নিখিলেশের পক্ষে পরিস্থিতিটা খুবই বিশ্রী হয়ে উঠবে। ভেতরে ভেতরে তিনি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে ট্রেনে একা আসতে বার বার বারণ করেছিলেন। এখন মনে হচ্ছে, এরকম বিপজ্জনক অ্যাডভেঞ্চার করাটা আদৌ উচিত হয়নি। সঙ্গে দু-একজনকে নিয়ে এলে হয়ত ভাল হ'ত। কিন্তু এখন আর তা ভেবে লাভ নেই।

অনুনয়ের সুরে নিখিলেশ বললেন, 'ব'সো ভাই, ব'সো। আমার বয়স হয়েছে, অনেক সময় অনেক ইমপর্টান্ট কথাও ভুলে যাই। স্মৃতিশক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। প্লিজ কিছু মনে ক'রো না।'

ললিত বসল না। তবে গলার স্বর অনেকটা নামিয়ে বলল, 'লাস্ট দুটো ইলেকশানে আমি আর আমার এই বন্ধু আপনার জন্যে জান লড়িয়ে খেটেছিলাম। ভোটার লিস্ট তৈরি করা, দেওয়াল দখল করে আপনার আর আপনার আর পার্টির নাম লেখা, স্ট্রিট কর্নার মিটিং, রাত জেগে পোস্টার মারা থেকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ক্যামপেন করা — কী করিনি?'

চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা যেন সরে গেল। নিখিলেশ গাঢ় আবেগের সুরে বললেন, 'খুব অন্যায় হয়ে গেছে ভাই। তোমরা আমার স্ট্রেন্থ। তোমাদের দেখেই চেনা উচিত ছিল। আই অ্যাম সরি — এক্সট্রিমলি সরি।'

নিখিলেশ যতই দুঃখপ্রকাশ করুন, ললিতের ওপর তার বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া হল না। গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে আবেগহীন তীব্র ভঙ্গিতে সে বলল, 'আপনি স্যার আমাদের একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমাদের যখন ভুলে গেছেন তখন সেটাও নিশ্চয়ই আপনার মনে থাকার কথা নয়—'

'কিসের প্রতিশ্রুতি?'

এই সময় ট্রেনটা তালবনি স্টেশনে এসে থামল। ললিত জানালা দিয়ে একবার প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে বলল, 'আমরা পৌঁছে গেছি। ট্রেন এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না, এক্ষুণি নামতে হবে।' বলে, তার সঙ্গীকে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

নিখিলেশও উঠে পড়েছিলেন। ললিতদের পেছন পেছন যেতে যেতে ফের জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম?' তাঁর কণ্ঠস্বরে একই সঙ্গে কৌতূহল এবং উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল।

উত্তর না দিয়ে ললিত বলল, 'আপনি ক'দিন তালবনিতে থাকছেন?'

'যে কাজে আসা সেটা কমপ্লিট করতে কত দিন লাগবে, এক্ষুণি বলতে পারছি না। তবে আপাতত তিন চার দিন তো থাকবই।'

'কোথায় থাকবেন, কিছু ঠিক করেছেন?'

'না।'

ললিত বলল, 'যেখানেই থাকুন, আপনাকে খুঁজে বার করে আপনার প্রমিসের কথা

মনে করিয়ে দেব। শুধু আমাদেরই না, তালবনির আর কয়েক শ যুবককে অনেক মধুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তারাও আপনার কাছে হানা দেবে। আমার ওয়ার্নিংটা মনে রাখবেন।'

দুই

তালবনি এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় স্টেশন। সব মিলিয়ে এখানে চারটে প্ল্যাটফর্ম। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি জায়গায় লাল রঙের একতলা স্টেশন মাস্টারের অফিস। অ্যাসিস্টান্ট স্টেশন মাস্টারও ওখানেই বসেন। এ ছাড়া রয়েছে টিকেট কাউন্টার।

স্টেশন বিল্ডিংটার গা ঘেঁষে অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় রেলের লাইসেন্স-প্রাপ্ত টি-স্টল। শুধু চা-ই না; ওখানে পান, বিড়ি-সিগারেট, ঘুগনি, ডিমসেদ্ধ, ওমলেট, স্থানীয় বেকারির সস্তা কেক, পাউরুটি, বিস্কুট ইত্যাদি অনেক কিছুই পাওয়া যায়। প্যাসেঞ্জারদের বসার জন্য একধারে চার-পাঁচটা বেঞ্চ পাতা রয়েছে। প্যাসেঞ্জাররা আর কতক্ষণ বসে, ট্রেন এলেই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগায়। আসলে ভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত, অর্থাৎ লাস্ট ট্রেন যতক্ষণ চলে না যাচ্ছে আর চায়ের দোকানের ঝাঁপ না বন্ধ হচ্ছে, আশেপাশের বেকার ছোকরারা ওখানে চিরস্থায়ী আড্ডা জমিয়ে রাখে। টি-স্টলটার ঠিক বাইরে প্ল্যাটফর্মের ওপর গোল করে বাঁধানো জায়গায় পানীয় জলের কল।

চারটে প্ল্যাটফর্মই ন্যাড়া, সেগুলোর মাথায় আচ্ছাদন বলতে কিছু নেই। নিচে পুরু করে সুরকি ঢালা। প্রতিটি প্ল্যাটফর্মেরই ধার ঘেঁষে লাইন দিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছ; মার্চের শেষাশেষি এই সময়টায় ডগডগে লাল ফুলে ওগুলো ছেয়ে আছে। দূর থেকে থোকা থোকা আগুনের মতো দেখায়।

চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের ওধারে অগুনতি রেললাইন। সেখানে পনেরো ষোলোটা মালগাড়ি সারাক্ষণই নিশ্চল সরীসৃপের মতো পড়ে থাকে। মাঝরাতে তালবনি ঘুমিয়ে পড়লে গুডস ট্রেনগুলো গম্ভীর ধাতব আওয়াজ তুলে চারিদিক কাঁপিয়ে ধীরে ধীরে চলে যায়। ভোর হওয়ার আগেই ওগুলোর জায়গায় নতুন মালগাড়ি এসে ওখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। জায়গাটা দিনরাত কোনও সময়ই ফাঁকা পড়ে থাকে না।

ট্রেন থেকে ললিতদের সঙ্গেই নেমেছিলেন নিখিলেশ। ওরা কিন্তু ফিরেও তাঁর দিকে আর তাকায়নি, লম্বা লম্বা পা ফেলে সোজা গেটের দিকে চলে গেছে।

অন্য সব কামরা থেকে আরও বহু প্যাসেঞ্জার নেমেছিল। তাদের অনেকেই নিখিলেশকে চিনতে পেরে দাঁড়িয়ে গেছে। অবাক বিস্ময়ে তাঁকে দেখছে। কেউ কেউ ফিস ফিস করে কী সব বলছে। ওদের বিস্ময়ের কারণ নিখিলেশের অজানা নয়। ওরা কী আলোচনা করছে তাও তিনি জানেন। ওই লোকগুলো সম্পর্কে এই মুহূর্তে তাঁর কোনও আগ্রহ নেই। প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে এধারে ওধারে তাকিয়ে নিখিলেশ যোগেন মাস্টারকে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।

নিখিলেশকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। যোগেন মাস্টার কি তাঁর চিঠি পাননি? না পেয়ে থাকলে কী করবেন তিনি? স্টেশনের পাশেই সাইকেল-রিকশার স্ট্যান্ড। বছর কয়েক

হল, ট্যাক্সিও চালু হয়েছে তালবনিতে। কিছু একটা ধরে যোগেন মাস্টারের বাড়িও চলে যাওয়া যায়। ওঁর সঙ্গে দীর্ঘ পরামর্শ করাটা একান্ত জরুরি। যে উদ্দেশ্যে নিখিলেশের এখানে আসা, ওই লোকটিকে পাওয়া না গেলে এক পা-ও এগুনো যাবে না। তালবনিতে আসাটাই পুরোপুরি ব্যর্থ হবে।

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে যোগেন মাস্টারকে দেখছেন নিখিলেশ। মাঝে মাঝেই তাঁর মাথায় অদ্ভুত বাতিক চাড়া দেয়। বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে অজানা অখ্যাত কোনও গাঁয়ে উধাও হয়ে যান। দু-চারদিন থেকে কিছু ফোক সং বা লোকগীতিটিতি জোগাড় করে ফিরে আসেন। যোগেন মাস্টার বলেন, 'আসল ভারতীয় কালচার লুকিয়ে রয়েছে এইসব ফোক সং, ফোক টেলসের মধ্যে।' তাঁর ভারতীয় সংস্কৃতি আবিষ্কারেরঝোঁকটা এর মধ্যে চাগিয়ে উঠেছে কিনা, কে জানে। তা হলে তাঁকে পাওয়ার আশা নেই।

এইসব সাতসতেরো চিন্তা নিখিলেশকে যখন অস্থির করে তুলছে সেই সময় দেখা গেল প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্ত থেকে এগিয়ে আসছেন যোগেন মাস্টার। তাঁর চেহারাটা এমনই মার্কা-মারা যে একলাখ লোকের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকলেও নির্ভুলভাবে চিনে নেওয়া যায়।

কিছু মানুষ থাকে তিরিশ বছর বয়সে তাকে যেমন দেখায়, ষাট বছরেও হুবহু তাই। ক্ষয় নেই, পরিবর্তন নেই, চিরকাল একই রকম। যোগেন মাস্টার এদেরই একজন।

লোকটার হাইট ছ'ফুটের কাছাকাছি। গায়ের চামড়া ট্যান-করা। রং একদা ফর্সাই ছিল, রোদে পুড়ে পুড়ে এখন তামাটে। চওড়া কপাল, লম্বাটে মুখ, গোল চশমার ওধারে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। চুলগুলো খাড়া খাড়া এবং দুর্বিনীত, মোটা দাঁড়ার চিরুনি দিয়ে আঁচড়ালেও নোয়ানো যায় না। পঞ্চাশ ষাটের দশকের স্টাইলে মালকোঁচা দিয়ে পরা ধুতির ওপর হাতা গোটানো ফুল শার্ট, পায়ে চপ্পল। কাঁধ থেকে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে।

অবশ্য ভাল করে লক্ষ করলে সামান্য একটা পরিবর্তন চোখে পড়বে। চল্লিশ বছর আগে নিখিলেশ এই তালবনিতে যোগেন মাস্টারকে যখন প্রথম দেখেন, তাঁর চুল ছিল কুচকুচে কালো। সময়ের অদৃশ্য মেক-আপম্যান এর মধ্যে কখন যেন এলোমেলো ব্রাশ চালিয়ে তাঁর মাথার এখানে ওখানে অনেক জায়গায় সাদা ছোপ ধরিয়ে দিয়েছে।

দূর থেকে যোগেন মাস্টার নিখিলেশকে দেখতে পেয়েছিলেন। হাত তুলে ইশারায় তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে হন হন করে কাছে চলে এলেন। তিনি কখনও ধীরে হাঁটতে পারেন না। কারণ থাক বা না-ই থাক, সবসময় তাঁর ব্যস্ততা, সর্বক্ষণ তাড়াহুড়ো। মনে হয়, একেবারে শেষ মুহূর্তে ট্রেন ধরতে চলেছেন। যেন এক সেকেণ্ড দেরি হলে তাঁকে ফেলে রেখে সেটা চলে যাবে।

নিখিলেশ বললেন, 'আমি তো বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না, আমার চিঠি আপনি পেয়েছেন কিনা। পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের সারভিস আজকাল ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে।' একটু থেমে ফের বললেন, 'আপনাকে দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।'

যোগেন মাস্টার বললেন, 'আপনার চিঠির ব্যাপারে পোস্ট অফিসের গাফিলতি

হয়নি। ঠিক সময়েই ওটা পেয়েছিলাম। স্টেশনে আপনাকে নিতে আসব, স্কুলে হঠাৎ একটা ঝামেলা হল। সেসব মিটিয়ে বেরুতে বেরুতে দেরি হয়ে গেল। চলুন, যাওয়া যাক—'

যোগেন মাস্টার তালবনি হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে ইতিহাস পড়ান। ওঁদের আদি বাড়ি উত্তর বাংলায়, আলিপুরদুয়ারের কাছে একটা ছোট শহরে। চাকরির কারণে চল্লিশ বছর তালবনিতে আছেন। রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেলেও স্কুল তাঁকে ছাড়ে নি। জায়গাটার ওপর দারুণ মায়া পড়ে গেছে তাঁর। এখানেই কাঠা পাঁচেক জমি কিনে ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে ছোটখাট একখানা একতলা বাড়ি করেছেন। বাকি জীবনটা তালবনিতেই কাটিয়ে দেবার ইচ্ছা। উত্তর বাংলায় আর ফিরে যাবার সম্ভাবনা নেই। এসব তথ্য নিখিলেশের খুব ভালো করেই জানা আছে। তেমনি যোগেন মাস্টারও নিখিলেশের নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখেন। সম্পর্কটা তো দু-চারদিনের নয়, একটানা চল্লিশ বছরের।

গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে যোগেন মাস্টার বললেন, 'আপনার চিঠিটা পেয়ে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আসার কারণ কিন্তু জানাননি।'

নিখিলেশ পাশাপাশি হাঁটছিলেন। বললেন, 'সব জানাব।'

'হঠাৎ এতকাল বাদে ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাসে চড়ার ইচ্ছেটা চাড়া দিয়ে উঠল কেন?'

'সেটাও জানতে পারবেন।'

'আমি বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি।'

উৎসুক চোখে সঙ্গীর দিকে তাকালেন নিখিলেশ। কোনও প্রশ্ন করলেন না।

যোগেন মাস্টার বললেন, 'পনেরো বছর সুখে আরামে কাটানোর পরও বোঝাতে চেয়েছেন আপনি জনগণের একজন—তাই তো?'

নিখিলেশের চমকে ওঠার কথা। কিন্তু টের পেলেন, তাঁর মনে তেমন কোনও প্রতিক্রিয়াই হল না। কেননা তিনি জানেন, যোগেন মাস্টারের চোখে আর যে-ই পারুক, তাঁর পক্ষে ধুলো দেওয়া সম্ভব নয়। রাজনৈতিক অঙ্ক কষে কখন তিনি কোন চালটা দেবেন, লোকটা চোখের পলকে তা ধরে ফেলে। সেই যে কারা যেন খড়ি পেতে ভূ-ভারতের খবর বলে দেয়, যোগেন মাস্টার বুঝিবা তাদেরই একজন। তা ছাড়া লোকটা মারাত্মক ধরনের স্পষ্টবক্তা।

নিখিলেশ প্রথম বার নির্বাচনে জিতে যখন এম এল এ হলেন তখন থেকেই লোকে তাঁকে সমীহ করতে শুরু করেছে; সেই সঙ্গে ভয়ও। তারপর যখন মন্ত্রী হলেন, লোকের ভয়, ভক্তি এবং বশংবদ ভাবটা হাজার গুণ বেড়ে গেল। তাঁকে দেখলে সবাই বিগলিত ভঙ্গিতে হাতজোড় করে থাকত। চাটুকারিতা ছাড়া তাঁদের মুখ দিয়ে আর কিছুই বেরুত না। কিন্তু যোগেন মাস্টার একেবারেই ব্যতিক্রম। আদ্যোপান্ত সৎ, নির্লোভ এবং ভয়লেশহীন। এই মানুষটা নিখিলেশকে এতটুকু রেয়াত করেন না। যেটা ন্যায্য বা সঙ্গত মনে করেন, অপ্রিয় হলেও মুখের ওপর সোজাসুজি বলে দেন। এম এল এ এবং মন্ত্রী হওয়ার পর যখন বিপুল সরকারি ক্ষমতা নিখিলেশের হাতে এল, ছিটেফোঁটা অনুগ্রহের জন্য লোকে তাঁর বাড়ির সামনে বা যাতায়াতের পথের ধারে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

ভনভনে মাছির মতো সর্বক্ষণ তাঁকে ঘিরে চাপ-বাঁধা ভিড়। কিন্তু যোগেন মাস্টার কোনওদিন বলেননি, দুটো বাসের পারমিট বার করে দিন, কিংবা স্কুল মাস্টারি ছেড়ে দিচ্ছি, একটা বড় কনট্রাক্ট পাওয়ার ব্যবস্থা করুন। আভাসে ইঙ্গিতে বহুবার তাঁকে কিছু দিতে চেয়েছেন নিখিলেশ, কিন্তু যোগেন মাস্টার হেসে হেসে এড়িয়ে গেছেন। নিখিলেশের কাছে তাঁর বিন্দুমাত্র প্রত্যাশা নেই। নিখিলেশ বুঝিয়েছেন, যাবতীয় সরকারি আইন মেনেই যা দেবার তিনি দেবেন। এর মধ্যে স্বজনপোষণ বা অসততার কিছু নেই। যোগেন মাস্টারও বুঝিয়ে দিয়েছেন, কারও কাছ থেকেই তিনি অনুগ্রহ নেন না।

নিখিলেশ বিব্রতভাবে কিছু একটা উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু তা ভাল করে শোনা যায় নি।

যোগেন মাস্টার বললেন, 'খুব একটা কাঁচা স্টান্ট দিলেন নিখিলেশবাবু।' এম এল এ হওয়ার পরও বেশ কিছুদিন পরিচিত লোকজন নিখিলেশকে দাদা বলত। মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তিনি 'স্যার' হয়েছেন। কিন্তু চল্লিশ বছর আগে প্রথম পরিচয়ের দিন যোগেন মাস্টারের কাছে তিনি ছিলেন নিখিলেশবাবু। এখনও ঠিক তাই। তোষামুদি করাটা তাঁর ধাতে নেই।

যোগেন মাস্টার বলতে লাগলেন, 'পলিটিশিয়ানরা কখন কী চাল চালবে, আজকাল দশ বছরের একটা বাচ্চাও তা বলে দিতে পারে। আপনার কি ধারণা ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাসে চড়লেই রাতারাতি পপুলারিটি ফিরে আসবে?'

নিখিলেশ উত্তর দিলেন না, মুখ নিচু করে হাঁটতে লাগলেন।

যোগেন মাস্টার এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'চিঠিতে লিখেছেন, তালবনিতে কয়েকদিন থাকতে চান।'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়লেন নিখিলেশ।

'আগে এলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সরকারি গেস্ট হাউসে উঠতেন। সেখানেই কি এবার ওঠার ইচ্ছে?'

'না।'

কিছুক্ষণ ভেবে যোগেন মাস্টার বললেন, 'শহরে অবশ্য একটা নতুন হোটেল হয়েছে। বেশ ভালই, তবে ফাইভ স্টার নয়। ওখানে থাকতে কি অসুবিধে হবে? যদি রাজি থাকেন পৌঁছে দিতে পারি।'

'ফাইভ স্টার' কথাটা বিশেষভাবে বলার মানে কী? এম এল এ বা মন্ত্রী হবার পর অঢেল আরাম এবং বিলাসিতায় গা ঢেলে দিয়েছিলেন নিখিলেশ; সেই জন্যেই কি খোঁচাটা দিলেন যোগেন মাস্টার? চোখের কোণ দিয়ে একবার দ্রুত সঙ্গীটিকে দেখে নিলেন নিখিলেশ। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে কিছু আঁচ করা গেল না। বললেন, 'হোটেলে থাকব না।'

যোগেন মাস্টার জানতে চাইলেন, 'এখানকার টপ বিজনেসম্যানদের অনেকের সঙ্গেই তো আপনার সম্পর্ক ভাল। লাস্ট দুটো ইলেকশানে টাকা গাড়ি টাড়ি দিয়ে ওরা সাহায্য করেছে। ওদের কারও বাড়িতে —'

অসহিষ্ণুভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে নিখিলেশ বললেন, 'না—না—'

'তা হলে?'

'যে ক'দিন তালবনিতে আছি আপনার বাড়িতে থাকতে দিতে হবে।'

যোগেন মাস্টার হতভম্ব। একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'কিন্তু একজন গরিব স্কুল মাস্টারের বাড়িতে —'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নিখিলেশ বললেন, 'দয়া করে না বলবেন না।' একটু থেমে কিছু ভেবে আবার বললেন, 'বহুকালের পুরনো বন্ধু হিসেবে ক'টা দিন আপনাদের কাছে থাকতে পারি না?'

দ্বিধান্বিতভাবে যোগেন মাস্টার বললেন, 'নিশ্চয়ই পারেন। কিন্তু —'

'কিন্তু কী?'

'আপনার ভীষণ কষ্ট হবে।'

নিখিলেশ বললেন, 'আপনার বাড়িতে আমি কি কখনও থাকিনি?'

'সে তো পনেরো কুড়ি বছর আগে। তখন আপনার কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস ছিল।' যোগেন মাস্টার বলতে-লাগলেন, 'এখন নিজের লাইফ স্টাইল এনটায়ারলি বদলে গেছে। আমার বাড়িতে এয়ার-কুলার টুলার নেই। তালবনির এই গরমে —'

যোগেন মাস্টারকে কথাটা শেষ করতে দিলেন না নিখিলেশ। বললেন, 'আপনি যদি আমার অনুরোধটা না রাখেন, তালবনির গরমের চেয়েও আমার অনেক বেশি কষ্ট হবে।'

যোগেন মাস্টার হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি যখন শুনবেন না, আমার বাড়িতেই থাকবেন।'

কথায় কথায় দু'জনে গেটের কাছে চলে এসেছিলেন। সেখানে মোটামুটি একটা ভিড় জমেছে। ট্রেন থেকে তালবনির যে প্যাসেঞ্জাররা নেমেছিল তারা বাইরে বেরিয়ে না গিয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। তা ছাড়া কালো কোট পরা টিকিট কালেক্টর তো রয়েছেই; লাল স্টেশন বিল্ডিংটা থেকে স্টশন মাস্টার, অ্যাসিস্টান্ট স্টেশন মাস্টার, লাইনম্যান, রেলের এমনি আরও কয়েকজন এমপ্লয়িও বেরিয়ে এসে ওখানে অপেক্ষা করছে।

বোঝা গেল, নিখিলেশের আসার খবরটা এর মধ্যে জানাজানি হয়ে গেছে।

স্টেশন মাস্টার এবং রেলের অন্য এমপ্লয়িরা ঝুঁকে হাতজোড় করে বিনীতভাবে বলল, 'নমস্কার স্যার, ভাল আছেন তো?'

নির্বাচনে-হারা একজন প্রাক্তন মন্ত্রীকে যেভাবে এরা শ্রদ্ধাভক্তি জানাচ্ছে তাতে বেশ মজাই লাগল নিখিলেশের। আসলে এটা দীর্ঘকালের অভ্যাস। বহুদিন ধরে ওরা এভাবে অনুগত ভঙ্গিতে সম্মান জানিয়ে আসছে। নিখিলেশ হেরে গেছেন বলে অভ্যাসটা রাতারাতি পালটে ফেলা মুশকিল।

কিন্তু যে জনতা একধারে দাঁড়িয়ে আছে তারা কিছুই বলল না, নমস্কারও করল না, বিমূঢ়ের মতো নিখিলেশের দিকে তাকিয়ে রইল।

নিখিলেশ রেলের যাত্রীদের তো বটেই, জনতার উদ্দেশেও নমস্কার জানিয়ে টিকেট কালেক্টরের কাছে টিকেট দিয়ে যোগেন মাস্টারের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলেন।
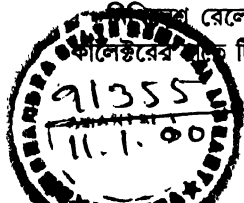
তিন

স্টেশনটা বেশ উঁচুতে। কুড়ি বাইশটা সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামলে রাস্তা। তার একধারে ডালপালাওলা প্রকাণ্ড চারটে শিশু গাছের তলায় পাশাপাশি রিকশা আর ট্যাক্সি স্ট্যান্ড।

সামনের রাস্তাটার দু'ধারে অনেকদূর পর্যন্ত চাপ-বাঁধা দোকান-পাট, ধান চালের আড়ত, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, কোল্ড স্টোরেজ, সিনেমা হল, স্কুল-কলেজ, নানা ধরনের সরকারি অফিস, সব গা-জড়াজড়ি করে রয়েছে।

চল্লিশ বছর আগে তালবনি ছিল খুবই নগণ্য একটা শহর। ভূ-ভারতের মানচিত্রে তার কোনও অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেত না। স্টেশনের গায়ে খানিকটা জায়গা জুড়ে খাপছাড়াভাবে গজিয়ে ওঠা ক'টা দোকান, বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা কিছু বাড়িঘর, একটা হাইস্কুল আর দুটো প্রাইমারি স্কুল — এই নিয়ে সেই আমলের তালবনি। তখনও ইলেকট্রিসিটি আসেনি। চারিদিকে যতদূর চোখ যায় ধু ধু ফসলের মাঠ। ফাঁকে ফাঁকে কৃষকদের গাঁ। সেদিনের তালবনিকে শহর বললে যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হ'ত।

সেই তালবনিকে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। মাঝখানের ক'বছরে পুবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে — অর্থাৎ চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত সেটা ছড়িয়ে পড়েছে। তবে শহরটার চেহারায় ছিরিছাঁদ বা সৌষ্ঠব বলতে কিছু নেই। এখানকার যা কিছু সবই বিশৃঙ্খল, পরিকল্পনাহীন, এলোমেলো। যে যেখানে পেরেছে এলোপাথাড়ি বাড়ি তুলেছে।

অন্য সব শহরের মতো তালবনিতেও যে পপুলেশন এক্সপ্লোসান বা জন-বিস্ফোরণ ঘটেছে, সেটা এখানে পা দিলেই টের পাওয়া যায়। মার্চের এই পড়ন্ত বেলায় স্টেশনের পাশের রাস্তাটায় মানুষ থিক থিক করছে। রোজই এই সময় এরকম ভিড় লেগে থাকে। কিন্তু আজকেরটা একেবারে অন্য ধরনের। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে কারও জন্য যেন অপেক্ষা করছে।

নিখিলেশের আসার খবরটা শুধু স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই সীমাবদ্ধ নেই। সেটা যে বাইরেও চাউর হয়ে গেছে, বুঝতে অসুবিধা হল না।

যোগেন মাস্টার বললেন, 'একটা ট্যাক্সিও দেখতে পাচ্ছি না। স্ট্যান্ড একদম ফাঁকা। কী করা যায় বলুন তো?'

নিখিলেশ বললেন, 'কেন, সাইকেল রিকশা তো আছেই। ওতেই যাওয়া যাক।'

যোগেন মাস্টারের ঠোঁটে শ্লেষের একটা ভঙ্গি ফুটে উঠেই দ্রুত মিলিয়ে গেল। বললেন, 'ঠিক আছে, তাই চলুন—' একটু থেমে চিন্তিতভাবে বললেন, 'কিন্তু—'

নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল?'

'নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারছেন, এখানকার পিপল আপনার ফেভারে আর নেই। বলতে পারেন রীতিমতো হোস্টাইল হয়ে আছে। এই অবস্থায় সাইকেল রিকশায় চেপে ওদের মধ্যে দিয়ে গেলে —' বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেলেন যোগেন মাস্টার।

নিখিলেশ বললেন, 'কতটা হোস্টাইল হয়েছে, দেখাই যাক না—'

ঘাড় ফিরিয়ে স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত প্রাক্তন মন্ত্রীটিকে দেখে নিলেন যোগেন

মাস্টার। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি যেভাবে বললেন সেভাবেই যাওয়া যাক। একটা টেস্ট হয়ে যাক।'

'কিসের টেস্ট?'

'আপনার জনপ্রিয়তা আদৌ আছে, নাকি একেবারেই শেষ হয়ে গেছে — তার। চলুন—'

একটা সাইকেল রিকশায় দু'জনে উঠে পাশাপাশি বসলেন। গাড়ি চলতে শুরু করল।

পেছনে জনতার ভেতর থেকে আচমকা কেউ চেঁচিয়ে উঠল, 'শালা অ্যাদ্দিন ঠাণ্ডা কল-লাগানো গাড়িতে চড়ে ঘুরত। আজ নকশাবাজি করে রিকশায় উঠেছে।'

আর একজন গলা আরও চড়িয়ে বলল, 'ধান্দাটা আমরা বুঝি।'

টুকরো-টুকরো এমনি নানা মন্তব্য এধার ওধার থেকে বন্দুকের গুলির মতো ছুটে আসতে লাগল। সেই সঙ্গে অশ্লীল কিছু খিস্তিও।

তালবনির মানুষ যে তাঁর প্রতি আর সদয় নেই সেটা ট্রেনে দীনেশ আর ললিতের কথা শুনে আন্দাজ করা গিয়েছিল। কিন্তু তারা গালাগাল দিয়ে তাঁর চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে দেবে, এটা ছিল সম্পূর্ণ অভাবনীয়।

জীবনে কখনও এমন কুৎসিত, জঘন্য পরিস্থিতিতে পড়েননি নিখিলেশ। তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল, মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করছে। মনে হচ্ছে, হৃৎপিণ্ডটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

কিছুদিন আগেও তালবনির এইসব মানুষ তাঁকে দেখলে তটস্থ হয়ে থাকত। কিন্তু আজ তারা এতটা পালটে গেছে. এখানে না এলে জানাই যেত না। এই প্রথম তিনি টের পেলেন, নির্বাচনে একটা পরাজয় অনেক কিছুই বদলে দেয়।

হেরে গেলেও প্রশাসনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে নিখিলেশের। যে রাজনৈতিক দলের তিনি সদস্য সেটা খুবই শক্তিশালী। ইচ্ছা করলে পুলিশ এবং সংগঠনের ছেলেদের নিয়ে এসে এই ইতর, দুর্বিনীত জনতাকে টিট করে দিতে পারেন। অবশ্য সেটা করলে যে উদ্দেশ্যে তাঁর তালবনিতে আসা সেটা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

যোগেন মাস্টার আড় চোখে নিখিলেশের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিলেন। চাপা গলায় বললেন, 'ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাসে আসা, সাইকেল রিকশায় চড়ে দিনের বেলায় এত লোকের সামনে দিয়ে যাওয়া—এসব না করলেই পারতেন নিখিলেশবাবু। খুব খারাপ লাগছে তো?'

নিখিলেশ অস্বস্তিকর অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার জন্যই খুব সম্ভব গলায় অনেকখানি জোর দিয়ে বললেন, 'না না, আমি ঠিক আছি।'

খানিকটা স্বগতোক্তির মতো যোগেন মাস্টার নিচু গলায় এবার বললেন, 'পিপল নিয়ে কাজ। ব্যাপারটা ভীষণ রিস্কি।'

কথাগুলো কানে এসেছিল নিখিলেশের। মুখে কিছু না বললেও যোগেন মাস্টারের মন্তব্যটা যে নির্ভুল মনে মনে তা মেনে নিতে হল তাঁকে।

যোগেন মাস্টার আগের মতোই চাপা স্বরে নিজেকে শুনিয়েই যেন ফের বললেন,

'একটু এদিক ওদিক হলেই সব গোলমাল। অনেকটা স্নেক চার্মারদের মতো, অ্যাটেনশন অন্যদিকে চলে গেলেই ছোবল।'

যে রাস্তাটা দিয়ে ওঁরা চলেছেন সেটা মেরুদণ্ডের মতো শহরের মাঝখান দিয়ে উত্তর থেকে খাড়া দক্ষিণে চলে গেছে। ওটার দু'পাশ থেকে অগুনতি গলি ডাইনে এবং বাঁয়ে জিলিপির প্যাঁচের মতো পাক খেয়ে খেয়ে একতলা, দোতলা, তেতলা, টালি বা টিনের চালা, ইত্যাদি নানা ধরনের অজস্র ঘরবাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে।

স্টেশনের এলাকা ছাড়িয়ে দক্ষিণ দিকে বেশ খানিকটা চলে এসেছেন নিখিলেশরা। এ শহরের সব কিছুই তাঁর মুখস্থ। নিজের করতলের রেখাগুলোর মতো তিনি তালবনিকে চেনেন।

মাঝে মাঝে উলটো দিক থেকে যে সব লোকজন আসছিল, সাইকেল রিকশায় নিখিলেশকে দেখে তাদের কেউ থ হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, কেউ বা দু-একটা মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছে।

যোগেন মাস্টার হঠাৎ ডাকলেন, 'নিখিলেশবাবু—'

নিখিলেশ কিছু ভাবছিলেন, চমকে উঠে সাড়া দিলেন।

যোগেন মাস্টার বললেন, 'একটা কথা আমার মনে পড়ছে। কোন একটা বইয়ে যেন পড়েছিলাম, এক্ষুণি ঠিক মনে পড়ছে না—'

নিখিলেশ উৎসুক সুরে জানতে চাইলেন, 'কী কথা?'

'পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সাফল্য বলে কিছু নেই। ফেলিওর শব্দটা তা হলে ডিকশনারিতে থাকত না।'

'আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছি না।'

যোগেন মাস্টার সোজাসুজি কথাটার উত্তর না দিয়ে বললেন, 'আমাদের মতো যারা খুব সাধারণ মানুষ, মানে জনগণ, তাদের কেউ আনসাকসেসফুল হলে সে নিজে এবং তার পরিবারের লোকজন কষ্ট পায়। কিন্তু পলিটিশিয়ানদের বেলা নিয়মটা অন্যরকম।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন নিখিলেশ, কিছু বললেন না।

যোগেন মাস্টার বলতে লাগলেন, 'রাজনীতিবিদরা সাফল্য পেলে জনতা ফুলের তোড়া উপহার দেয় আর ব্যর্থ হলে ইট-পাটকেল ছোঁড়ে। আইদার 'ব্যুকে' অর ব্রিকব্যাট। আপনার সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে নিখিলেশবাবু।'

নিখিলেশ এবারও উত্তর দিলেন না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

যোগেন মাস্টারের বাড়িটা তালবনি শহরের দক্ষিণ দিকের শেষ মাথায়। জায়গাটার নাম নতুন পল্লী। সেখানে পৌঁছুতে আরও মিনিট পনেরো লাগবে।

ওঁরা এখন যেখানে এসে পৌঁছেছেন সেখানে একটা ছোট নদী আড়াআড়ি পুব থেকে পশ্চিম দিকে চলে গেছে। নদীটায় জল খুব কম। যেটুকু বা আছে, চোখে পড়ে না। ঝাঁঝি আর কচুরিপানায় ঢেকে আছে।

নদীটার নাম মেঘাই। ওটার ওপর বহুকালের পুরনো, চওড়া কাঠের একটা ব্রিজ দেখা

যাচ্ছে। একসময় বেশ মজবুতই ছিল। কয়েক বছর হল, ব্রিজটার নিচের দিকের ভারী ভারী শক্ত খুঁটিগুলো জলে ক্ষয়ে নড়বড়ে হয়ে গেছে। ওপরে চলাচলের জন্য পাশাপাশি কাঠের পুরু পাটাতন বসিয়ে গজাল মেরে মেরে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। গরু মোষ ছাগল এবং মানুষ তো দিনরাত যাতায়াত করেই, তা ছাড়া হরদম সাইকেল রিকশা, ভ্যান, মোটর সাইকেল, জিপ, গরুর গাড়ি আর ট্যাক্সিও এপার ওপার করছে। গাড়ির চাকা আর মানুষের পায়ের ঘষায় পাটাতনের অনেকগুলো তক্তার জোড় আলগা হয়ে গেছে, কয়েকটা ভেঙেচুরে খসে পড়েছে। ফলে পুলের নানা জায়গায় বেশ কয়েকটা বড় বড় ফোকর। চলাচলের পক্ষে এখন ওটা খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

যোগেন মাস্টারের বাড়ি যেতে হলে পুল পেরিয়ে নদীর ওপারে যেতে হবে। নিখিলেশ বললেন, 'তিন মাস আগে তালবনি এসেছিলাম। তখনকার চেয়ে ব্রিজটার হাল অনেক খারাপ হয়ে গেছে দেখছি।'

যোগেন মাস্টার খুব মনোযোগ দিয়ে কী দেখছিলেন। জবাব দিলেন না।

নিখিলেশ ফের বললেন, 'যে কোনও সময় অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে। এটা ইমিডিটেলি সারানো দরকার।'

যোগেন মাস্টার এবারও চুপ। মুখ ফিরিয়ে নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল, কথা বলছেন না যে! কী দেখছেন বলুন তো?'

ব্রিজটা এপারে যেখান থেকে শুরু হয়েছে, যোগেন মাস্টার আঙুল দিয়ে সেখানে ইটের বেদিতে গাঁথা একটা শ্বেত পাথরের ফলক দেখিয়ে দিলেন। ফলকটা অবশ্য সাদা নেই, হলদে হয়ে গেছে। বেদির ইটও অনেক জায়গায় খসে খসে পড়েছে। ওটাকে ঘিরে প্রচুর কাঁটাগাছ গজিয়ে উঠেছে।

বেদি আর ফলকটা দেখতে দেখতে চমকে উঠলেন নিখিলেশ। ফলকে লেখা আছে : 'এই স্থানে মেঘাই নদীর উপর একটি কংক্রিটের পুল নির্মাণ করা হইবে। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনিখিলেশ মজুমদার তাহার শিলান্যাস করিলেন।' নিচে তারিখ দেওয়া আছে। বিদ্যুৎ চমকের মতো তাঁর মনে পড়ল, দশ বছর আগে যেবার তিনি প্রথম মন্ত্রী হলেন, প্রচুর হইচই করে প্রেসের লোকজন ডেকে নতুন পুলের ভিত্তি প্রস্তরটা স্থাপন করেছিলেন। তালবনির মানুষদের তখন কী উদ্দীপনা! পুরনো কাঠের পুলের জায়গায় একটা নতুন সিমেন্টের পুলের দাবি তাদের দীর্ঘকালের। আকাশ ফাটিয়ে তারা তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছিল। তিন মাইল দূর থেকে শোনা গিয়েছিল : নিখিলেশ মজুমদার জিন্দাবাদ, নিখিলেশ মজুমদার জিন্দাবাদ। তালবনির মানুষেরা ধরেই নিয়েছিল তাদের বহুদিনের আপনজন, তাদেরই ভোটের জোরে মন্ত্রী-হওয়া নিখিলেশ এতকালের প্রত্যাশা পূরণ করবেন। কিন্তু শিলান্যাসের পর দশ বছর কেটে গেছে। আশ্চর্য, মন্ত্রিত্ব আর অন্য বড় বড় প্রোজেক্ট নিয়ে তিনি কলকাতায় এতই মগ্ন ছিলেন যে তুচ্ছ একটা পুলের কথা একেবারেই মাথায় ছিল না। যোগেন মাস্টার চিঠি লিখে কয়েক বার তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। এখানকার লোকজন দু-একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে মেমোরেন্ডাম বা স্মারকলিপি জমা দিয়ে এসেছিল। হাজার ব্যস্ততার মধ্যে সেগুলো কোথায় কোন ফাইলের

ভেতর চাপা পড়ে গিয়েছিল, কে জানে। অথচ এই ব্যাপারটায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু যোগেন মাস্টার নিঃশব্দে কয়েক বছর আগের ভিত্তি প্রস্তরটা যে দেখিয়ে দিলেন তার পেছনে নিশ্চয়ই কোনও গভীর উদ্দেশ্য রয়েছে। উনি চোখে আঙুল দিয়ে যা বোঝাতে চাইছেন তা খুবই স্পষ্ট। যাদের ভোটে জিতে তিনি দু দু'বার মন্ত্রী হয়েছেন তাদের খুব ন্যায়সঙ্গত একটা প্রয়োজন না মেটানো অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন নিখিলেশ।

সাইকেল রিকশা পুলের ওপর উঠে এসেছিল। রিকশাওলা খুব সাবধানে, বড় বড় ফোকরগুলোর পাশ দিয়ে দিয়ে ওপারে চলে এল। এখানে রাস্তার দু ধারে বেশ কিছু কল-কারখানা—জুটমিল, কাচকল, মাঝারি মাপের তিন-চারটে পেপার মিল, ফাউন্ড্রি, ওষুধ তৈরির ফ্যাক্টরি ইত্যাদি। তবে সেগুলোর বেশির ভাগই বন্ধ।

কারখানার এলাকাটা পেরুতে মিনিট দশেক লাগল। তারপর আবার বসতি শুরু হয়েছে।

ভিত্তিপ্রস্তরটা দেখার পর থেকে একেবারে চুপ করে গিয়েছিলেন নিখিলেশ। শুধু অস্বস্তিই নয়, ভেতরে ভেতরে একটা তীব্র অপরাধবোধও কাজ করছে। তিনি দু লাইনের নোট দিলে সাড়ে পাঁচ-শ ছ'শ ফুট লম্বা একটা পুল সরকারি খরচে কবেই তৈরি হয়ে যেত। কেন যে এ ব্যাপারে সামান্য উদ্যোগটুকু নিলেন না?

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে নিখিলেশের। কিন্তু এখন আর আফসোস করে কী হবে? সরকারি ক্ষমতা, প্রভুত্ব, সবই তাঁর হাতের বাইরে চলে গেছে। এবার নির্বাচনের পর তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল সরকারে এসেছে। নিখিলেশ আবছা ভাবে ভাবলেন, যাঁরা নতুন মন্ত্রী হয়েছেন তাঁদের পুলটা তৈরি করে দেবার জন্য অনুরোধ করলে কেমন হয়? পরক্ষণে মনে হয়, সেটা খুব বিশ্রী একটা দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে। নতুন সরকারের মন্ত্রীরা সামনাসামনি কিছু বলবেন না, কিন্তু নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করবেন। তালবনির মানুষেরা জানতে পারলে নিশ্চয়ই খুশি হবে না। তখন তারা তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ চাইতেই পারে, এতদিন মন্ত্রী থাকাকালীন কী করছিলেন তিনি? ঘোড়ার ঘাস কাটছিলেন? সাধারণ মানুষের একটা ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি তাঁর এত উপেক্ষা কেন?

যোগেন মাস্টারও চুপচাপ। ডানদিকের বাড়িঘরের দিকে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে তিনি তাকিয়ে আছেন।

হঠাৎ খানিক দূরে একসঙ্গে অনেকগুলো মোটর বাইকের কান ফাটানো গর্জন ভেসে এল। ডান পাশের একটি রাস্তা থেকে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় পড়ে মুখ ঘুরিয়ে সেগুলো সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

নিশিলেশ চকিত হয়ে উঠেছিলেন। গুনে গুনে দেখলেন সবসুদ্ধ পাঁচটা। ওগুলো যারা চালাচ্ছে তাদের বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। পরনে টাইট জিনস আর জ্যাকেট, চোখে গাঢ় কালো রঙের সান গ্লাস।

নিখিলেশ হিন্দি সিনেমা টিনেমা খুব একটা দেখেন না। এতদিন দেখার মতো সময়ও

ছিল না। ক্বচিৎ কখনও টিভি খুললে চোখে পড়েছে হিন্দি ফিল্মের মার্কা-মারা ভিলেনদের পাশে বেশ কিছু বন্দুকবাজ মস্তান থাকে। এই ছোকরাগুলোর চেহারা, পোশাক আশাক অনেকটা তাদের মতো।

মোটর বাইকগুলো যখন খানিকটা দূরে চলে গেছে সেই সময় ডান দিকের সেই রাস্তাটা থেকে ক'টা লোক ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এসে চিৎকার করতে করতে মোটর বাইকগুলোর দিকে ছুটতে লাগল।

নিখিলেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'মোটর বাইক ছুটিয়ে যারা গেল তারা কারা?'

যোগেন মাস্টার মুখ ফিরিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন, 'চিনতে পারেননি?'

নিশিলেশ বললেন, 'না, মানে—'

যোগেন মাস্টার বললেন, 'ওরা হল তারক, পন্টা, লেলো, গাল-কাটা সেলিম আর বুটাই।' একটু থেমে ফের বললেন, 'নিজের তৈরি ফ্রাঙ্কেনস্টাইনদের চেনা উচিত ছিল আপনার।'

চকিত হয়ে উঠলেন নিখিলেশ। সত্যিই চেনা উচিত ছিল। একসময় ওরা ছিল তালবনির দুর্ধর্ষ মস্তান এবং ওয়াগন ব্রেকার। কথায় কথায় ছুরি আর রিভলবার চালিয়ে দিত। ওদের পলিটিকসে টেনে এনেছিলেন নিখিলেশ। না, ঠিক তিনি নন। পার্টি ওদের চাইছিল। নিখিলেশ আপত্তি জানানো সত্ত্বেও কাজ হয় নি। অগত্যা দু দু'বার ইলেকশানের সময় ওদের কাজে লাগিয়েছেন তিনি। তবে কখনও এভাবে তালবনির রাস্তায় মোটর বাইক দাপিয়ে বেড়াতে দেখেননি। আসলে তখন মোটর বাইকই ছিল না তারকদের।

কিন্তু যোগেন মাস্টার পন্টাদের ফ্রাঙ্কেনস্টাইন বললেন কেন? কী ইঙ্গিত দিতে চাইছেন তিনি? মেরি উলস্টোনক্রাফট শেলির দম বন্ধ-করা উপন্যাসে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন নামে এক দানব তার সৃষ্টিকর্তাকেই ধ্বংস করেছিল। এই তারক, পন্টা, হাত-কাটা সেলিমরা কি তাঁর কোনও ক্ষতি করার ছক কষেছে? নিখিলেশ ঠিক বুঝতে পারলেন না। গভীর এক শঙ্কা ভেতরে ভেতরে তাঁকে বিচলিত করে তোলে। কিন্তু এ নিয়ে যোগেন মাস্টারকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ হল। হয়ত উনি ভাববেন, নিখিলেশ মজুমদার ক'টা বন্দুকবাজ মস্তানকে ভয় পাচ্ছেন।

যোগেন মাস্টার এবার বললেন, 'ইলেকশানের রেজাল্ট বেরুবার পর আপনি তো আর তালবনিতে আসেননি—'

নিখিলেশকে খুব বিব্রত দেখাল। কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনাকে বলতে লজ্জা নেই। অনেকদিন ধরে তো দেখছি, আপনি আমার সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষীদের একজন। আসলে রেজাল্ট দেখে এমন শক্ড্ হয়েছিলাম যে—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন।

একটু চুপচাপ।

তারপর নিখিলেশ আবার বললেন, 'আশা করি, আমার তখনকার মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারছেন—'

তাঁর কথার উত্তর না দিয়ে যোগেন মাস্টার অন্যমনস্কর মতো বললেন, 'এর মধ্যে যদি আসতেন একটা জরুরি খবর পেয়ে যেতেন।'

নিখিলেশকে উদ্বিগ্ন দেখায়। জিজ্ঞেস করেন, 'কী খবর?'

'আপনার ইলেকশান ব্রিগেড, মানে ওই পল্টা, হাত-কাটা সেলিম আর এই ধরনের আরও অনেক অ্যান্টিসোসাল মস্তান শিবির এবং লয়ালটি মানে আনুগত্য পালটে ফেলেছে।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

যোগেন মাস্টার বললেন, 'খুব সোজা। আপনার অপোনেন্ট, এবার যিনি আপনাকে হারিয়ে ইলেকশানে জিতেছেন ওরা সেই নিবারণ হালদারের ক্যাম্পে চলে গেছে।'

আচমকা জোরাল ধাক্কা লাগল নিখিলেশের। সেটা সামলে নিতে নিতে আবছাভাবে একটা কথা মনে পড়ে যায় নিখিলেশের। তালবনিতে তাঁদের রাজনৈতিক দলের অফিস আছে। নানা বয়সের অনেক পুরুষ এবং মহিলা তাঁদের সংগঠনের সক্রিয় মেম্বার। ওদেরই কেউ কলকাতায় গিয়ে হয়ত পল্টাদের খবরটা দিয়েছিল। কিন্তু তখন তিনি মানসিকভাবে এমনই বিপর্যস্ত যে ওটা নিয়ে কিছু ভাবেননি। শোনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ভুলে গেছেন।

যোগেন মাস্টার থামেননি। বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন নিখিলেশবাবু, এই অ্যান্টিসোসালরা হল ওয়েদার-কক। ওরা যা করে বেড়ায় তার জন্যে পলিটিক্যাল প্রোটেকশনের দরকার। যখন যে লিডারের ক্ষমতা বেশি, ওরা তাঁর ছাতার তলায় গিয়ে শেলটার নেয়। এটাই হল ওদের দস্তুর। তারকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। ওদের লয়ালটি চিরস্থায়ী, এটা ভাবলে মারাত্মক ভুল করবেন। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতিবাক্যটি আপনার আমার চেয়ে ওদের অনেক বেশি করে মনে রাখতে হয়। তারকরা যে ধরনের জীব অপঘাতে মরার সম্ভাবনাটা সারাক্ষণ ওদের পিছু পিছু ঘোরে। আত্মরক্ষাটি তো করতে হবে।'

নিখিলেশ জবাব দিলেন না।

যোগেন মাস্টার বলতে লাগলেন, 'যদি কখনও বোঝে আপনি নেক্সট ইলেকশানে জিতে যাবেন, ওরা আপনার পায়ের তলায় এসে লুটিয়ে পড়বে। জাস্ট লাইক পেট ডগস।'

আরও কয়েক মিনিট চলার পর দেখা গেল, সেই লোকগুলো, যারা পল্টাদের মোটর বাইকের পেছনে ছুটেছিল, ফিরে আসছে। চোখেমুখে ভয় এবং আতঙ্কের ছাপ। যেন মারাত্মক কোনও বিপদ তাদের ঘটেছে। পল্টাদের অবশ্য দেখা গেল না, তারা বেমালুম উধাও হয়ে গেছে।

লোকগুলোকে চেনেন নিখিলেশ। তিনি ওদের ডাকতে গিয়েও কী ভবে ডাকলেন না। ওরা তাঁকে লক্ষ করেনি, পাশ দিয়ে নিঃশব্দে আচ্ছন্নের মতো চলে গেল। নিখিলেশের মনে হল কিছু একটা আর্জি নিয়ে পল্টাদের কাছে ওরা গিয়েছিল। হয় পল্টাদের ওরা ধরতে পারেনি, নতুবা ওদের কথা কানেই তোলেনি পল্টারা।

নিখিলেশ ডাকলেন, 'যোগেনবাবু—'

তাঁর দিকে না ফিরেও যোগেন মাস্টার সাড়া দিলেন, 'বলুন—'

'এই যে লোকগুলো গেল, মনে হচ্ছে পল্টারা ওদের কিছু ক্ষতি টতি করেছে।'

'স্বাভাবিক। অ্যান্টিসোসালদের কাজই হল নিরীহ মানুষের সর্বনাশ করা। তার ওপর পলিটিক্যাল পার্টির প্রোটেকশনে থাকলে তো কথাই নেই।'

নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ধরনের ক্ষতি — মানে—'

যোগেন মাস্টার বুঝতে পারলেন, পল্টারা এই লোকগুলোর কী অনিষ্ট করেছে সেটা নির্দিষ্টভাবে জানতে চাইছেন নিখিলেশ। বললেন, 'কী করে বলব? আপনি যা দেখছেন, আমিও তাই দেখেছি। পল্টারা মোটর বাইক হাঁকিয়ে চলে গেল, লোকগুলো তাদের পিছু নিল। এখন ফিরে যাচ্ছে।' একটু থেমে বললেন, 'আপনি যদি ডিটেলে জানতে চান, খোঁজ খবর নিতে পারি।'

নিখিলেশ চুপ করে রইলেন।

যোগেন মাস্টার বলতে লাগলেন, 'আপনি জানেন না, নিবারণ হালদারের ক্যাম্পে নাম লেখাবার পর পল্টাদের উৎপাত কী ভীষণ বেড়ে গেছে। তালবনির মানুষ সবসময় তটস্থ হয়ে থাকে।'

নিখিলেশ বললেন, 'উৎপাত বলতে?'

যোগেন মাস্টার বললেন, 'আপনি তো কয়েকদিন আছেন। নিজেই জানতে পারবেন। হয়ত কিছু কিছু নমুনা নিজের চোখেও দেখতে পাবেন।' একটু থেমে ফের বললেন, 'এই সব অ্যান্টিসোসাল ক্রিমিনালদের জন্যে রাজনীতির সদর দরজা খুলে দিয়ে ভাল কাজ করেন নি নিখিলেশবাবু।'

এ জাতীয় সতর্কবাণী আগেও কি একবার দিয়েছিলেন যোগেন মাস্টার? ঠিক মনে পড়ল না। বিমর্ষ সুরে নিখিলেশ বললেন, 'আপনি তো জানেন আমি এদের চাই নি। কিন্তু পার্টি—'

যোগেন মাস্টার কিছুটা রূঢ়ভাবেই বললেন, 'জানি। কিন্তু যতটা জোর দিয়ে বাধা দেওয়া উচিত ছিল আপনি কিন্তু তা করেন নি—'

এরপর দু'জনেই চুপ। মুখ ফিরিয়ে অন্যমনস্কর মতো রাস্তার ধারের বাড়িঘর, লোকজন দেখতে লাগলেন নিখিলেশ। কিন্তু তারকদের চিন্তাটা তাঁর মস্তিষ্কের ভেতর গভীরভাবে ঢুকে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে কোনও কারণ নেই তবু অস্পষ্টভাবে তাঁর মনে হল, যোগেন মাস্টার যাদের ফ্রাঙ্কেনস্টাইন বলেছেন, তাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া তাঁকে করতে হবে।

একসময় সাইকেল রিকশা নতুন পল্লীতে যোগেন মাস্টারের বাড়ির সামনে এসে থামল। ভাড়া মিটিয়ে দু'জনে নেমে পড়লেন।

চার

যোগেন মাস্টারের একতলা বাড়িটা খুবই সাদামাঠা। পাশাপাশি টানা তিনখানা শোওয়ার ঘর। সেগুলোর সামনে দিয়ে চওড়া বারান্দা চলে গেছে। ছাদটা সিমেন্ট, স্টোনচিপ ইত্যাদি দিয়ে ঢালাই করা। বারান্দায় ঢালু টালির চাল। উত্তর দিকে শেষ ঘরটা ঘেঁষে রান্নাঘর, বাথরুম। উঠোনের অর্ধেকটা কাঁচা, সেখানে মাচায় শসা আর চালকুমড়ো ঝুলছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে দু-চারটে দেশি ফুলের গাছও দেখা যাচ্ছে। উঠোনের বাকি আধখানায় ইট পাতা। বোঝা যায়, টাকার অভাবে ওটা বাঁধানো যায়নি। একধারে একটা টিউবওয়েলও চোখে পড়ে। বাড়িটার চৌহদ্দি ফণিমনসার বেড়া দিয়ে ঘেরা। সামনের দিকে যাতায়াতের জন্য খানিকটা অংশ ফাঁকা। সেখানে কাঠের একটা আগড় রয়েছে।

চারপাশে প্রচুর বাড়িঘর। সবই একতলা, ক্বচিৎ দু-একটা দোতলা। ইটের দেওয়াল, পাকা মেঝে এবং মাথায় টিনের চাল, এমন বাড়ির সংখ্যাই বেশি।

আট-দশ বছর আগেও এই অঞ্চলটা ছিল পুরোপুরি জলাভূমি। শুধুই খাল বিল আর জঙ্গল। খালটাল বুজিয়ে, গাছপালা সাফ করে বসতি গড়ে তোলা হয়েছে।

নিখিলেশকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকতে ঢুকতে যোগেন মাস্টার ডাকতে লাগলেন, 'আরতি — আরতি —'

বাঁদিকের একটা ঘর থেকে একটি মহিলা বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। গায়ের রং চাপা হলেও বেশ সুশ্রী। পানপাতার মতো মুখ। অজস্র চুল এবং তার একটাও পাকেনি। এই বয়সেও শরীরের বাঁধুনি চমৎকার। দুই ঠোঁটে আর ঘন পালকে-ঘেরা বড় বড় চোখে সরল, নিষ্পাপ, আলগা একটু হাসি আটকে আছে।

মহিলার পরনে ঘরোয়া ধরনে পরা সাদা খোলের নকশা-পাড় তাঁতের শাড়ি আর হালকা বাদামি রঙের ব্লাউজ। কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ।

পশ্চিম দিগন্তের সারিবদ্ধ উঁচু উঁচু গাছগুলোর ওধারে কিছুক্ষণ আগে সূর্য নেমে গেছে। বিকেল আর সন্ধের মাঝখানে সময়টা থমকে রয়েছে যেন। রোদ নেই, আকাশের গায়ে যে ম্লান রক্তাভাটুকু লেগে আছে তার আয়ু আর কতক্ষণ! একটু পরেই ঝপ করে অন্ধকার নেমে আসবে।

যোগেন মাস্টার বললেন, 'দেখ, কাকে নিয়ে এসেছি।'

স্বামীর সঙ্গে অপরিচিত একজনকে দেখে আগেই মাথায় কাপড় তুলে দিয়েছিলেন আরতি। একটু অবাক হয়ে তিনি নিখিলেশের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

নিখিলেশ এবার বললেন, 'কী বৌদি, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি নিখিলেশ— নিখিলেশ মজুমদার।'

যোগেন মাস্টার বললেন, 'মাননীয় মন্ত্রীমশায়।'

নিখিলেশ সামান্য মজা করে বললেন, 'বর্তমান নয়, প্রাক্তন।'

ফুরিয়ে-যাওয়া বিকেলের আবছা আলোয় প্রথমটা সত্যিই নিখিলেশকে চিনতে পারেননি আরতি। আসলে বহুকাল তিনি তাঁদের বাড়িতে আসেননি। আজ স্কুলে যাওয়ার

সময় যোগেন মাস্টার অবশ্য বলেছিলেন, ছুটির পর তিনি স্টেশনে নিখিলেশের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। কিন্তু হুট করে যে ওঁকে একেবারে বাড়িতে এনে তুলবেন, ঘুণাক্ষরেও তা জানাননি। জানা থাকলে বুঝতে পারতেন, স্বামীর সঙ্গে কে এসেছেন। নিখিলেশকে না চেনার আরও একটা কারণ আছে। মন্ত্রী হওয়ার পর ক'বছরে তাঁর চেহারা অনেকখানি বদলে গেছে। দশ বছর আগের নিখিলেশের সঙ্গে এখনকার নিখিলেশের মিল সামান্যই।

আরতি হাতজোড় করে বললেন, 'কী সৌভাগ্য, অনেকদিন পর আমাদের বাড়িতে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল। আসুন-আসুন—'

নিখিলেশ বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক তাতে এ ধরনের কথা বললে খুব লজ্জা পাব।' একটু থেমে ফের বললেন, 'বহুকাল নানা কারণে আসা হয়নি বটে, তবু নিজেকে আপনাদের পরিবারের একজন বলে মনে করি।'

আরতি খুবই সাদাসিধে মানুষ। এই বয়সেও তাঁর মধ্যে কিশোরীর মতো স্নিগ্ধ সারল্য রয়েছে। যে যা বলে তাই বিশ্বাস করেন। বললেন, 'তা তো জানি।'

এ বাড়ির বাঁ দিকের শেষ ঘরটা ড্রয়িংরুম। মাঝখানে বেতের সস্তা ক'টা সোফা আর কাঠের সেন্টার টেবল সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বাইরের কেউ এলে এখানে বসানো হয়। এছাড়া রয়েছে চারটে আলমারি বোঝাই নানা বিষয়ের দুষ্প্রাপ্য সব বই। যোগেন মাস্টারে একটাই শখ — বই পড়া। প্রতি মাসে মাইনে পাওয়ার পর একবার তিনি কলকাতায় যান। কলকাতায় পুরনো বইয়ের দোকানগুলোতে হানা দিয়ে পছন্দমতো বই কিনে আনেন।

একটা টেলিফোনও আছে এই ঘরে। ওটা আরতির শখ। তাঁরা নিঃসন্তান। যোগেন মাস্টারের টুইশনি আছে, স্কুল আছে। বাইরে বাইরে দিনের অনেকটা সময় কেটে যায়। বাড়িতে একা থাকেন আরতি। তাঁর নিঃসঙ্গতা কাটানোর একটা উপায় তো চাই।

আরতির বাপের বাড়ি কলকাতায়। ভাইবোনদের সবারই বিয়ে হয়ে গেছে। ভাইরা বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে পৈতৃক বাড়িতেই থাকে। বোনেদের শ্বশুরবাড়িগুলোও কলকাতার নানা জায়গায়। মুখের কথা খসালেই হুট করে কলকাতায় যাওয়া যায় না। তাই সারাদিন ফোনে ভাইবোনদের সঙ্গে কথা বলেন আরতি। এতে সময়ও কাটে, নিজেকে ততটা নিঃসঙ্গ মনে হয় না। ভাবেন, প্রিয়জনদের মধ্যেই রয়েছেন। মাসের শেষে টেলিফোনের বিলটা একটু বেশিই আসে। যোগেন মাস্টার নিঃসন্তান স্ত্রীর মানসিক তৃপ্তির জন্য হাসিমুখেই এটুকু মেনে নেন।

নিখিলেশকে ড্রইংরুমে এনে বসানো হল। তিনি বললেন, 'বৌদি, যোগেনবাবু কিন্তু আমাকে আপনাদের বাড়িতে আনতে চাননি! আমি একরকম জোর করেই চলে এসেছি।'

স্বামীর দিকে তাকিয়ে আরতি জিজ্ঞেস করলেন, 'তাই নাকি গো?'

যোগেন মাস্টার মাথা নেড়ে জানালেন, 'হ্যাঁ।'

আরতি বললেন, 'কেন?'

'উনি তো শুধু দু-এক ঘন্টার জন্যে আসতে চাননি, কয়েকদিন থাকবেনও। একজন

মন্ত্রী যে স্টাইলে যে আরামে লাইফ কাটান, আমরা তার কতটুকু ব্যবস্থা করতে পারব? তাই —'

নিখিলেশ আরতিকে বললেন, 'আপনার কর্তাকে বোঝান তো বৌদি, আমি যে মন্ত্রী ছিলাম, এই ব্যাপারটা উনি মাথা থেকে যেন বার করে দেন। কত করে বলেছি, পুরনো বন্ধু হিসেবে আপনাদের কাছে থাকব। কিন্তু —'

আরতি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে হেসে হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, তাই থাকবেন। আপনারা গল্প করুন, আমি চা করে নিয়ে আসি। আপনার চায়ে চিনি দেব কি?'

নিখিলেশ বললেন, 'আমার ব্লাড সুগার নর্মাল, তবু সাবধানে থাকি। আধ চামচ চিনি দিতে পারেন।'

আরতি চলে গেলেন।

নিখিলেশ বললেন, 'আপনার এখানে টেলিফোন থাকায় খুব সুবিধে হল। কলকাতায় স্ত্রী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারব।'

যোগেন মাস্টার বললেন, 'যখন ইচ্ছে ফোন করবেন।' একটু ভেবে বললেন, 'এক কাজ করুন, এখনই বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিন কোথায় আছেন। এখানকার নাম্বারটাও দিয়ে দিন। দরকার হলে ওঁরাও কনট্যাক্ট করতে পারবেন।'

নিখিলেশ তাঁর স্ত্রী অনুপমার সঙ্গে কথা শেষ করে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখছেন, সেই সময় একটা পুরনো ট্রেতে চিড়ে ভাজা, কুচো নিমকি, ঘরে-তৈরি সন্দেশ আর চা নিয়ে এলেন আরতি।

এক চামচ চিড়ে ভাজা মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে নিখিলেশ বললেন, 'বৌদি, আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে।'

আরতি উৎসুক চোখে তাকালেন, 'কী অনুরোধ?'

'আমার জন্যে কোনও রকম বাড়াবাড়ি করবেন না। বাড়িতে রোজ যেমন রান্না হয় তার বাইরে এক্সট্রা কিছু করলে মনে করব আমি আপনাদের গেস্ট; বাড়ির কেউ নই।'

'ঠিক আছে, আপনি যা বললেন, সেটা আমার মনে থাকবে। কিন্তু—'

'কী?'

'আপনজনদেরও তো ভালমন্দ খাওয়াতে ইচ্ছে করে।'

নিখিলেশ হেসে ফেললেন, 'নাঃ, আপনার সঙ্গে পারার উপায় নেই।'

আরতি নিজের জন্যও চা নিয়ে এসেছিলেন। ছোট ছোট চুমুকে সেটা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'যাই। যে ঘরে আপনি থাকবেন সেটা গুছিয়ে দিতে হবে।' দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আপনার জিনিসপত্র কোথায়?'

নিখিলেশের এই প্রথম খেয়াল হল দু-চারদিন থাকার মতো জামাকাপড় টাপড় কিছুই সঙ্গে আনা হয়নি; একেবারে খালি হাতে চলে এসেছেন। তাঁর মুখে বিব্রত একটু হাসি ফুটে উঠল। বললেন, 'আনতে একদম ভুলে গেছি। কী করা যায় বলুন তো?'

আরতি বললেন, 'আনা যখন হয়নি, ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। বাড়িতে নতুন টুথ ব্রাশ, জিভ ছোলা আর তোয়ালে আছে। কিন্তু —'

'কী?'

'নতুন জামাকাপড় তো নেই।'

নিখিলেশ বললেন, 'যোগেনবাবুর ধুতি পাঞ্জাবি, বাড়িতে পরার লঙ্গি-টুঙ্গি — এ সব কয়েক সেট অছে তো?'

আরতি বললেন, 'তা আছে। পরশু দিনই লন্ড্রি থেকে তিনটে ধুতি, তিনটে পাঞ্জাবি আর দুটো লুঙ্গি কাচিয়ে এনেছি।'

'ওর থেকে দু-একটা দেবেন; কাজ চলে যাবে। যোগেনবাবুর আর আমার হাইট প্রায় এক। ওঁর জামা আমার গায়ে বেখাপ্পা লাগবে না।'

'ঠিক আছে।'

'জানেন বৌদি, অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ছে।'

'কী কথা?'

'তখনও আমার বিয়ে হয়নি। আপনিও তালবনিতে আসেননি। এক চিলতে ঘরে নোংরা বিছানায় একটা মাত্র বালিশে যোগেনবাবু আর আমি মাথা রেখে পাশাপাশি শুয়েছি।'

'আপনার বন্ধুর মুখে শুনেছি।'

একটু হেসে আরতি চলে গেলেন। তাঁর এখন অনেক কাজ। নিখিলেশের জন্য ঘর গোছ গাছ করে রান্নার আয়োজন করতে হবে। নিখিলেশ যদিও কোনও রকম বাড়াবাড়ি করতে বারণ করেছেন তবু মাননীয় অতিথিকে তো শুধু ডালভাত চচ্চড়ি খাওয়ানো যায় না। বাড়ির কাজের মেয়েটাকে দিয়ে মুরগির মাংস আর দই মিষ্টি আনাতে হবে। কালকের জন্য বেশ কয়েক টুকরো রুই মাছ ভেজে রেখেছিলেন। সেগুলো আজই রেঁধে ফেলবেন।

এতক্ষণ নিঃশব্দে চা, চিড়েভাজা টাজা খেয়ে যাচ্ছিলেন যোগেন মাস্টার। হঠাৎ অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলে উঠলেন, 'অন্যের ব্যবহার-করা জামা-কাপড় পরা, আরামের কোনও ব্যবস্থা নেই, এমন বাড়িতে থাকা — কৃচ্ছ্র সাধনটা একটু বেশিই হয়ে যাচ্ছে নিখিলেশবাবু।'

খোঁচাটা গায়ে মাখলেন না নিখিলেশ। তিনি জানেন, যতদিন এখানে থাকবেন, মাঝে সাঝেই এরকম হুল বেঁধানো মন্তব্য তাঁকে শুনতে হবে। এটাই যোগেন মাস্টারের স্বভাব, নিজের খরশান জিভটাকে কিছুতেই সামলে রাখতে পারেন না।

নিখিলেশ বললেন, 'এবার তা হলে শুরু করা যাক —'

যোগেন মাস্টার বললেন, 'যে কারণে আপনাকে ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাসে চড়ে তালবনিতে আসতে হয়েছে সেটা বলবেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'এখন তো সময় হবে না নিখিলেশবাবু।'

বাঁ হাতের কবজি উলটে ওয়েস্ট এন্ড ওয়াচ কোম্পানির পুরনো মডেলের গোলাকার, ঢাউস একটা ঘড়ি দেখে যোগেন মাস্টার বললেন, 'এখন ছ'টা বেজে পঁয়ত্রিশ। দু বাড়িতে টুইশনি আছে। ফিরতে ফিরতে সাড়ে ন'টা পৌনে দশটা হয়ে যাবে। খাওয়া দাওয়ার পর ঠাণ্ডা মাথায় শোনা যাবে।'

পাঁচ

মাঝখানের ঘরটায় খাটের ওপর নকশাওলা পরিষ্কার চাদর পেতে বিছানা করে দিয়েছিলেন আরতি। মাথার বালিশ এবং কোল বালিশের ওয়াড়ও পালটে দিয়েছেন। টেলিফোনটা ড্রইংরুম থেকে খুলে এনে এ ঘরে প্লাগ লাগিয়ে শিয়রের কাছে একটা ছোট নিচু টেবিলে রেখেছেন। ফোনটার পাশে ঢাকা-দেওয়া ঝকঝকে কাচের গেলাসে জলও রয়েছে। এ বাড়িতে টিভি নেই। যদি আকাশবাণীর খবরটবর শোনার প্রয়োজন হয় সেজন্য বিছানার একধারে একটা ট্রানজিস্টর রেডিও দেখা যাচ্ছে। মান্য অতিথির স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে পুরনো বন্ধুপত্নীর তীক্ষ্ণ নজর।

ট্রেন এবং সাইকেল রিকশায় প্রায় আশি বিরাশি কিলোমিটার রাস্তা পেরুতে হয়েছে নিখিলেশকে। বহুকাল এভাবে চলাফেরার অভ্যাস নেই তাঁর। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঘামে, পথের ধুলোবালিতে গা চটচট করছিল।

অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে আরতির দেওয়া লুঙ্গি এবং গেঞ্জি গায়ে দিয়ে এই মুহূর্তে মাঝখানের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছেন নিখিলেশ। ক্লান্তি কেটে গিয়ে নিজেকে বেশ সতেজ লাগছে। মাথার ওপর পাখা তো ঘুরছেই, শিয়রের এবং পায়ের দিকের জোড়া জানালা দিয়ে চৈত্রের উতরোল হাওয়া ঘরের ভেতর অবাধে বয়ে যাচ্ছে। সারা শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে তাঁর।

জানালা দিয়ে যতদূর চোখ যায় শুধুই বাড়িঘর। এর মধ্যে চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। এধারের রাস্তায় লোহার ল্যাম্পপোস্ট বসানো হয়নি। তালবনি মিউনিসিপ্যালিটি কাঠের উঁচু উঁচু খুঁটি পুঁতে একটা করে বাল্ব ঝুলিয়ে দিয়েছে। সেগুলোও জ্বলে উঠেছে।

সন্ধের পর এই অঞ্চলটায় রাস্তায় লোকজন দেখা যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তাদের কোনওরকম ব্যস্ততা নেই। বাতাসে তাদের মৃদু কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। প্রচুর বাড়ি টাড়ি হলেও এখানে ফাঁকা জায়গাও অনেক। আর রয়েছে ঝোপঝাড়, খাল, ডোবা, উঁচু উঁচু গাছ। কাছাকাছি কোনও গাছের মাথায় পাখিদের চেঁচামেচি আর ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ শোনা যায়। সারাদিন খাদ্যের সন্ধানে ঘোরাঘুরির পর ওরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে এসেছে। মাটির গভীর তলদেশ থেকে উঠে আসছে ঝিঁঝিদের একটানা কনসার্টের শব্দ।

পাখি বা ঝিঁঝির ডাক কতকাল যে শোনেননি নিখিলেশ! কিন্তু সেদিকে তাঁর মনোযোগ নেই। রাস্তায় রাস্তায় খুঁটির গায়ে যে টিমটিমে বাল্বগুলো জ্বলছে, অথবা বাড়িঘর, মানুষজন—কিছুই লক্ষ করছেন না তিনি। কোনও এক অলৌকিক টাইম মেশিনে চড়ে তিনি বহু বছর আগের সেই শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের দিনগুলোতে ফিরে যেতে লাগলেন।

নিখিলেশ তাঁর মা-বাবার একমাত্র সন্তান। বাবা ছিলেন মার্চেন্ট অফিসের কেরানি। মা খুব সাধারণ গৃহবধূ—বারো মাস, একটা না একটা অসুখে ভুগতেন। রোগ ছিল তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। ফি মাসেই বাবা যা মাইনে পেতেন তার অনেকটা অংশই ডাক্তার আর

ওষুধে খরচ হয়ে যেত। ফলে সংসার চালাবার জন্য নিয়মিত ধার করতে হ'ত। এ জাতীয় পরিবারগুলো যেমন হয়, মাসের পর মাস মুদি দোকানে বাকি, চায়ের দোকানে বাকি, বাড়ি ভাড়া বাকি। বাবাকে চোরের মতো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হ'ত।

নিদারুণ অভাব, অসুখ-বিসুখ, ঋণ, অসম্মান ইত্যাদি মিলিয়ে যে গ্লানিকর জীবন, তার চাপে মা-বাবার ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার কথা। তবু তাঁরা যে বেঁচে ছিলেন, কিংবা বলা যায় নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তার একমাত্র কারণ নিখিলেশ। ছেলেকে ঘিরে তাঁদের চোখের সামনে ছিল উজ্জ্বল, রঙিন একটা স্বপ্ন। এই স্বপ্নটা ওঁদের ক্ষীয়মাণ হৃৎপিণ্ডকে সচল রেখেছিল।

স্বপ্নটা আকারণে নয়। নিখিলেশ ছিলেন ছাত্র হিসেবে অসাধারণ। মাধ্যমিক থেকে বি. এ পর্যন্ত তাঁর রেজাল্ট চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো। মাধ্যমিকে সেকেন্ড, উচ্চ মাধ্যমিকে থার্ড, বি. এ'তে ইকনমিক্স অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। স্বাভাবিক নিয়মেই মা-বাবা আশা করেছিলেন, এম. এ'টা পাস করার পর ছেলে ভাল চাকরি করবে, তাঁদের দুর্দিন কেটে যাবে। সযত্নে বাঁচিয়ে রাখা দীর্ঘকালের স্বপ্নটা সার্থক হবে। কিন্তু ইচ্ছাপূরণ সম্ভব হয়নি।

কলেজে পড়তে পড়তে নিখিলেশের মাথায় রাজনীতি ঢুকে গিয়েছিল। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর তাই নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। যে রাজনৈতিক দলের তিনি মেম্বার হলেন তারা শ্রেণীহীন, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ। বৈষম্য থাকবে না, বিভেদ থাকবে না, বঞ্চনা থাকবে না—আদর্শ হিসেবে এর চেয়ে বড় বা মহৎ আর কী হতে পারে! তাঁর সেই বয়সে আবেগ যখন গভীর এবং তীব্র, পুরনো পচাগলা মান্ধাতার আমলের সোসাল সিস্টেম ভেঙে স্বপ্নের এক পৃথিবী সৃষ্টির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিখিলেশ। দলের সংগঠন নিয়ে তখন তিনি এমনই ব্যস্ত যে পরপর দুটো বছর এম. এ পরীক্ষাটা আর দেওয়াই হয়ে উঠল না।

শেষ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটিও ছাড়তে হল নিখিলেশকে। তখনও জমিদারি প্রথার অবসান ঘটেনি। কৃষকদের ওপর প্রচণ্ড অবিচার আর শোষণ চলছে গোটা দেশ জুড়ে।

দল থেকে নিখিলেশকে তালবনিতে পাঠানো হল। এখানকার চারপাশে পঞ্চাশ-ষাটটা গ্রামে যত ভূমিহীন খেতমজুর আছে তাদের সংগঠিত করে প্রথমে তাঁকে বোঝাতে হবে কতভাবে তারা বঞ্চিত বা শোষিত হচ্ছে। সচেতনতা বাড়ানোর পর এদের নিয়ে ব্যাপকভাবে গড়ে তুলতে হবে আন্দোলন।

নিখিলেশ তো একটা বড় মাপের স্বপ্নের সন্ধান পেয়ে গেছেন কিন্তু তুচ্ছ দু'টি মানুষ অর্থাৎ তাঁর মা-বাবার সামান্য একটা স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

নিখিলেশ তালবনিতে আসার মাস দেড়েকের ভেতর মা এবং বাবা দু'জনেই মারা যান। নিখিলেশ যে ধাক্কাটা তাঁদের দিয়েছেন তা সামলে ওঠার শক্তি ওঁদের ছিল না। কিংবা এমনও হতে পারে, বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাই তাঁদের শেষ হয়ে গিয়েছিল।

মা-বাবার মৃত্যুতে কষ্ট তাঁর অবশ্যই হয়েছে। সন্তান হিসেবে তিনি যে আদৌ কোনওরকম দায়িত্ব বা কর্তব্য করেননি সেজন্য অনুতাপও। প্রবল এক অপরাধবোধ বহুকাল তাঁকে তাড়া করে বেড়িয়েছিল যেন।

মনে পড়ছে তালবনিতে আসার পর কিষাণদের নিয়ে সংগঠন করাটা খুব সহজ হয়নি। অক্ষরপরিচয়হীন, ভীরু, অসহায় মানুষগুলো প্রথম প্রথম তাঁকে এড়িয়ে যেত, কোনও প্রশ্ন করলে উত্তর দিত না, অনেকে তাঁকে দেখলেই পালিয়ে যেত। শহর থেকে আচমকা একটা লোক এসে তাদের ভাল করতে চাইছে, এটা আদপেই বিশ্বাস করতে পারেনি। ওদের মনে হয়েছে, নিখিলেশের মাথায় নিশ্চয়ই কিছু একটা অভিসন্ধি আছে।

দিনের পর দিন মাটি কামড়ে পড়ে থাকার পর গ্রামের মানুষদের সন্দেহ কেটেছে। তারা বুঝতে পেরেছে নিখিলেশ সত্যিই তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী; তিনি তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করবেন না। এরপর প্রায়ই রাত্রিবেলা গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষীদের নিয়ে জমায়েত করেছেন নিখিলেশ। জমিমালিকেরা কিভাবে পুরুষানুক্রমে তাদের সর্বনাশ করে আসছে, সবাইকে জলের মতো বুঝিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, মুখ বুজে চিরকাল এসব মেনে নেওয়া উচিত না। নিজেদের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায় করে নিতে হবে। তার জন্য চাই জোরদার আন্দোলন। চাষীরা প্রথম প্রথম রাজি হয়নি। পরাক্রান্ত জমিমালিকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে বুকের পাটা চাই। গোড়ায় ততটা সাহস ওদের ছিল না।

একদিকে ছিল কিষাণরা, অন্যদিকে মারাত্মক এক প্রতিপক্ষ। তারা জমিমালিক। গ্রামে গ্রামে ঘুরে নিখিলেশ যে চাষীদের তাতাচ্ছেন, তাদের দাবি এবং অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলছেন, সেই খবরটা তাদের কানেও পৌঁছে গিয়েছিল। শহর থেকে উটকো একটা লোক এসে তাদের স্বার্থে ঘা দেবার চেষ্টা করছে, এটা কে আর মেনে নিতে চায়!

এখনকার মতো সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছর আগেও পয়সাওলা লোকেরা মাসলম্যান পুষত। বিশেষ করে বড় বড় জমিমালিকেরা। আজকাল যেমন এ কে-৪৭ রাইফেল বা কারবাইন আকছার দেখা যায় তখন সেসব চোখে পড়ত না। তবে পুরনো আমলের বন্দুক যথেষ্টই ছিল।

নিখিলেশ তখন থাকতেন রেল স্টেশনের কাছাকাছি কুড়ি টাকা ভাড়ার আট ফিট বাই সাত ফিট মাপের ঘুপচি একখানা ঘরে। সেটাই ছিল যুগপৎ তাঁর পার্টির অফিস এবং বাসস্থান। একদিন সকালে, তখন সবে রোদ উঠেছে, কাঁধে দোনলা বন্দুক চাপিয়ে চারটে লোক শিকারি কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে সেখানে এসে হাজির। তারা শাসিয়ে গিয়েছিল, এই অঞ্চলে আবহমান কাল শান্তি বজায় আছে। কেউ এখানে চাষীদের খেপিয়ে গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করলে কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। এর ফল হবে মারাত্মক। নিখিলেশ শিক্ষিত মানুষ, ভদ্রলোক। তিনি যেন গ্রামগুলোর দিকে আর পা না বাড়ান।

নিখিলেশ চুপচাপ শুনে গেছেন, ওদের কথার উত্তর দেননি।

মনে আছে, বন্দুকবাজরা যেদিন শাসিয়ে যায়, তার পরদিন যোগেন মাস্টার তালবনি হাইস্কুলের চাকরি নিয়ে এখানে এসেছিলেন। তাঁর এক হাতে ছিল টিনের রংচটা সুটকেশ, আর এক হাতে দড়ি দিয়ে বাঁধা, শতরঞ্চিতে-মোড়া একটা বিছানা। ট্রেন থেকে নেমে তিনি সোজা স্কুলে যাননি, একটা আস্তানার জন্য স্টেশনের কাছাকাছি বাড়িগুলোতে খোঁজ করছিলেন।

তখন তালবনি আর কতটুকু জায়গা! স্টেশনের ধারে কাছে কিছু দোকানপাট এবং পঞ্চাশ ষাটটা বেঢপ চেহারার বাড়ি, এর বেশি আর কিছু ছিল না।

নিখিলেশ তাঁর ঘরে বসে যোগেন মাস্টারকে লক্ষ করছিলেন। তালবনির বাসিন্দাদের সবাইকে তিনি চেনেন। হঠাৎ একটা অচেনা লোককে হন্যে হয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাঁর কৌতূহল হয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যোগেন মাস্টারের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর সমস্যাটা জানতে পেরেছিলেন তিনি এবং দশ মিনিটের ভেতর তার সুরাহা হয়ে গিয়েছিল।

নিখিলেশ যে ঘরটায় থাকতেন তার পাশের ঘরটা ফাঁকা পড়ে ছিল। বাড়িওলার সঙ্গে কথা বলে যোগেন মাস্টারের জন্য কুড়ি টাকা ভাড়াতেই ওটা ঠিক করে দিয়েছিলেন তিনি।

পাশাপাশি ঘরে বেশ কিছুদিন তাঁরা কাটিয়েছেন। পরস্পরকে তাঁদের খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। কথায় কথায় নিখিলেশ জেনেছেন, যোগেন মাস্টারের বাড়ি উত্তর বাংলায়, মা-বাবা ভাই-বোন কেউ নেই। তবে তিনি বিবাহিত। স্ত্রী আছেন তাঁর এক পিসির বাড়িতে। তালবনি হাইস্কুলের চাকরিটা পাকা হয়ে গেলে তাঁকে এখানে নিয়ে আসবেন।

যোগেন মাস্টারকে ভাল লাগার সবচেয়ে বড় কারণ, লোকটা অত্যন্ত স্পষ্টভাষী, নির্লোভ এবং আদ্যোপান্ত সৎ। মিথ্যাচার ব্যাপারটা তাঁর স্বভাবে নেই। এমন শক্ত মেরুদণ্ডের মানুষ ক্বচিৎ কখনও চোখে পড়ে। নিখিলেশ তাঁকে রাজনীতিতে টানার অনেক চেষ্টা করেছেন, যোগেন মাস্টার রাজি হননি। বলেছেন, 'দেশের জন্যে রাজনীতির যেমন প্রয়োজন, তেমনি শিক্ষারও। ছাত্রদের ভাল করে পড়ানোও দেশের কাজ। রাজনীতি করতে গিয়ে আমি সেই কাজটায় ফাঁকি দিতে চাই না।'

নিখিলেশও তাঁর জীবনের সব কথা যোগেন মাস্টারকে জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোতে যাঁর অমন দারুণ রেজাল্ট, তিনি ইচ্ছা করলেই একটা দুর্দান্ত কেরিয়ার তৈরি করে নিতে পারতেন। কিন্তু কোনও মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির টপ একজিকিউটিভের চাকরি, কিংবা আই এ এস বা আই পি এস হয়ে চোখ ধাঁধানো সরকারি পোস্ট, বিশাল অঙ্কের মাইনে, পার্কস, গাড়ি, সাজানো-গোছানো বিরাট ফ্ল্যাট—উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনা গলা টিপে মেরে তিনি চলে এসেছেন তালবনিতে। 'বহুজন হিতায়' নিজের জীবন সঁপে দিয়েছেন। থাকেন আলোবাতাসহীন এমন একটা খুপরিতে যেখানে ভাল করে হাত-পা মেলা যায় না, ঘুরে বেড়ান চাষাভুষোদের গাঁগুলোতে আর ভাবেন বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত এক নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন। এমন স্বপ্নদর্শী মানুষ আগে আর কখনও দেখেননি যোগেন মাস্টার। বলেছেন, 'আপনি নমস্য লোক। আপনাদের মতো আইডিয়ালিস্টদের কথা বইতেই পড়া যায়। কোনওদিন চোখে দেখতে পাব, ভাবতে পারিনি।'

পারস্পরিক শ্রদ্ধা দু'জনের বন্ধুত্বকে নিবিড় করে তুলেছিল।

সেই যে বন্দুকবাজরা শাসানি দিয়ে গিয়েছিল সেটা গ্রাহ্য করেননি নিখিলেশ। আগের মতোই রাতের দিকে চারপাশের গ্রামগুলোতে গিয়ে নিয়মিত জমায়েত করছিলেন।

শাসানিটা যে ফাঁপা মুখের কথা নয়, সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিল বন্দুকবাজেরা। একদিন রাতে গ্রাম থেকে ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে ফেরার সময় এলোপাথাড়ি বন্দুকের কুঁদো চালিয়ে নিখিলেশের মাথা, কপাল, কনুই ফাটিয়ে তাঁকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল।

সারারাত বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিলেন নিখিলেশ। রক্তে তাঁর সারা শরীর, জামাকাপড় ভেসে গিয়েছিল। পরদিন কিষাণরা তাঁকে দেখতে পেয়ে তালবনিতে তাঁর ঘরটিতে নিয়ে আসে। তখনও তাঁর জ্ঞান ফেরেনি।

স্কুলে যাবার জন্য তোড়জোড় করছিলেন যোগেন মাস্টার। রক্তাক্ত নিখিলেশকে দেখে চমকে উঠেছিলেন। তক্ষুণি ডাক্তার ডেকে এনেছেন তিনি। সেদিন তো বটেই, তারপর আরও চারদিন স্কুলে যাওয়া হয়নি তাঁর। দিবারাত্রি বন্ধুর পাশে ঠায় বসে থেকে তাঁকে সুস্থ করে তুলেছেন। কাছের এবং দূরের গাঁগুলো থেকে কিষাণরা এসে ঘরের সামনে বিষণ্ণ মুখে বসে থাকত। যে মানুষটা নিঃস্বার্থভাবে তাদের জন্য ভাবেন তাঁকে এভাবে মারাটা কেউ মেনে নিতে পারেনি।

শুধু সেই একটা দিনই নয়, এরপর আরও কয়েক বার নিখিলেশকে মারাত্মকভাবে জখম করা হয়েছে। খুন করারই উদ্দেশ্য ছিল, নেহাত আয়ু ছিল বলে বেঁচে গেছেন। তাঁর সারা গায়ে কত যে ক্ষতচিহ্ন রয়েছে তার হিসেব নেই।

মনে পড়ে, যতবারই তাঁকে জখম করা হয়েছে, যোগেন মাস্টার সর্বক্ষণ পাশে থেকে অক্লান্ত শুশ্রূষায় সুস্থ করে তুলেছেন। এমন বন্ধু সত্যিই দুর্লভ। তাঁর প্রতি নিখিলেশের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

যোগেন মাস্টার বলেছেন, 'আপনি অদ্ভুত মানুষ নিখিলেশবাবু। যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি।'

মৃদু হেসে নিখিলেশ বলেছেন, 'অবাক হওয়ার কারণ?'

উত্তর না দিয়ে যোগেন মাস্টার প্রশ্ন করেছেন, 'আপনার কি মৃত্যুভয় নেই?'

নিখিলেশ বলেছেন, 'বহুকালের একটা কায়েমী ব্যবস্থা যার সঙ্গে কিছু মানুষের স্বার্থ জড়িয়ে আছে সেটাকে ভাঙতে চেষ্টা করলে পালটা আঘাত তো আসবেই। আপনাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, যে সোসাল সিস্টেমকে আমরা বদলাতে চাই তা কি ওরা সহজে মেনে নেবে?' একটু থেমে আবার বলেছে, 'এর জন্যে প্রচুর রক্ত দিতে হবে। মৃত্যুকে আমি খুব একটা ভয় পাই না।'

এই কথাগুলো অন্য কেউ বললে মনে হ'ত বড় বেশি সাজানো। কিষাণ মজুরদের নিয়ে একটা সময় প্রচুর নাটক হয়েছে। সেই নাটকগুলোতে সংগ্রামী নায়কের মুখে এই ধরনের সংলাপ শোনা যেত। কিন্তু নিখিলেশ যেভাবে, যে বিশ্বাস থেকে কথাগুলো বলেছেন তা যেমন আন্তরিক তেমনই স্বতঃস্ফূর্ত।

বার বার নিখিলেশের এই মার খাওয়ার কারণে চারিদিকের গ্রামগুলোতে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তীব্র। খেতমজুরদের কাছে তখন তিনি প্রায় ঈশ্বরের মতো। তাঁর ভাবমূর্তি দিন দিন আরও বেশি করে উজ্জ্বল হচ্ছিল। নিখিলেশ বুঝতে পারছিলেন, জমি প্রস্তুত। এবার ব্যাপকভাবে আন্দোলনে নামা যেতে পারে। তালবনির চারপাশে যে ক'জন বড়

জমিমালিক ছিল তাদের সবার সঙ্গে দেখা করে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, কিষাণদের মজুরি তো বাড়াতে হবেই, ফসলের ন্যায্য একটা ভাগও তাদের দিতে হবে। জমিমালিকেরা আদপেই তাতে রাজি হয়নি। এতদিন মেরে শাসিয়ে তাঁকে দমিয়ে রাখতে চেয়েছে। এবার পদ্ধতিটা পুরোপুরি পালটে ফেলল। প্রচুর টাকার লোভ দেখিয়ে আন্দোলন থেকে তাঁকে সরে যেতে বলল। তাদের ধারণা, এই নতুন ফাঁদে নিশ্চিতভাবেই পা দেবেন নিখিলেশ।

নিখিলেশ বলেছিলেন, 'ঘুষ নিয়ে গরিব চাষীদের বিক্রি করতে বলছেন? আমি কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নই।'

জমিমালিকেরা বুঝিয়েছে, ঘুষ শব্দটা খারাপ। নিখিলেশ যেন ব্যাপারটা ওভাবে না নেন। বন্ধু হিসেবে তারা ওঁকে কিছু উপহার দিচ্ছে।

নিখিলেশ বলেছেন, 'উপহারের মোড়কে ওটা ঘুষই। তাছাড়া আপনাদের বন্ধু হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কারণ?'

'কারণ আপনাদের আর আমার ক্লাস আলাদা।'

জমিমালিকেরা এবার বলেছে, 'দেখুন এতকাল ধরে যা চলে আসছে সেটা সব পক্ষই, মানে আমরা এবং কিষাণরা, মেনে চলছি। চালু সিস্টেমকে চলতে দেওয়াই তো উচিত।'

নিখিলেশ বলেছেন, 'এটা নতুন কোনও কথা নয়। আপনাদের বন্দুকবাজরাও আগেই আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল, স্টেটাসকো বজায় রাখতে হবে। স্থিতাবস্থা কোনওভাবেই ডিসটার্ব করা চলবে না। কিন্তু —'

'কিন্তু কী?'

'যে সিস্টেমটা বহু মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর তা কি চালাতে দেওয়া উচিত?'

জমিমালিকেরা উত্তর দেয়নি। অসহ্য রাগে তাদের মুখ থমথম করছিল। মনে হচ্ছিল যে কোনও মুহূর্তে একটা বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

নিখিলেশ আবার বলেছেন, 'বংশ পরম্পরায় আপনারা এক্সপ্লয়েট করে চলেছেন। সেটা আর চলতে দেওয়া হবে না।'

জমিমালিকেরা এবার ফেটে পড়েছিল, 'আপনি তা হলে নিজের গোঁ ছাড়বেন না?'

'গোঁ বলবেন না। ওটা ন্যায্য দাবি।'

'যদি ক্ষমতা থাকে দাবিটা আদায় করে নেবেন।'

এরপর তালবনির চারপাশের পঞ্চাশ ষাটটা গ্রাম তুমুল আন্দোলনে তোলপাড় হয়ে গেছে। কিষানরা জমিমালিকের খেতে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। বাইরে থেকে লোক এনে চাষ করানোর চেষ্টা করেছিল জমিমালিকেরা, কিষানদের বাধায় তা সম্ভব হয়নি। তখন প্রতিদিন মিটিং, মিছিল আর জমিমালিকদের বাড়িতে হানা দেওয়া চলছিল।

জমিমালিকরাও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকেনি। তাদের বন্দুকবাজ আর লাঠিয়ালরা তো ছিলই, পুলিশ ডেকেও কিষানদের ওপর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গুলিতে লাঠিতে কত যে জখম হয়েছে তার হিসেব নেই। মনে পড়ে, জন পাঁচেক চাষী মারা গিয়েছিল।

নিখিলেশের উরুতে একটা গুলি লেগেছিল, তার কালো দাগ এখনও থেকে গেছে। শুধু তাই নয়, গাঁকে গাঁ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

পৃথিবীর হট্টগোল থেকে বহুদূরে শান্ত নিরিবিলি তালবনি এবং তার চারপাশের গ্রামগুলো তখন খবরের কাগজের শিরোনামে উঠে এসেছে। এমন ব্যাপক কৃষক আন্দোলন এর আগে আর কখনও হয়নি। নিখিলেশ মজুমদারের নাম তখন সবার মুখে মুখে।

ধীরে ধীরে আন্দোলন থিতিয়ে এল। এত রক্তপাত এবং মৃত্যু ব্যর্থ হল না। অনেকগুলো দাবি জমিমালিকেরা শেষ পর্যন্ত মেনে নেয়।

এ অঞ্চলে নিখিলেশের তখন বিপুল জনপ্রিয়তা। তাঁর এক ডাকে হাজার হাজার মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। এখানে তিনি যা বলবেন সেটাই শেষ কথা।

এদিকে তালবনিতে জনবিস্ফোরণ ঘটছিল। দূর দূর গ্রাম থেকে তো বটেই, বাইরে থেকেও মানুষের ঢল নেমেছিল। ফলে শহরটা রেল স্টেশনের গায়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি, চারিদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। এলোপাথাড়ি যেখানে সেখানে বাড়ি উঠছিল; সেই সঙ্গে নানা ধরনের কলকারখানাও। শুধু কৃষক সংগঠনই না, কারখানার শ্রমিকদের নিয়েও তিনি ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিলেন। কৃষক এবং শ্রমিক—নিখিলেশ দুই ফ্রন্টেরই তখন একচ্ছত্র জননায়ক।

আরও দু-চারটে রাজনৈতিক দলের কর্মী এখানে এসে সংগঠন করার চেষ্টা করছিল। বিশেষ করে নিবারণ হালদার। কিন্তু তাঁদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায়নি।

নিখিলেশদের পার্টির কর্মী এবং সমর্থক এতই বেড়ে যাচ্ছিল যে স্টেশনের কাছের সেই ছোট্ট ঘুপচি ঘরটায় আর কুলোচ্ছিল না, তাঁরা শহরের মাঝামাঝি জায়গায় একটা তেতলা বাড়ির পুরো নিচের তলাটা ভাড়া নিয়ে উঠে গিয়েছিলেন। যোগেন মাস্টারও আর পাশের ঘরটায় থাকেননি, তাঁদের পার্টি অফিসের কাছাকাছি দু-কামরার একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিলেন। ততদিনে তালবনি হাইস্কুলে তাঁর চাকরি পাকা হয়ে গেছে, পিসির বাড়ি থেকে স্ত্রীকে নিয়ে এসে বিয়ের পর এই প্রথম সংসার পেতেছিলেন।

এক বাড়িতে না থাকলেও রোজই স্কুল ছুটির পর পার্টি অফিসে এসে নিখিলেশের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়ে যেতেন যোগেন মাস্টার। নিখিলেশও হাজার ব্যস্ততার মধ্যে সময় করে যোগেন মাস্টারের বাড়ি যেতেন। বেশির ভাগ দিন খাওয়া-দাওয়াটা হ'ত ওখানেই। যোগেন মাস্টার বলতেন, 'মশাই, আপনার মতো ডেডিকেটেড পলিটিক্যাল ওয়ার্কার আমি আর একজনও দেখিনি।'

নিখিলেশ উত্তর দিতেন না, শুধু হাসতেন।

যোগেন মাস্টারের স্ত্রী আরতিও নিখিলেশকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। এই নির্লোভ, মালিন্যহীন জননেতাটিকে দেখলেই তাঁর ভীষণ ভাল লাগত। একদিন বলেছিলেন, 'একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছে হয়—'

নিখিলেশ বলেছেন, 'কী কথা?'

'আপনার কি নিজস্ব জীবন বলতে কিছু নেই? সবই জনগণকে উৎসর্গ করেছেন?'

'আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না বৌদি—'

আরতি বলেছেন, 'চিরকাল কৃষক আর শ্রমিকদের নিয়েই কি কাটিয়ে দেবেন?'

একদৃষ্টে আরতির দিকে তাকিয়ে নিখিলেশ হাসিমুখে বলেছেন, 'বিয়ে টিয়ে করে সংসারী হব কিনা, এটাই বোধহয় জানতে চাইছেন?'

'ঠিক তাই।'

'বিয়ে করব না, এমন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আমার নেই। আপনারা আমার অত্যন্ত আপনজন। আপনাদের কাছে বলতে আপত্তি নেই, একজন অনেকদিন অপেক্ষা করে আছে। তার প্রতি আমার কর্তব্যটা পালন করা দরকার।' বলতে বলতে একটু চুপ করেছেন নিখিলেশ। তারপর ফের শুরু করেছেন, 'এতদিন নানা কাজে জড়িয়ে ছিলাম। এবার একটু সময় পেয়েছি। ভাবছি, ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলব।'

আরতি লাফিয়ে উঠেছিলেন, 'কে তিনি? কোথায় তাঁকে লুকিয়ে রেখেছেন?'

যোগেন মাস্টারের আবেগ টাবেগ খুবই কম। কোনও কারণেই উচ্ছ্বসিত হ'ন না। তিনিও প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, 'আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই। ভাবতাম পলিটিকস ছাড়া জীবনে আর কিছুই বোঝেন না। পাশাপাশি দু-আড়াই বছর কাটালাম। কোনও দিন ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দেননি একটি প্রেমিকা আপনার পথ চেয়ে বসে আছেন।'

হেসে হেসে নিখিলেশ বলেছেন, 'আপনি কি কখনও জানতে চেয়েছেন?'

'কী আশ্চর্য, আপনার যা চালচলন, অ্যাক্টিভিটি, তার আড়ালে একজন রোমান্টিক হিরো যে ঘাপটি মেরে রয়েছে, কী করে বুঝব?'

নিখিলেশ উত্তর দেননি।

যোগেন মাস্টার ফের বলেছেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম জিতেন্দ্রিয় শুকদেব হয়েই লাইফ কাটিয়ে দেবেন।'

মেয়েদের কৌতূহল অনেক তীব্র। আরতির আর তর সইছিল না। উৎসুক সুরে বলেছিলেন, 'ও সব আজেবাজে কথা থাক। নিখিলেশদা রবীন্দ্রনাথের গানের একটা লাইন একটু পালটে বলছি — 'দিবস রজনী আমি তার আশায় আশায় থাকি'—এটা যাঁর মনের কথা তাঁর সম্বন্ধে ডিটেলে জানতে চাই। কিচ্ছু বাদ দেবেন না।' আরতির বাংলায় অনার্স ছিল। কথায় কথায় তাঁর মুখ থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের লাইন বেরিয়ে আসত।

নিখিলেশ তাঁর জীবনের একটা সঙ্গোপন দিকের কথা দুই প্রিয়জনের কাছে বলতে শুরু করেছিলেন।

অনুপমা মৈত্র ছিলেন কলেজে তাঁর সহপাঠিনী। একই সাবজেক্টে তাঁদের অনার্স ছিল। চল্লিশ বছর আগে ছেলেমেয়েদের মেলামেশাটা এখনকার মতো সহজ ছিল না। আজকাল কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা তো পরস্পরকে তুই করে বলে। একসঙ্গে বসে চুটিয়ে আড্ডা দেয়, সিনেমা দেখে, এক্সকারসনে গিয়ে হুল্লোড় বাধায়। সে আমলে এসব ভাবাই যেত না।

ক্লাসে মেয়েরা একধারে বসত, ছেলেরা আরেক দিকে। মাঝখানে বিভাজিকা রেখার মতো অনেকটা ফাঁকা জায়গা। কাছাকাছি বসে ক্লাস করলে যা হয়, মাঝেমধ্যে ছেলেদের সঙ্গে সহপাঠিনীদের দু-একটা কথা হ'ত। তবে তা নেহাতই মামুলি। একালের মতো তুই-টুইয়ের প্রশ্নই নেই। পরস্পরকে তারা আপনি করে বলত। দু'পক্ষই একটা অদৃশ্য, শোভন দূরত্ব বজায় রেখে চলত।

অনুপমার সঙ্গে কিভাবে আলাপ হয়েছিল, এখন আর মনে পড়ে না। প্রথম দিকে সাধারণ ভদ্রতাসূচক দু-চারটে কথা হয়ে থাকতে পারে। নিখিলেশ তখন রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছেন, তবে পড়াশোনায় অবহেলা করতেন না, নিয়মিত কলেজে যেতেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যাপকদের লেকচার শুনতে শুনতে বা নোট নিতে নিতে হঠাৎ হয়তো নজরে পড়ত, অনুপমা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখাচোখি হলে অনুপমার মুখে রক্তাভা ফুটে উঠত। তিনি দ্রুত চোখ নামিয়ে নিতেন।

কিছুদিনের মধ্যে নিখিলেশ মেয়েদের বেঞ্চগুলোর দিকে না তাকিয়েও টের পেতে লাগলেন, একজোড়া অপলক চোখ প্রায় সারাক্ষণ তাঁকে লক্ষ করছে। তখন তাঁর বয়স আর কত? একুশ কি বাইশ। এমনটা আগে কখনও ঘটেনি। ঘাড় গুঁজে পড়াশোনা আর রাজনীতি করা ছাড়া অন্য কোনও দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল না। কিন্তু যৌবন এমন একটা ব্যাপার যার ভেতর অলৌকিক ম্যাজিক লুকনো থাকে। একটি সুশ্রী তরুণী ক্লাসে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে, এই ভাবনাটাই তাঁর বাইশ বছরের হৃৎপিণ্ডে উৎরোল ঝড় তুলে দিয়েছিল।

ক্লাসে বসে দূর থেকে তাকানোর মধ্যেই ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ রইল না। সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার পর হঠাৎ পুরো একটা সপ্তাহ কলেজে এলেন না অনুপমা। রাজনীতি-করা অর্থনীতির মেধাবী ছাত্রটির মনে হল, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। কোথায় যেন একটা মধুর সিমফনি বাজতে শুরু করেছিল; আচমকা সেটা থেমে গেছে।

নিখিলেশের খুব ইচ্ছে করছিল, ঠিকানা জোগাড় করে অনুপমাদের বাড়ি যান। ভীষণ উৎকণ্ঠা হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু সে আমলে না ডাকলে সহপাঠিনীর বাড়ি যাওয়াটা কেউ ভাল চোখে দেখত না। এটা গর্হিত অপরাধের মধ্যে পড়ত।

সাতদিন পর আবার কলেজে এসেছিলেন অনুপমা। তাঁকে দেখে বুকের অতল স্তর থেকে খুশির একটা ঝলক লাফ দিয়ে উঠে এসে নিখিলেশের মুখেচোখে যে ছড়িয়ে গিয়েছিল সেটা অনুপমার চোখেও পড়েছে। তাঁর ঠোঁটে হাসির চকিত একটা রেখা ফুটে উঠেছিল।

সেদিনই নিখিলেশের জীবনে পরমাশ্চর্য ঘটনাটি ঘটে গিয়েছিল। তাঁদের বাড়ি থেকে কলেজ অনেকটা দূরে। বাসে বা ট্রামে যাতায়াত করতে হ'ত।

ছুটির পর বাস রাস্তার দিকে যাচ্ছিলেন তিনি, হঠাৎ চাপা গলার ডাক কানে এসেছিল, 'একটু শুনুন—'

চমকে ঘুরে তাকিয়েছিলেন নিখিলেশ। ডান পাশে একটা সরু গলির ভেতর দাঁড়িয়ে আছেন অনুপমা। মনে হয়েছিল তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছেন। ব্যাপারটা এমনই

অবিশ্বাস্য যে বেশ কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে থেকেছেন নিখিলেশ, তারপর প্রায় ঘোরের মধ্যেই যেন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছেন। জিজ্ঞেস করেছেন, 'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ।' অনুপমা বলেছেন, 'কাইন্ডলি আমাকে একটু সাহায্য করবেন?'

হঠাৎই নিখিলেশের মনে পড়েছিল, একটা সপ্তাহ অনুপমা কলেজে না আসায় তিনি উৎকণ্ঠিত ছিলেন। অনুপমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'সাতদিন ক্লাস করেননি কেন?'

অনুপমা বলেছেন, 'জ্বর হয়েছিল।'

'আমি তো ভেবেছিলাম—' বলতে বলতে চুপ করে গিয়েছিলেন নিখিলেশ।

অনুপমা জিজ্ঞেস করেছেন, 'কী ভেবেছিলেন?'

দ্বিধান্বিতভাবে নিখিলেশ বলেছেন, 'ঠিকানা জোগাড় করে আপনাদের বাড়ি চলে যাব।'

অনুপমা চমকে উঠেছেন। স্থির দৃষ্টিতে নিখিলেশকে লক্ষ করতে করতে বলেছেন, 'গেলেই পারতেন।'

'সাহস হয়নি।'

'কেন?'

'আমি হঠাৎ গিয়ে উঠলে বাড়ির লোকেরা কি খুশি হতেন?'

অনুপমা উত্তর না দিয়ে মুখ নামিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর নীরবতার কারণ বুঝতে অসুবিধা হয়নি নিখিলেশের। ওঁদের বাড়িতে গেলে অনুপমাকে ভীষণ বিব্রত করা হ'ত।

নিখিলেশ অনুপমার অস্বস্তি কাটিয়ে দেবার জন্য বাড়ি যাবার প্রসঙ্গ আর তোলেননি। বলেছেন, 'যাক, কী সাহয্যের কথা যেন বলছিলেন—'

অনুপমা বলেছেন, 'একটা উইক অ্যাবসেন্ট ছিলাম। এর মধ্যে প্রফেসররা ক্লাসে যে নোটস দিয়েছেন তার ওপর বেস করে নিশ্চয়ই নানা কোশ্চেনের অ্যানসার লিখেছেন।'

'হ্যাঁ, লিখেছি। কেন বলুন তো?'

'কাইন্ডলি আমাকে দু-তিন দিনের জন্যে দেবেন? টুকে নিয়ে ফেরত দিয়ে দেব।'

'এই ব্যাপার? এর জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন!' মজার গলায় অন্য সহপাঠিনীদের নাম করে নিখিলেশ বলেছেন, 'আপনার এই বান্ধবীদের কাছ থেকে অ্যানসারগুলো নিলেই তো পারতেন।'

গাঢ় গলায় অনুপমা বলেছেন, 'ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টের অ্যানসারগুলো পেলে আমি অনেক বেশি উপকৃত হব।'

'ফ্ল্যাটারি?'

'মোটেও না। দিস ইজ অ্যাবসোলুটলি ট্রু।'

সেই শুরু। তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই ক্রমশ তাঁরা ঘনিষ্ঠ হচ্ছিলেন। তবে কলেজ কমপাউন্ডের ভেতর কখনও কথা বলতেন না। তাঁদের নিয়ে হাজারটা গসিপের সৃষ্টি হোক, হাওয়ায় হাওয়ায় গালগল্প উড়তে থাকুক, এসব দু'জনের কারোরই পছন্দ নয়।

প্রেম ট্রেম খুবই পুরনো ব্যাপার। নিখিলেশদের আগে এই কলকাতা মেট্রোপলিসে

হাজার হাজার যুবক-যুবতী পরস্পরকে ভালবেসেছে।

আজকাল এই শহরে ফাঁকা জায়গা বলতে কিছু নেই। রাস্তাগুলো খানাখন্দে বোঝাই, ফুটপাথগুলো ভাঙাচোরা, পার্কগুলো অ্যান্টিসোসালদের অভয়ারণ্য। যেদিকেই যাওয়া যাক, মুক্ত মূত্রাঙ্গন। সর্বত্র আবর্জনার পাহাড়। কল্লোলিনী কলকাতা বা সিটি অফ জয় বলে গলা ফাটিয়ে যতই স্লোগান দেওয়া যাক, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার একদা রাজধানী এখন প্রায় দুঃস্বপ্নের নগরী।

কিন্তু চল্লিশ বছর আগেও শহরটা এমন ছিল না। রাস্তা আর চওড়া চওড়া ফুটপাথগুলো ছিল মসৃণ। মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে কী ভাল যে লাগত! প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য সবুজ গাছপালায় ঘেরা কত যে পার্ক ছিল, ছিল ইডেন গার্ডেন, কার্জন পার্ক, গঙ্গার ধার, গড়ের মাঠ কি বালিগঞ্জের লেক। সব পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে এবং আশ্চর্য রকমের নিরিবিলি। তখনও বেশ কিছু রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলত। মনে হ'ত, সন্ধের পর এই শহরটায় অলৌকিক স্বপ্ন নেমে এসেছে।

আর দশটা যুবক যুবতীর মতো অনুপমা বা নিখিলেশের মধ্যে কোনওরকম প্যানপ্যানানি ছিল না। লুকিয়ে চুরিয়ে তাঁরা গঙ্গার ধারে বা কার্জন পার্কে গাছের আড়ালে গিয়ে বসতেন না। কোনও কোনওদিন ছুটির পর কলেজ থেকে আলাদা আলাদা বেরিয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে কী কথা হ'ত, এতকাল বাদে আর মনে পড়ে না। তবে যতই হাঁটুন, সন্ধের আগে আগে বাড়ি ফিরে যেতেন অনুপমা।

এর মধ্যে নিখিলেশের জানা হয়ে গিয়েছিল, অনুপমা বিরাট পয়সাওলা পরিবারের মেয়ে। ওঁরা ট্র্যাডিশনাল বড়লোক। তা ছাড়া ওঁর বাবা এবং দাদাদের বিশাল বিজনেস। কলকাতা আর বম্বের নাম-করা পাঁচ ছ'টা কোম্পানির সাবান, সেন্ট, ক্রিম, পাউডার এবং অন্যান্য সৌখিন প্রোডাক্টের ওঁরা সারা ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার একমাত্র সোল সেলিং এজেন্ট। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে একটা বড় মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিংয়ের পুরো দেড়খানা ফ্লোর জুড়ে তাঁদের অফিস। বেহালায় মস্ত গোডাউন। সব মিলিয়ে বাড়ি তিনটে, গাড়ি চারখানা—একটা ফিয়েট, একটা ফরেন স্টুডিবেকার, একটা অস্টিন এবং একটা জিপ। অনুপমা কখনও নিজেদের গাড়িতে কলেজে আসতেন না; ট্রামে বাসেই যাতায়াত করতেন।

নিখিলেশ নিজের সম্বন্ধে অনুপমার কাছে কিছুই গোপন করেননি। কী ধরনের পরিবারে তাঁর জন্ম, কোন পরিবেশে তিনি থাকেন, সমস্ত জানিয়ে দিয়েছেন।

একদিন, মার্চ মাসের এক বিকেলে কলকাতার ওপর দিয়ে যখন উতরোল হাওয়া বয়ে যাচ্ছে, সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিগুলো আকশে গাঢ় ম্যাজেন্টা রং ছড়িয়ে দিচ্ছে, পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অনুপমা বলেছিলেন, 'ভূ-পর্যটকদের মতো কতদিন আর এভাবে হাঁটব?'

কিছু ভাবছিলেন নিখিলেশ। দূরমনস্কর মতো বলেছেন, 'হ্যাঁ, তাই তো—'

'তাই তো মানে? জানো আমাদের ব্যাপারটা বাড়িতে জানাজানি হয়ে গেছে।'

'সেটাই স্বাভাবিক। এসব কখনও চাপা থাকে না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অনুপমা বলেছেন, 'আবার আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

নিখিলেশ ধীরে ধীরে বলেছেন, 'তার আগে কয়েকটা বিষয় ভাল করে চিন্তা করা দরকার।'

অনুপমা জিজ্ঞেস করেছেন, 'যেমন?'

নিখিলেশ বুঝিয়ে বলেছেন, আর্থিক, সামাজিক আর অন্যান্য দিক থেকে তিনি সোসাইটির যে ক্লাসে পড়েন, অনুপমাদের ক্লাসটা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তা ছাড়া ভাল রেজাল্ট করে মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে দারুণ একটা একজিকিউটিভের চাকরি জুটিয়ে কিংবা কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে আই এ এস, আই এফ এস হবেন, এ জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর নেই। মসৃণ, তৈলাক্ত, পরিতৃপ্ত জীবনের কথা তিনি ভাবতে পারেন না। পলিটিকস হচ্ছে তাঁর কাছে টপ প্রায়োরিটি।

খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার পর অনুপমা বলেছেন, 'এ সব তুমি আগেও বলেছ। বাড়িতে অশান্তি হচ্ছে, যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

নিখিলেশ নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারতেন, তাঁর মতো লোয়ার মিডল ক্লাসের রাজনীতি-করা উচ্চাশাহীন একটি যুবকের সঙ্গে মেয়ের স্থায়ী সম্পর্ক হোক, এটা অনুপমার মা-বাবা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। বাড়িতে তাঁর ওপর কী ধরনের চাপ সৃষ্টি হচ্ছে সেটা কখনও খুলে বলেননি অনুপমা। তবে নিখিলেশ ঠিকই টের পাচ্ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'ঝোঁক বা আবেগের বশে হঠাৎ কিছু করে বসা অনুপমার পক্ষে উচিত হবে না। তাড়াহুড়ো করে কোনওরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়।

অনুপমা বলেছেন, 'তোমার কথা শুনলাম। কিন্তু আমি যা স্থির করেছি সেখান থেকে সরছি না।'

নিখিলেশ পরে অনেক সময় ভেবে দেখেছেন, সেই চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছর আগে পলিটিকসটা এখনকার মতো লাভজনক কেরিয়ার হয়ে ওঠেনি। রাজনীতি-করা, আদর্শবাদী যুবকদের দাম তখন কানাকড়িও নয়। বিশেষ করে অনুপমার মতো একটি তরুণী, অঢেল আরামে, প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্যে যাঁর দিন কাটে, ওঁদের ক্লাসের কোনও বিত্তবান পরিবারে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ওঁর বাবা-মা তাঁর হাতে স্বপ্নের একটি আস্ত পৃথিবী তুলে দিতে পারেন। পারেন মেয়ের অনন্ত সুখকে চিরকালের মতো সুরক্ষিত করে দিতে। এসব অনুপমার অজানা ছিল না। তবু নিম্ন মধ্যবিত্ত ক্লাসের নিচের স্তরে রাজনীতি-করা একটি তরুণের প্রতি তাঁর এত এমন প্রবল আকর্ষণের কারণ কী? নিখিলেশকে দেখতে ভালই। সে জন্যই কি অনুপমা মুগ্ধ হয়েছিলেন? কিন্তু সেই সময় তার চেয়ে অনেক সুপুরুষ যুবক কলকাতায় দুর্লভ ছিল না। তিনি ছাত্র হিসেবে অসাধারণ — এটাও একটা সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। কিন্তু নিখিলেশ ছাড়াও নানা সাবজেক্টের দুর্দান্ত সব ছাত্ররাও তো ছিল।

আপাতদৃষ্টিতে অনুপমার আকর্ষণ বা মুগ্ধতার যুক্তিসঙ্গত হেতু খুঁজে পাওয়া মুশকিল। পরে নিখিলেশের মনে হয়েছে, প্রেম বা ভালবাসা এমন এক ইন্দ্রজাল যা চুলচেরা হিসেবে করে চলে না : তার আলাদা, নিজস্ব কোনও লজিক আছে।

বি. এ পরীক্ষার পর অনুপমা এবং নিখিলেশ.ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। নামটাই শুধু লেখানো ছিল নিখিলেশের। এই সময় পার্টির প্রচুর দায়িত্ব এসে পড়েছিল তাঁর ওপর। নিয়মিত ক্লাস করার সময় পেতেন না।

ফিফথ এবং সিক্সথ ইয়ারটা এভাবেই কাটল। পড়াশোনা কিছুই হয়নি। অনুপমা অবশ্য ক্লাস নোটস সবই দিয়েছেন কিন্তু তার ওপর ভরসা করে পরীক্ষা দেওয়া যায় না। দিলে পাসটা হয়তো কোনওরকমে করতে পারতেন কিন্তু নেহাত সাদামাঠা একটা ডিগ্রি জোটানোর মানে হয় না।

অনুপমা অবশ্য ঠিক সময়েই এম. এ পাস করে গেলেন। রেজাল্ট বেশ ভালই হল, ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন তিনি। নিখিলেশকে বলেছিলেন, 'একটা বছর ড্রপ করলে। পার্টির কাজ সারা জীবনই থাকবে। তবু তার মধ্যে পড়াশোনার জন্যে সময় করে নিতে হবে। এখন থেকে রেগুলার ক্লাস করে নেক্সট ইয়ারে পরীক্ষাটা দিয়ে দাও।'

নিখিলেশ জোর দিয়ে বলেছিলেন, নিশ্চয় দেবেন। কিন্তু তার পরের বছরও পরীক্ষা দেওয়া হল না। পর পর দু'বছর ড্রপ করার পর পার্টি তাঁকে তালবনিতে পাঠিয়েছিল। অনুপমার কাছে যে প্রতিজ্ঞাটা করেছিলেন তা আর পালন করে ওঠা সম্ভব হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তখনই শেষ হয়ে যায়।

তালবনিতে আসার পর কলকাতায় প্রায় যাওয়াই হ'ত না। নিজের সবটুকু কর্মশক্তি আর উদ্যমকে নিখিলেশ তখন কৃষক সংগঠনের কাজে লাগিয়েছেন। অনুপমার সঙ্গে ক্বচিৎ কখনও দেখা হ'ত। যেটুকু যোগাযোগ তা শুধু চিঠিতে।

এই সময়টা নিখিলেশের জীবনে দুটো শোকাবহ ঘটনা ঘটে যায়। মা আর বাবা পরপর মারা গেলেন। আজন্মের পার্থিব বন্ধন চিরকালের মতো ছিন্ন হয়ে গেল।

ওদিকে অনুপমার জীবনেও সব কিছু ঠিকঠাক চলছিল না। তিনি এম. এ পাস করেছেন, বয়স বাড়ছে। একটা চালচুলোহীন, পার্টি-করা ছেলে, যার কোনও ভবিষ্যৎ নেই, সুদূর কোন গ্রামাঞ্চলে গিয়ে চাষাভুষোদের মধ্যে পড়ে আছে, আর তাঁর জন্যই কিনা কলকাতায় শবরীর মতো প্রতীক্ষা করছেন অনুপমা! এই ব্যাপারটা ওঁর মা-বাবা এবং দাদাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠছিল। বাড়ির আবহাওয়া তখন এমনই অগ্নিগর্ভ, যে কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। বাবা হঠাৎ তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। ছেলেটি এন আর আই, আমেরিকার একটা ব্যাঙ্কের বিরাট অফিসার, নিউইয়র্কে থাকে। বিয়েটা হয়ে গেলে অনুপমাকে সেখানে চলে যেতে হবে।

আসলে মা-বাবা এবং দাদারা চাইছিলেন, অনুপমা ইন্ডিয়ার বাইরে এমন কোথাও চলে যান, যেখান থেকে তাঁর পক্ষে নিখিলেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়। তাঁদের ধারণা, আমেরিকার চোখ-ধাঁধানো গ্ল্যামার, প্রাচুর্য আর উদ্দাম গতির ভেতর গিয়ে পড়লে রাজনীতি-করা বাউন্ডুলে একটি ছোকরাকে ভুলে যেতে তাঁর দু'মাসও লাগবে না।

কিন্তু অনুপমার মধ্যে অনমনীয় এক দৃঢ়তা রয়েছে। তিনি যে সিদ্ধান্ত নেন সেখান থেকে তাঁকে এতটুকু টলানো প্রায় অসম্ভব। বাবা যখন সম্ভাব্য জামাতাটিকে বহু দূরের এক মহাদেশ থেকে প্লেনে উড়িয়ে এনে বিয়ের তোড়জোড় শুরু করেছেন, মা এবং

বৌদিরা জুয়েলারকে বাড়িতে ডাকিয়ে গয়নার ডিজাইন দেখছেন কিংবা নিউ মার্কেটে গিয়ে শাড়ি জামা কসমেটিকসের অর্ডার দিয়ে আসছেন, সেই সময় একটা মেয়েদের কলেজে লেকচারারের কাজ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন অনুপমা। কলেজের নিজস্ব হস্টেল ছিল, তিনি সেখানে গিয়ে উঠলেন। পারিবারিক সম্পর্কটা চিরকালের মতো শেষ হয়ে গেল। তারপর দু-তিনটে বছর কেটে গেছে।

সব শোনার পর আরতি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'উনি এখন কোথায় আছেন?'

নিখিলেশ বুঝতে পারছিলেন, অনুপমার কথা জিজ্ঞেস করেছেন আরতি। বললেন, 'হস্টেলেই আছে।'

আরতি বলেছিলেন, 'এভাবে তো চলতে পারে না। একটা মেয়ে আপনার জন্যে এতখানি স্যাক্রিফাইস করল, এটা হেলাফেলার জিনিস নয়। বিয়েটা কবে করছেন বলুন—'

'বলেছি তো করব—'

'আমরা ডেটটা জানতে চাই।'

যোগেন মাস্টারও বলেছিলেন, 'পলিটিকসটা ক'দিন মস্তিষ্ক থেকে বার করে দিয়ে শুভ কাজটা চুকিয়ে ফেলুন মশাই। রাজনীতির চেয়ে এটা কম ইমপর্ট্যান্ট নয়। বৃদ্ধ বয়েসে পাকা চুল মাথায় নিয়ে বিয়ে করতে যাওয়ার মানে হয় না। সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়।'

যোগেন মাস্টারের মতো শুভাকাঙ্ক্ষী আর আরতির মতো বন্ধুপত্নী সত্যিই দুর্লভ। নিখিলেশ হেসে হেসে বলেছেন, 'ঠিক আছে, ঝুলে-থাকা কাজটা তা হলে চুকিয়েই ফেলা যাক। আপনারা একটা ডেট ঠিক করে দিন। আমি চিঠি লিখে অনুপমাকে জানিয়ে দিচ্ছি।'

মাসখানেকের ভেতর রেজিস্ট্রি করে বিয়েটা হয়ে গেল। অনুপমা আর নিশিলেশ, কেউই চাননি হইচই জাঁকজমক হোক। অনুপমার এক কলিগের বাড়িতে তাঁর কলেজের সহকর্মী, নিখিলেশের পার্টির কিছু ঘনিষ্ঠ লোকজন, যোগেন মাস্টার, আরতি—এমনি চল্লিশ পঞ্চাশ জনকে নেমন্তন্ন করে একটু আনন্দ করা হয়েছিল। ভূরিভোজেরও ব্যবস্থা ছিল। এর জন্য যা খরচ হয়েছিল তার সবটাই দিয়েছিলেন অনুপমা। নিমন্ত্রিতদের আগেই অনুরোধ করা হয়েছিল, কোনওরকম উপহার আনা চলবে না। বন্ধুরা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, তবে ফুল ছাড়া অন্য কিছু অনেননি।

মনে আছে, বিয়ের তারিখ ঠিক হবার পর অনুপমা তাঁদের বাড়িতে মা-বাবাকে খবরটা দিতে গিয়েছিলেন। শুনতে শুনতে ওঁদের মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। বাবা অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বলেছিলেন, 'আমাদের কাছে তোমার কোনও অস্তিত্ব নেই। তুমি কী করবে, না করবে সেটা সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার। তোমার সম্বন্ধে আমাদের সব আগ্রহ শেষ হয়ে গেছে।'

বিয়ের পর আর হস্টেলে থাকেননি অনুপমা। তাঁর যে সহকর্মী, অর্থাৎ যাঁদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে একতলায় তিন ঘরের একটা ফ্ল্যাট ফাঁকা পড়ে ছিল। সেটা ভাড়া নিয়ে তিনি সেখানে উঠে গিয়েছিলেন।

অনুপমার কলিগের নাম নবনীতা দাশগুপ্ত। কলেজে তিনি ইতিহাস পড়াতেন। ওঁর স্বামী মনোময় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিসার। ওঁদের এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলেটি সিক্সে পড়ত, মেয়েটি থ্রি-তে। নবনীতারা মানুষ হিসেবে চমৎকার, খুবই স্নেহপ্রবণ। বয়সে কয়েক বছরের বড় নবনীতা অনুপমার জীবনের কথা সবই শুনেছিলেন। ছোট বোনের মতো তাঁকে আগলে রাখতেন।

মনে আছে, বিয়ের অনুষ্ঠান চুকে যাবার পরই তালবনিতে ফিরতে চেয়েছিলেন নিখিলেশ। কিন্তু ফেরা হয়নি। নবনীতা এবং মনোময় তাঁকে কয়েকদিন আটকে রেখেছিলেন।

মনোময় বলেছিলেন, 'আপনি তো মশাই ভীষণ কাটখোট্টা লোক। রসকষ বলতে কিচ্ছু নেই!'

বুঝতে না পেরে নিখিলেশ বলেছেন, 'মানে?'

'পিপল নিয়ে কাজ করেন। তাদের সব খবর রাখেন। আর সবচেয়ে যে আপনজন সে কী চায়, আপনার কাছে তার কী এক্সপেক্টেশন, সেটাই শুধু জানেন না!'

আক্রমণটা কোন দিক থেকে আসছে, এবার সেটা টের পাচ্ছিলেন নিখিলেশ। উত্তর না দিয়ে তিনি হেসেছিলেন।

মনোময় এবার বলেছেন, 'নতুন বিয়ে করলেন, বউকে নিয়ে ক'দিন বেড়ান, আনন্দ করুন।'

অগত্যা একটি সপ্তাহ কলকাতায় থেকে যেতে হয়েছিল। অনুপমাকে নিয়ে এর মধ্যে দু'দিন সিনেমা আর একদিন হাসির নাটক দেখেছেন, ভাল রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেয়েছেন, এলোমেলো এখানে সেখানে ঘুরেছেন।

কলেজে পড়ার সময় কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় গ্লোব-ট্রটারদের মতো কম তো হাঁটেননি। কিন্তু এখনকার হাঁটটা একেবারে অন্যরকম। নিখিলেশের মনে হয়েছিল, পরমাশ্চর্য এক স্বপ্নের ভেতর তাঁরা ভেসে বেড়াচ্ছেন। একটা বিয়ে হঠাৎ অনেক কিছু কেমন যেন বদলে দিয়েছিল।

সাতদিন পর তালবনিতে ফিরে এসেছিলেন নিখিলেশ। মনে পড়ে, এই সময়টায় এখানে প্রচুর কলকারখানা হচ্ছিল। জন বিস্ফোরণ যাকে বলে, তখন থেকে তাই ঘটতে শুরু করেছে। ফ্যাক্টরিতে কাজের খোঁজে চারপাশের গাঁগুলো থেকে তো বটেই, অনেক দূর থেকেও মানুষের ঢল নেমেছিল। দেখতে দেখতে কারখানাগুলোতে শ্রমিকের সংখ্যা চল্লিশ পঞ্চাশ হাজারে দাঁড়িয়ে গেছে।

এই অঞ্চলের কৃষক সংগঠন নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন নিখিলেশ। একেবারে শূন্য থেকে। সংগঠক হিসেবে তাঁর ওপর পার্টির গভীর আস্থা। তালবনির শ্রমিকদের নিয়ে ইউনিয়ন করার দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

নিখিলেশের তখন এমনই জনপ্রিয়তা যে তাঁর এক ডাকে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়ে যায়। এক মাসের ভেতর এখানকার প্রতিটি কারখানায় শ্রমিক সংগঠন করে ফেলেছিলেন তিনি। তবে স্বীকার করতেই হবে, ব্যাপারটা একেবারে নিরঙ্কুশ ছিল না।

অন্য দু-তিনটে দলও ইউনিয়ন করতে পেরেছিল। তবে তাদের মেম্বার ছিল খুবই কম।

কৃষক এবং শ্রমিক, দুই সংগঠন নিয়ে নিখিলেশের তখন দিনরাত প্রচণ্ড ব্যস্ততা। এক একদিন দুপুরে স্নান-খাওয়ার সময় পর্যন্ত পেতেন না। রাতে শুতে শুতে দেড়টা দুটো বেজে যেত। ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠে পড়তেন।

এত যে কাজের চাপ, তবু তারই মধ্যে মাসে একবার কলকাতায় অনুপমার কাছে যেতেন।

এদিকে কারখানা টারখানা হওয়ায় তালবনির গুরুত্ব রীতিমত বেড়ে গিয়েছিল। আগের নগণ্য স্টেশনটাকে অনেক বড় করা হচ্ছিল। নিখিলেশ যখন প্রথম এখানে আসেন তখন প্ল্যাটফর্ম ছিল মোটে একটা। প্ল্যাটফর্ম আর কী, মাটি ফেলে খানিকটা জায়গা উঁচু করে কিছু খোয়া ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল।

এখন তালবনিতে একটার জায়গায় চারটে প্ল্যাটফর্ম। প্রচুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন তো এখানে আসেই, অনেকগুলো মেল ট্রেনও স্টেশনটাকে ছুঁয়ে চলে যায়, তবে থামে না।

স্টেশনের ওধারে অগুনতি গো-ডাউন করা হয়েছে। সেগুলোর গায়ে সারাদিন পনেরো কুড়িটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে।

তালবনির চেহারা যেমন দ্রুত বদলে যাচ্ছিল, সেই সঙ্গে তার চরিত্রও। জায়গাটা শহর হলেও এখানকার মানুষের চালচলন এবং জীবনযাত্রার মধ্যে ছিল গ্রামের ছাপ। পুরনো ভ্যালুগুলোকে মানুষ মর্যাদা দিত। একজনের সঙ্গে আর একজনের সম্পর্ক ছিল আত্মীয়ের মতো। সব মিলিয়ে যেন এক বৃহৎ পরিবার।

নানা কারণে তালবনির মানুষদের পারস্পরিক সম্পর্ক, আগের মূল্যবোধ দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। নিখিলেশ প্রথম যখন এখানে আসেন ছোটখাট চুরি-চামারি ছাড়া বড় ধরনের অপরাধ, যেমন ডাকাতি বা খুনখারাপি কিংবা নারীধর্ষণ, এসব কেউ ভাবতেই পারত না। কিন্তু তালবনির এতদিনের শান্ত নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রাকে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে অভাবনীয় এই ব্যাপারগুলো ক্রমশ ঘটতে শুরু করেছিল। খুনী, ছিনতাইবাজ এবং ওয়াগন-ব্রেকারদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল।

সেই যে তালবনিতে এসেছিলেন, তারপর তেইশ-চব্বিশ বছর কেটে গেল। এর মধ্যে নিয়ম করে ফি মাসে দু'দিন করে কলকাতায় অনুপমার কাছে কাটিয়ে এসেছেন নিখিলেশ। বিয়ের পর সেই যে যাওয়াটা শুরু করেছিলেন, তার ব্যতিক্রম কখনও ঘটেনি। স্ত্রীর প্রতি এটাই ছিল তাঁর অনুরাগ বা আনুগত্যের প্রকাশ।

ততদিনে দু'টি ছেলে হয়েছে তাঁদের, এবং একটি মেয়ে। অনুপমা একাই তাদের মানুষ করে তুলেছেন।

একজন রাজনৈতিক কর্মী এবং সংগঠক হিসেবে নিখিলেশ দারুণ সফল। কিন্তু সাংসারিক মানুষ হিসেবে চূড়ান্ত ব্যর্থ। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের তিনি খুবই ভালবাসতেন কিন্তু তাদের দায়িত্ব পালনের মতো পর্যাপ্ত সময় তাঁর ছিল না। এই নিয়ে ভেতরে ভেতরে দুঃখবোধ ছিল নিখিলেশের। নিজেকে এক এক সময় অপরাধী মনে হ'ত। কিন্তু অনুপমা আশ্চর্য মানুষ। স্বামীর প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র অভিযোগ ছিল না। ছেলেমেয়েদের আচরণেও

একদিনের জন্য মনে হয়নি, বাবার ওপর তাদের কোনওরকম ক্ষোভ আছে।

এই তেইশ-চব্বিশ বছরে নিখিলেশ নিয়ম করে কলকাতায় গেলেও অনুপমা বা ছেলেমেয়েদের খুব কমই তালবনিতে আসা হয়েছে। ছুটিছাটায় কখনও সখনও অনুপমারা এসেছেন। এলে যোগেন মাস্টারের বাড়িতে উঠতেন। যোগেন এবং আরতির মতো মানুষ হয় না; তাঁরা অনুপমাদের খুব যত্ন করতেন। অনুপমার সঙ্গে আরতির দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।

তেইশ-চব্বিশ বছর কেটে যাবার পর সেবার পার্টি থেকে বিধানসভা নির্বাচনে তালবনি কেন্দ্রের জন্য নিখিলেশকে টিকেট দেওয়া হল। প্রথমে রাজি হননি তিনি। কৃষক এবং শ্রমিক সংগঠন নিয়েই খুশি ছিলেন। পার্টির ভিত মজবুত করার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে পড়ে থেকে কাজ করাটা তাঁর মতে সবচেয়ে জরুরি। গ্র্যাসরুট লেভেলের অর্থাৎ তৃণমূল স্তরটা ডেমোক্রেসিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ঠিক নয়। কিন্তু পার্টি থেকে বোঝানো হল, সংগঠন শক্তিশালী করার মতো বিধানসভায় যাওয়াটাও কম জরুরি নয়। পার্টি এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে নিখিলেশের মতো শিক্ষিত মানুষের সেখানে একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া এম এল এ হলেও তালবনি থেকে তাঁকে এখানকার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে চলে যেতে হচ্ছে না। বিধানসভার অধিবেশন যখন চলবে তখন অবশ্য কলকাতায় থাকা দরকার। বাকি সময় এখানেই থাকবেন। বহুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে তালবনিতে দলের জন্য যে ভিতটা তিনি গড়ে তুলেছেন সেটা নষ্ট হোক, পার্টি তা চায় না।

শেষ পর্যন্ত একজন সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে পার্টির নির্দেশ অমান্য করা যায়নি। নির্বাচনে নামতেই হয়েছিল নিখিলেশকে। তালবনির মানুষের কাছে তখন তাঁর দুর্দান্ত ইমেজ। তারা জানত তিনি আদ্যোপান্ত সৎ, নির্লোভ এবং তাদেরই জন্য জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বছরগুলো এখানে কাটিয়ে দিয়েছেন। কোনওদিন সামান্য স্বার্থ চিন্তা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। এখানকার প্রতিটি মানুষ তাঁকে ভাল তো বাসতই, তার চেয়েও বিশ্বাস করত অনেক বেশি।

নিখিলেশের যা ভাবমূর্তি, তাঁর সম্বন্ধে মানুষের যে শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রম তাতে নির্বাচনী প্রচারের প্রয়োজন ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভাল কাজ করলে ভোট এমনিতেই পাওয়া যাবে, নইলে নয়। তালবনির নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতিটি মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে তিনি চেনেন। ওরা যদি তাঁকে ভোট না দেয় বুঝতে হবে তাঁর তেইশ চব্বিশ বছরের এত পরিশ্রম, সব ব্যর্থ।

নেতারা এসব কথায় কান দেননি। তাঁদের ধারণা মিটিং মিছিল ছাড়া নির্বাচন হতেই পারে না। তাঁদের কাছে নির্বাচনটা আসলে মরণপণ এক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে হারলে ক্ষমতা দখল অসম্ভব। তাঁরা মনে করতেন, সাধারণ ভোটদাতারা বেশির ভাগই নিরক্ষর এবং সরল। তাদের ধোঁকা দেওয়া খুব সহজ। প্রচারের জলুসে বিশাল জনগণ অর্থাৎ 'মাস'কে ধাঁধিয়ে দিয়ে অন্য রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা কাজ গুছিয়ে নিতে পারে।

কাজেই কোনও দিক থেকেই ত্রুটি রাখা হয়নি। প্রতিপক্ষকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া

হবে না—এমন একটা অনমনীয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে পার্টি তালবনিতে নেমে পড়েছিল। দলের কর্মীরা মিটিং করেছে, মিছিলও বার করেছে, স্লোগানে স্লোগানে আকাশ চৌচির করে দিয়েছে, পোস্টারে ফেস্টুনে চারিদিক ছেয়ে ফেলেছে। নিখিলেশের নাম এবং পার্টির সিম্বলটা যাতে ভোটাররা ভুলে না যায় সেজন্য প্রতিদিন, প্রায় অষ্টপ্রহর হাতুড়ি পেটানোর মতো চিৎকার করে তাদের কানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এসব মেনে নিতে হয়েছিল নিখিলেশকে। তবে তিনি জোর দিয়েছিলেন আত্মবিশ্বাস এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ওপর। মিটিং মিছিল ছাড়াও মাত্র দু-একজন কর্মী সঙ্গে নিয়ে নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতিটি বাড়িতে ঘুরে ঘুরে ভোটারদের বলেছেন, 'আপনাদের কাছে এলাম। যদি আমাকে যোগ্য মনে করেন দয়া করে ভোটটা দেবেন।' তিনি শতকরা একশ' ভাগ নিশ্চিত ছিলেন, তাঁর আবেদন ব্যর্থ হবে না।

যা অনিবার্য তাই ঘটেছিল। আশি হাজারেরও বেশি ভোটে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিবারণ হালদারকে হারিয়ে দিয়েছিলেন নিখিলেশ। প্রথম বার ইলেকশানে নেমে এত ভোটে জেতাটা তাঁদের পার্টিতে একটা সর্বকালীন রেকর্ড।

বিধানসভার সদস্য হবার পর বেশির ভাগ সময়টা নিখিলেশকে কলকাতায় থাকতে হ'ত। জীবনে এই প্রথম অনুপমা এবং তিন ছেলেমেয়ে একসঙ্গে অনেকদিন করে তাঁকে কাছে পেত।

অনুপমা তখনও নবনীতাদের বাড়িতেই ছিলেন। বড় ছেলে পণ্টুর বয়স সেই সময় উনিশ, ফিজিক্স অনার্স নিয়ে বি. এসসি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। ছোট ছেলে সন্তুর সতেরো চলছে, সে হায়ার সেকেন্ডারি দেবে। একমাত্র মেয়ে চোদ্দ বছরের মিলি ক্লাস নাইনে উঠেছে। বাবাকে এতদিন ধরে পেয়ে ছেলেমেয়েরা দারুণ খুশি। আগে দু-একদিনের জন্য যে আসতেন তখনও স্ত্রী-ছেলেমেয়ের সঙ্গ ভাল লাগত। তবে এখনকার মতো নয়। তখন রক্তের জোর ছিল প্রবল, ছিল অদম্য কর্মক্ষমতা, আর ছিল সতেজ, সারবান একটি আদর্শ। ছিল শহর থেকে বহুদূরে একটি অখ্যাত অঞ্চলের জনগণকে আবহমান কালের শোষণ থেকে মুক্ত করার কাঠোর প্রতিজ্ঞা। স্ত্রী ছেলেমেয়ের চেয়ে এসবের শক্তি কম নয়, অন্তত নিখিলেশের মতো একজন আইডিয়ালিস্টের কাছে। তাই কলকাতায় এলেও তালবনি বার বার তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

তেইশ-চব্বিশ বছরে বয়স যে অনেকটাই বেড়েছে, বিধানসভা নির্বাচনের পর সেটা ক্রমশ টের পাচ্ছিলেন নিখিলেশ। মনে হচ্ছিল দীর্ঘকাল একটানা পরিশ্রমের পর স্বাভাবিক নিয়মেই ভেতরে ভেতরে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যে পরমাশ্চর্য মাধুর্য রয়েছে, সেটা অনুভব করতে পারছিলেন। এদিকটায় এতকাল যে সেভাবে মনোযোগ দেওয়া হয়নি, সেজন্য হয়তো একটু আক্ষেপও হয়েছে। ক্রমশ তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে জড়িয়ে পড়ছিলেন।

এম এল এ হবার পর যেটা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ভিত সেই তালবনিতে নিশ্চয়ই যেতেন নিখিলেশ। কিন্তু তাঁর সমস্ত ভাবনা যেন দু ভাগ হয়ে গিয়েছিল, যার অর্ধেকটা পড়ে থাকত কলকাতায়। তালবনিতে এলে সেখানে ফেরার জন্য উন্মুখ হয়ে

থাকতেন।

মনে পড়ে, বিধানসভায় বক্তা হিসেবে প্রথম থেকেই খুব নাম হয়ে গিয়েছিল নিখিলেশের। ফাঁকি দিয়ে কখনও কিছু করেননি। যখন ছাত্র ছিলেন, নিবিষ্ট হয়ে পড়াশোনা করেছেন। সংগঠনের কাজে যখন তালবনিতে গেলেন, তখনও ছিল একই রকম নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা। বিধানসভার অধিবেশনে রীতিমত খেটে, হোমওয়ার্ক করে যেতেন। তাঁর বক্তব্য শাসকদল বা বিরোধী পক্ষ — সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।

বেশির ভাগ এম এল এ'ই হইচই বাধিয়ে মাছের বাজার বসিয়ে দেয়। সেদিক থেকে নিখিলেশ উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। নিজের বক্তব্যকে যুক্তি আর তথ্য দিয়ে সাজিয়ে প্রকাশ করার সহজাত একটা ক্ষমতা ছিল তাঁর। বলার স্টাইলটি ছিল চমৎকার। কণ্ঠস্বর কখনও উঁচুতে তুলে, কখনও নামিয়ে একটা দারুণ নাটকীয় আবহাওয়া তৈরি করতে পারতেন।

সুদক্ষ একজন এম এল এ হিসেবে তাঁর সুনাম বিধানসভার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রতিটি অধিবেশনে তিনি যা বলতেন, খবরের কাগজে তার প্রায় সবটাই ছাপা হ'ত। সেই সঙ্গে কখনও কখনও তাঁর ছবিও। দেশের মানুষের কাছে নিখিলেশের খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল।

পার্টির কাছে তিনি ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে উঠছিলেন। নিখিলেশের দলে তাঁর মতো তুখোড় বক্তা খুব অল্পই ছিলেন। পার্টি চাইছিল বিধানসভার ব্যাপারেই তিনি অনেক বেশি করে সময় দিন। তালবনির কৃষক এবং শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব দিয়ে অন্য লোক পাঠানো হল। তবে মাঝে মাঝে গিয়ে নিখিলেশ সব দেখে আসবেন, ওখানকার কর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। নেতারা ভালই জানতেন, যে অঞ্চলের জনসমর্থনের জোরে তিনি বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হবে।

মনে পড়ে, নির্বাচনের বছরখানেক পর একদিন রাতে সবাই খেতে খেতে গল্প করছিলেন। সারাক্ষণের একটি কাজের মেয়ে, যার নাম সুধা, নানারকম পাত্র থেকে খাবার তুলে নিখিলেশদের প্লেটে প্লেটে দিচ্ছিল।

হঠাৎ অনুপমা বললেন, 'তোমাকে তো এখন কলকাতাতেই থাকতে হচ্ছে। তাই ভাবছিলাম—'

উৎসুক চোখে স্ত্রী দিকে তাকিয়ে নিখিলেশ জিজ্ঞেস করছিলেন, 'কী ভাবছিলে?'

'কুড়ি-একুশ বছর ভাড়া বাড়িতে আছি। অবশ্য নবনীতাদি আর মনোময়দা কখনও বুঝতে দেননি, আমরা ভাড়াটে আর ওঁরা বাড়িওলা। তবু ভবিষ্যতের কথা এখন বোধহয় চিন্তা করা দরকার।'

অনুপমা কী বলতে চাইছেন, বুঝতে না পেরে তাকিয়েই ছিলেন নিখিলেশ।

অনুপমা থামেননি, 'আমাদের নিজস্ব একটা বাড়ি করা উচিত। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, ওদের সবার জন্য আলাদা আলাদা ঘর না হলে অসুবিধা হচ্ছে। তাছাড়া, আমাদের এত বই, এই ফ্ল্যাটে সে সব গুছিয়ে রাখার মতো জায়গা নেই, চারদিকে ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। সেদিন দেখছিলাম অনেকগুলো বইতে পোকা ধরেছে। ভাল করে সাজিয়ে গুছিয়ে না রাখলে অন্যগুলোতেই ধরবে। বই রাখার জন্যও অনেকটা স্পেস

দরকার।'

অনুপমার চিরকালই বই কেনার অভ্যাস। অন্যের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে এনে পড়াটা তিনি পছন্দ করেন না। লেকচারার হয়ে যখন কলেজের চাকরি নিলেন তখন কত আর মাইনে পেতেন! প্রথম দিকে হস্টেল চার্জ, নিজের অন্যান্য খরচ চালানো, পরে বাড়ি ভাড়া—এ সবের জন্য টুইশনিও করতে হয়েছে। তবু তার থেকে পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বই কিনতেন। নিজের সাবজেক্ট ছাড়াও নানা বিষয় সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহ। ছেলেমেয়ে হওয়ার পর সংসারের খরচ বেড়ে গিয়েছিল। অবশ্য ততদিনে তাঁর মাইনেও বাড়তে শুরু করেছে। টুইশন ফিও আগের তুলনায় দু-তিনগুণ হয়ে গেছে।

বই কেনাটা কোনও দিনই বন্ধ হয়নি; ওটা অব্যাহতই ছিল। তেইশ-চব্বিশ বছরে অনুপমার সংগ্রহ দেখার মতো, সব মিলিয়ে বড় আকারের একটা লাইব্রেরি হয়ে যায়।

বেশ অবাক হয়েই নিখিলেশ বলেছিলেন, 'বাড়ি! আমাদের!'

অনুপমা বলেছিলেন, 'তুমি আকাশ থেকে পড়লে নাকি? এতক্ষণ আমার কথা কী শুনলে?'

'কিন্তু —'

'কিসের কিন্তু?'

'বাড়ি করতে হলে জমি চাই, টাকা চাই। এম এল এ হয়ে আমি ক'টাকা অ্যালাওয়েন্স পাই যে বাড়ি করব!' বলতে বলতে হঠাৎ হেসে ফেলেছিলেন নিখিলেশ, 'অবশ্য সংসারের জন্যে কবে আর কী করেছি আমি। চিরকাল তুমিই তো জোয়াল টেনে গেলে।'

অনুপমা বলেছিলেন, 'ওসব কথা থাক। লটারিতে সল্টলেকে আমি যে তিন কাঠা জমি পেয়েছিলাম, তোমার কি তা মনে আছে?'

নিখিলেশ বলেছেন, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট সস্তায় ল্যান্ড দিয়েছিল। তুমি ইনস্টলমেন্টে দাম শোধ করেছ।'

'যাক, একেবারে ভুলে যাওনি দেখছি। প্রভিডেন্ট ফান্ড আর এল আই সি বা ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে বাড়িটা করব ভাবছি।'

মা-বাবার কথা শুনতে শুনতে ছেলেমেয়েদের চোখগুলো খুশিতে, উৎসাহে চকচক করছিল। তারা একসঙ্গে বলে উঠেছে, 'তাড়াতাড়ি শুরু করে দাও।'

অনুপমা বলেছিলেন, 'মুখের কথা খসালেই কি বাড়ি হয়ে যায়? আগে টাকা জোগাড় করি। তারপর তো—'

বড় ছেলে পল্টু যার স্কুল-কলেজের নাম রঞ্জন, খুবই চালাকচতুর। প্র্যাকটিকাল বলতে যা বোঝা যায় সে তা-ই। সেই বয়সেই অনেক খবর রাখত। বলেছে, 'মা, ওটা কোনও প্রবলেমই নয়—'

অনুপমা অবাক হয়ে বললেন, 'কী বলছিস তুই!'

পল্টু বলেছে, 'একটু ভেবে দেখ, ঠিকই বলছি।'

অনুপমা বলেছেন, 'তোর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। যা বলার পরিষ্কার করে বল—'

'ওকে, পরিষ্কার করেই বলছি। আমাদের হাতে একজন নাম-করা এম এল এ থাকতে টাকা কোনও প্রবলেম!'

'মানে?'

পল্টু বলেছে, 'বাবার নামটা কাজে লাগালে পনেরো দিনের ভেতর ব্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক থেকে টাকা বার করা যাবে।'

নিখিলেশ চমকে উঠেছেন। জীবনে কখনও, কোনও কারণেই কারও কাছ থেকে এতটুকু সুযোগ নেননি। তাঁর চরিত্রে বিন্দুমাত্র কালো দাগ নেই। ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল তাঁর। বলেছিলেন, 'না না, আমার নামটা এর মধ্যে না জড়ানোই ভাল।'

নিখিলেশের নাম করে হাউস লোনের জন্য ব্যাঙ্কে অ্যাপ্লাই করলে সহজেই যে টাকা পাওয়া যেতে পারে এটা আগে অনুপমার মাথায় আসে নি। পল্টু না বললে আসতও না। তিনি হঠাৎ বলে উঠেছেন, 'পল্টু অন্যায় তো কিছু বলেনি। আমরা এক্সট্রা কোনও ফেভার নিচ্ছি না। হাজার হাজার লোক লোন নিয়ে বাড়ি করছে। এর জন্যে তারা যা ইন্টারেস্ট দেয় আমরাও তাই দেব।'

দ্বিধান্বিতভাবে নিখিলেশ বলেছেন, 'কিন্তু —'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে অনুপমা বলেছেন, 'তুমি তো আমাদের ব্যাঙ্ক ট্যাঙ্কগুলোর ব্যাপার জানো। লোনের ব্যাপারে দলিল থেকে শুরু করে অন্য সব ডকুমেন্ট যা যা দরকার সব জমা দিলেও অকারণে প্রসেস করতে ওরা দেরি করে। তোমার নামটা দেখলে ওরা গুরুত্ব দেবে।'

নিখিলেশ এবার চুপ করে ছিলেন। অনুপমা বা পল্টু যা বলেছে তা অনুচিত বা অসঙ্গত নয়। তবু সেটা তাঁর মনঃপূত হয়নি। বুঝতে পারছিলেন, এর পরও আপত্তি করলে কেউ শুনবে না। তাতে পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হবে। স্ত্রী বা ছেলেমেয়ের জন্য কোনও দিন তেমন কিছুই করতে পারেন নি। নিরুপায় ভাবেই ভেবেছিলেন, ওরা যদি নামটা ব্যবহার করতে চায় তো করুক।

লোনের জন্য দরখাস্ত করে আর্কিটেক্ট ডাকানো হয়েছিল। তিনি কয়েক রকমের বাড়ির ডিজাইন নিয়ে এসেছিলেন। তার ভেতর থেকে একটা পছন্দ হয়েছিল অনুপমা এবং ছেলেমেয়েদের। সামান্য অদল বদল করে ফাইনাল প্ল্যানটা তৈরি করতে বলা হয়েছিল।

বাড়ির ব্যাপারে নিখিলেশের মতামতও অবশ্যই চাওয়া হয়েছে। তিনি হেসে বলেছেন, 'আমি আর কী বলব, তোমরা সবাই যেটা ঠিক করেছ সেরকমই হোক।' তারপর একটু মজা করেছেন, 'আমাকে একধারে একটু থাকতে দিলেই হল।'

মনে আছে, এম এল এ হবার চার বছরের মাথায় সল্টলেকের বাড়িটা শেষ হয়েছিল। প্রায় সাতাশ আটাশ বছর নবনীতা আর মনোময়দের কাছে থেকে তাঁরা সেখানে চলে গিয়েছিলেন।

এই চার বছরে বেশ কয়েক বারই তালবনিতে গেছেন নিখিলেশ। যোগেন মাস্টার আর আরতির সঙ্গে প্রতিবারই দেখা হয়েছে।

যোগেন মাস্টার বলেছেন, 'অ্যাসেম্বলিতে আপনার ডিবেটের রিপোর্টগুলো রেগুলার কাগজে বেরোয়। খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ি। আপনি তো মশাই অবাক করে দিচ্ছেন।'

নিখিলেশ বলেছেন, 'কিরকম?'

'পলিটিক্যাল অর্গানাইজার হিসেবে আপনাকে তো কাছে থেকে দেখেছি। ইউ আর সিম্পলি একসেলেন্ট। কিন্তু অ্যাসেম্বলিতে যে এত ভাল বলবেন, আমার ধারণা ছিল না।'

নিখিলেশ হেসে বলেছেন, 'আপনি বন্ধু মানুষ, তাই আমি যা করি সবই আপনার ভাল লাগে।'

যোগেন মাস্টার বলেছেন, 'নো স্যার, নো। আপনি আমাকে হাড়ে হাড়ে চেনেন। তোষামোদ করার হ্যাবিট আমার নেই। যা ঠিক মনে করি স্ট্রেট বলে ফেলি। আমার জিভ মশাই একেবারে চাঁছাছোলা।'

নিখিলেশ আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছেন। নিজের সম্বন্ধে যোগেন মাস্টার যা বলেছেন তা শতকরা একশ' ভাগ ঠিক।

একটু চুপ।

তারপর যোগেন মাস্টার বলেছেন, 'আমার কী মনে হয় জানেন?'

উৎসুক চোখে তাকিয়েছেন নিখিলেশ, 'কী?'

যোগেন মাস্টার বলেছেন, 'আপনাকে শুধুমাত্র অ্যাসেম্বলিতে আটকে রাখাটা আপনার পার্টির পক্ষে ঠিক হবে না।'

'মানে?'

'আপনাকে আরও বড় আকারে কাজে লাগানো দরকার। তাতে আপনার পার্টি অনেক বেশি লাভবান হবে।'

নিখিলেশ জিজ্ঞেস করেছেন, 'বড় আকারে বলতে?'

যোগেন মাস্টার বলেছেন, 'আপনাকে মিনিস্টার টিনিস্টার করা উচিত।'

জোরে জোরে, প্রবল বেগে হাত এবং মাথা ঝাঁকিয়ে নিখিলেশ বলেছেন, 'বলেন কী! অ্যাসেম্বলি নিয়েই নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি। মিনিস্ট্রি টিনিস্ট্রি আমার ধাতে পোষাবে না মশাই।'

কিছুক্ষণ ভেবে যোগেন মাস্টার বলেছেন, 'ওয়েল-উইশার হিসেবে একটা কথা বলব?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'আপনার কিন্তু একটা ব্যাপারে গাফিলতি হয়ে যাচ্ছে।'

নিখিলেশ চকিত হয়ে উঠেছেন, 'কী ব্যাপারে বলুন তো?'

যোগেন মাস্টার যা উত্তর দিয়েছেন তা এইরকম। বিধানসভার কাজে তিনি বেশির ভাগ সময়ই কলকাতায় থাকছেন। দু-চারদিনের জন্য যখন আসেন, তালবনিতেই কাটিয়ে যান। যেটা তাঁর আসল 'বেস' অর্থাৎ গ্রামগুলোতে কচিৎ কখনও যাবার সময় পান। এটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। ডেমোক্রেসিতে জনসংযোগটা ভীষণ জরুরি। একটানা দীর্ঘকাল তাঁকে না দেখলে মানুষের মনে খারাপ একটা প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

এমন একটা আশঙ্কাই খুবই স্বাভাবিক। এবং নিখিলেশ তা ভালই জানতেন। যোগেন মাস্টার সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো সম্ভাব্য একটা বিপদের দিকে আঙুল তুলেছিলেন। সচেতন করে দেওয়া ছাড়া তাঁর অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। তবু নিখিলেশের সূক্ষ্ম আত্মাভিমানে হয়তো একটু খোঁচা লেগেছে। তিনি হেসে হেসেই বলেছিলেন, 'আচ্ছা যোগেনবাবু, পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আপনি আমাকে দেখেছেন। এখানকার মানুষদের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছি। তার ভেতর কি কোনও রকম ফাঁকি ছিল?'

স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নিখিলেশের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন যোগেন মাস্টার। তারপর ধীরে ধীরে বলেছেন, 'আপনি কি বলতে চেয়েছেন, বোধহয় তা বুঝতে পারছি। পিপলের জন্য একসময় প্রাণপাত করেছেন বলে আজীবন আপনাকে তারা ভোট দিয়ে ইলেকশানে জিতিয়ে যেতে বাধ্য — এই তো?'

অলৌকিক ক্ষমতাধর কোনও থট-রিডারের মতো তাঁর মনোভাবটা টের পেয়ে গিয়েছিলেন যোগেন মাস্টার। নিখিলেশ হতচকিত। কিছু একটা উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন তিনি। কিন্তু ঠিক কী বলবেন ভেবে পাননি। বহুকাল আগে পরিচয় হবার পর থেকে অবিরত তাঁর গুণগানই করে এসেছেন যোগেন মাস্টার। তাঁকে এতকাল একজন মুগ্ধ অনুরাগীই মনে হয়েছে। কিন্তু সেদিনই টের পাওয়া গিয়েছিল লোকটা রূঢ়ভাষী, এবং বিধানসভার নাম-করা সদস্যকেও রেয়াত করেন না।

যোগেন মাস্টার আবার বলেছেন, 'যে জিনিসটা আগে আপনার ভেতর একফোঁটাও দেখিনি এবার যেন সেটা একটু একটু লক্ষ করা যাচ্ছে।'

যোগেন মাস্টারের বলার ধরনে উৎকণ্ঠা বোধ করছিলেন নিখিলেশ। বলেছেন, 'কী বলুন তো?'

'অহংবোধ।'

'অহং বোধ?'

'আপনি হয়তো ভেবেছেন, যাদের জন্যে একসময় যথেষ্ট কাজ করেছেন তারা চিরকাল আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। কিন্তু পিপলের মেমারি ভীষণ শর্ট। তাদের সবসময় ছুঁয়ে থাকতে হয়, বিশেষ করে আপনাদের মতো পার্টি-করা লোকেদের। নইলে যোগাযোগটা আলগা হতে হতে তারা হাতের বাইরে চলে যায়।'

'আমি তো আগের মতো সারাক্ষণ এখানে পড়ে থাকতে পারি না। তবে পার্টির লোকজনেরা আছে। তারা সিনসিয়ার ওয়ার্কার, মানুষের সঙ্গে রেগুলার যোগাযোগ রাখে।'

যোগেন মাস্টার বলেছিলেন, 'তা হয়তো রাখে। কিন্তু আপনার সঙ্গে ওদের কোয়ালিটেটিভ ডিফারেন্স আছে।'

নিখিলেশ বলেছেন, 'ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

যোগেন মাস্টার বুঝিয়ে দিয়েছেন। নিখিলেশ একদিন যে এই অখ্যাত তালবনিতে এসেছিলেন তার পেছনে ছিল প্রবল এক উদ্দীপনা। ছিল শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার

নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য। শহরে গলা-ফাটানো বক্তৃতাবাজি আর তাত্ত্বিক কচকচি দিয়ে নয়; লক্ষ্যপূরণের জন্য অনেক দূরে মাটির কাছাকাছি যে জনগণ, তাদের জন্য তাদের মধ্যে থেকে কাজ করে গেছেন—একান্ত নিষ্ঠায় এবং গভীর আন্তরিকতায়। তখন নির্বাচনের চিন্তা মাথায় ছিল না। সমস্ত ভাবনা জুড়ে শুধু মানুষ আর মানুষ। কিন্তু নিখিলেশের পর তালবনির সংগঠনে যে পার্টির কর্মীরা এসেছে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল এখানকার ভোটব্যাঙ্ক অক্ষত রাখা। তারা অঙ্ক কষে, হিসেব করে মানুষের সঙ্গে ততটুকুই যোগাযোগ রাখে যাতে পরের নির্বাচনে নির্বিঘ্নে দলের ক্যান্ডিডেট হেসে খেলে জিতে যেতে পারে। এখান থেকে বিধানসভায় পার্টির একজন সদস্য বাড়ানো ছাড়া আর কিছু তারা ভাবে না। গ্রামের মানুষকে আজকাল বোকা ভাবার কারণ নেই। তারা যথেষ্ট সচেতন। তাদের চোখকান খুলে গেছে। মুখের কথায় সেখানে চিড়ে ভিজবে না। কে কোন মতলবে তাদের কাছে যায় সেটা ওরা খুবই ভাল বোঝে।

সব শোনার পর চুপ করে ছিলেন নিখিলেশ। কোনও মন্তব্য করেননি।

যোগেন মাস্টার একটানা বলে যাচ্ছিলেন, 'অন্য একটা দিক থেকেও আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি নিখিলেশবাবু—'

উৎকণ্ঠা বাড়ছিল নিখিলেশের। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোন দিক থেকে?'

'আপনার বিরোধী পার্টিগুলো, বিশেষ করে নিবারণ হালদাররা কৃষক সংগঠনের ওপর খুব জোর দিয়েছে। প্রকৃতির নিয়মে কোনও কিছুই ফাঁকা থাকে না। আপনার অ্যাবসেন্সটা কাজে লাগিয়ে ওরা যদি সত্যিই মানুষের মনে ছাপ ফেলতে পারে, আপনারা কিন্তু অসুবিধেয় পড়ে যাবেন।'

যে দু'জনকে পার্টি থেকে তালবনি অঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁরা হলেন পরিমল আচার্য আর সত্যজিৎ রাহা। দু'জনেই নিখিলেশের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। যোগেন মাস্টারের নাম না করে তাঁদের সঙ্গে ওই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি।

পরিমল বলেছেন, 'এসব দুশ্চিন্তা আপনার মাথায় আসছে কেন নিখিলেশদা? আমাদের অর্গানাইজেশন ঠিক কাজ করে চলেছে। কৃষক আর শ্রমিকদের সঙ্গে রেগুলার কনট্যাক্ট রেখে যাচ্ছি। কত কষ্ট করে বহু বছর এখানে পড়ে থেকে একটা পার্টি বেস আপনি তৈরি করেছেন, সেটা আমরা কখনও নষ্ট হতে দিতে পারি? কোনও রকম চিন্তা করবেন না নিখিলেশদা।'

সত্যজিৎ বলেছিলেন, 'আমাদের পার্টির যে সলিড ফাউন্ডেশন তালবনিতে রয়েছে, নেক্সট পঞ্চাশ বছরেও তা এতটুকু নড়ানো যাবে না। এখানকার পিপল আমাদের সঙ্গেই থাকবে। নিশ্চিন্ত থাকুন, আমাদের পার্টির ক্যান্ডিডেট ছাড়া ওরা অন্য কাউকে ভোট দেবে না।'

নিখিলেশ বলেছেন, 'তবু তোমাদের একটা কথা বলব—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন না—'

'শুধু ভোটের কথা মাথায় রেখে মানুষের সঙ্গে মেশা ঠিক নয়। তাদের সুখদুঃখের

ভাগও নিতে হবে। ওরা যাতে মনে করে আমরা বাইরের কেউ নই, ওদেরই ঘরের লোক।'

সত্যজিৎ এবং পরিমল, দু'জনেই বলেছেন, মানুষের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্ক রাখতে হয় সেটা ওঁরা জানেন। জনসমর্থনে যাতে চিড় না ধরে সেদিকে তাঁদের সর্বক্ষণ নজর আছে।

অন্যদিকে আর একটা ব্যাপার ঘটেছিল। নিখিলেশ এম এল এ হবার পর পাঁচটা বছর তখন শেষ হবার মুখে। আর কয়েক মাসের মধ্যে নতুন নির্বাচন। সেভাবে না হলেও প্রস্তুতি চলছে। পার্টি থেকে মোটামুটি স্থির হয়েছে, আগের নির্বাচনে যাঁরা যাঁরা ভাল মার্জিনে জিতেছেন তাঁদের মনোনয়নপত্র দেওয়া হবে। যাঁরা হেরে গেছেন তাঁদের টিকেট দেবার প্রশ্নই নেই। তবে অল্প ভোটে যাঁরা তরে এসেছেন তাঁদের কেসগুলো সব দিক খতিয়ে দেখা হবে। পরের ইলেকশানে জেতার সম্ভাবনা থাকলে তবেই তাঁরা টিকেট পাবেন। নিখিলেশের এসব কোনও সমস্যাই নেই। প্রার্থী তালিকার একেবারে গোড়ার দিকে তাঁর নামটা রয়েছে।

এই পাঁচ বছরে বড় ছেলে পল্টু এম. এসসি পাস করে গেছে। অনুপমা এবং নিখিলেশের ইচ্ছা, কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে ভাল একটা চাকরি বাকরিতে ঢুকে যাক। কিন্তু কী করবে, তখনও মনস্থির করতে পারেনি। ছোট ছেলে সন্তু বি এ পাস করে এম এ পড়ছে। আর মিলি হায়ার সেকেন্ডারির পর কলেজে ভর্তি হয়েছে।

বিধানসভার প্রভাবশালী, জনপ্রিয় সদস্য হিসেবে তাঁর সুনাম যত ছড়িয়ে পড়ছিল ততই বাড়িতে নানা ধরনের মানুষের ভিড় বাড়ছিল। বেশির ভাগই সুযোগ সুবিধা নিতে আসত। পারমিটের ব্যবস্থা করে দিন, কনট্র্যাক্ট পাইয়ে দিন, ইত্যাদি। এরা সোজাসুজি তাঁর কাছে আসত না, আসত পল্টু বা রঞ্জন আর অনুপমাকে ধরে। কখনও সখনও সন্তু অর্থাৎ সঞ্জয়কেও ধরত। সবার আশাপূরণ করা সম্ভব হয়নি। তবে ছেলে আর স্ত্রীর জন্য দু-চারজনকে কিছু না কিছু দিতেও হয়েছে।

পাঁচ বছর বাদে গণতান্ত্রিক কার্যক্রম অনুযায়ী পরের নির্বাচনের তারিখ ঠিক হয়ে গেল। পার্টি থেকে নিখিলেশকে তালবনিতে চলে যেতে বলা হল। যতদিন না নির্বাচন শেষ হচ্ছে, তিনি ওখানেই থাকবেন।

প্রচার শুরু হয়ে যায়। সেই মিটিং, মিছিল, পোস্টার, ফেস্টুন এবং স্লোগানে স্লোগানে চারিদিক তোলপাড় করে ফেলা। কিন্তু আগের বারের তুলনায় এসব কয়েক গুণ বাড়াতে হয়েছিল। কেননা প্রথম বার জমি যতখানি ফাঁকা পাওয়া গিয়েছিল এবার ততটা নয়। অন্য রাজনৈতিক দলগুলো সহজে ছেড়ে দিতে চায়নি। প্রচারের মাত্রাটা তারাও বাড়িয়ে দিয়েছে। নির্বাচনটা তাদের কাছেও অস্তিত্ব রক্ষাই শুধু নয়, ক্ষমতা দখলেরও লড়াই।

আগের বার মিটিং, মিছিল সম্বন্ধে আগ্রহ কম ছিল নিখিলেশের। আত্মবিশ্বাস তখন এতটাই বেশি যে জেতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু এবার মনে হয়েছে কাজটা অত মসৃণ নয়। নিখিলেশ যে গত পাঁচটা বছর এখানে একটানা থাকতে পারেন

নি, মাঝে মাঝে অনিয়মিত যাতায়াত করেছেন, সেটা যে এখানকার মানুষের ভাল লাগে নি, প্রচারে নেমে তা টের পাওয়া গেল। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে চোরা বানের মতো এই নির্বাচন কেন্দ্রে অন্য দলগুলো বেশ কিছুটা ঢুকে পড়েছিল। যোগেন মাস্টারের সতর্কবাণী বার বার মনে পড়ে যাচ্ছিল তাঁর। চোখের সামনে না থাকলে মানুষ বোধহয় সত্যিই ভুলে যেতে থাকে। তাছাড়া অন্য দলের প্রার্থীরা বাড়ি বাড়ি লোক পাঠিয়ে এমন একটা গোপন প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল যা নিখিলেশের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর। তিনি যে এত বছর এখানে কাটিয়ে গেছেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করে নির্বাচনে জিতে কলকাতায় গিয়ে আরামে দিন কাটানো। এম এল এ হবার পর গত পাঁচ বছরে তাঁর কনস্টিটিউয়েন্সিতে ক'বার এসেছেন তিনি, জনগণ কিভাবে আছে তার খোঁজ কতটুকু নিয়েছেন? এবারও যে এসেছেন তার লক্ষ্যও একটাই; ভোটে জিতে কলকাতায় গিয়ে বসে থাকবেন। সল্ট লেকের বাড়ির কথাও ঢাক বাজিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নিখিলেশ যে জীবনের অনেকগুলো বছর তালবনিতে কাটিয়ে গেছেন সেটা নাকি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে একটা লাভজনক ইনভেস্টমেন্ট বা বিনিয়োগ, ইত্যাদি।

নিখিলেশ টের পাচ্ছিলেন, তাঁর জনসমর্থনে ধস না নামলেও ঘুণ ধরতে শুরু করেছে। তালবনির সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতার আত্মসম্মানে প্রচণ্ড ঘা লেগেছিল যেন। পাঁচ বছর অনিয়মিত এখানে যাতায়াতের কারণে যে জমিটুকু তিনি হারিয়েছেন তা পুনরুদ্ধারের জন্য দিনরাত শহর আর গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে ঠিক আগের বারের মতো হাতজোড় করে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

আগের বার মিটিং টিটিংয়ের ব্যাপারে নিখিলেশের ঘোর অনিচ্ছা ছিল। এবার আর আপত্তি করেননি। প্রতিটি নির্বাচনী সভাতেই অনেকটা সময় ধরে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। নিজের মুখে নিজের প্রশংসা, নিজের গুণকীর্তন কখনও করেন না। নিজের হাতে নিজের ঢাক পেটাতে তাঁর ভীষণ খারাপ লাগে। কিন্তু এবার পুরোপুরি না হলেও তার খানিকটা তাঁকে করতে হয়েছে। কেননা টের পাচ্ছিলেন, পায়ের নিচের মাটি বেশ আলগা হয়ে গেছে। বুঝতে পারছিলেন আত্মবিশ্বাস আগের মতো অটুট নেই। তাই এবার অদূর অতীতে জনগণের জন্য কতটা ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন নিজের কেরিয়ার, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে তালবনির মানুষদের জন্য জীবনের সবচেয়ে সেরা সময়টা কত কষ্ট করে এখানে কাটিয়েছেন। তাঁর চিন্তাভাবনা, ধ্যানজ্ঞান, কর্মক্ষমতা — সমস্ত কিছুই জনগণের হিতে উৎসর্গ-করা। কিন্তু অতীতে কী করেছেন, সে সব শুনতে কেউ রাজি নয়। জনসভাগুলোতে টের পাওয়া যাচ্ছিল তাঁর বিপক্ষে হাওয়া কতটা ঘুরে গেছে। প্রতিটি সভায় শ্রোতাদের ভেতর থেকে লোকজন উঠে দাঁড়িয়ে গোলমাল পাকিয়েছে। জিজ্ঞেস করেছে, 'আপনাকে ভোট দিয়ে এম এল এ বানিয়েছিলাম। আমাদের জন্যে এই পাঁচ বছরে আপনি কী করেছেন? তালবনির কতটুকু উন্নতি হয়েছে?'

এই লোকগুলোর অনেকেই যে বিরুদ্ধ পক্ষের এবং তাদের উদ্দেশ্য যে তাঁকে বিপাকে ফেলা তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি নিখিলেশের। কিন্তু এদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছিল

সাধারণ কিছু মানুষও যারা রাজনীতির ধার ধারে না। এটা মানতেই হয়েছে ওদের অভিযোগগুলো সবটাই মিথ্যে নয়।

তালবনি থেকে দুটো কাগজ বেরুত। একটা সাপ্তাহিক, আর একটা চারপাতার লাল কাগজে ছাপা দৈনিক। তারা মোটামুটি নিখিলেশের পক্ষেই ছিল। তিনি যে অত্যন্ত সৎ একজন জননেতা সেটা স্বীকার করে নিয়েও বার বার মনে করিয়ে দিয়েছে তালবনি এবং তার চারপাশের উন্নয়নের জন্য কিছুই করেননি নিখিলেশ।

নির্বাচনী প্রচারের প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে যোগেন মাস্টারের বাড়ি গেছেন নিখিলেশ।

যোগেন মাস্টার হেসে, ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, 'মিউজিকটা কিরকম ফেস করছেন? পিপল খুব ডিফিকাল্ট বস্তু স্যার। আমি আগেই ওয়ার্নিং দিয়েছিলাম—মনে আছে?'

জনসভায় তো বটেই, খবরের কাগজের রিপোর্টার আর যোগেন মাস্টারকেও নিখিলেশ বলেছেন, নির্বাচিত হলে আগের বারের ভুলত্রুটি শুধরে তালবনির উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন এবং এখানেই বেশির ভাগ সময়টা কাটাবেন।

নির্বাচন হয়ে গেল। এবারও জিতলেন নিখিলেশ। তবে জয়ের মার্জিনটা আগের মতো নেই। পনেরো হাজারের মতো ভোট কম পেয়েছেন তিনি। প্রতিজ্ঞা করলেন, ভোট ব্যাঙ্কে যেটুকু ক্ষতি হয়েছে তা যেভাবেই হোক, পূরণ করবেন।

কিন্তু একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তালবনির মানুষদের কাছে অনেক আগের মতো এসে থাকাটা সম্ভব হল না। পার্টি যে মন্ত্রিসভা গঠন করল তাতে খুব বড় মাপের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পোর্টফোলিও দেওয়া হল নিখিলেশকে। তিনি ভাবতেই পারেননি দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মাথায় এরকম একটা পরিকল্পনা ছিল। যখন জানানো হল কাউন্সিল অফ মিনিস্টারদের তালিকায় তাঁর নাম আছে, প্রথমটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল।

এম এল এ যখন ছিলেন নিখিলেশের যতটা ব্যস্ততা ছিল, মন্ত্রী হবার পর তা বহুগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু নির্বাচনী সভায় তিনি যা ঘোষণা করেছিলেন সেটা ভুলে যাননি। মন্ত্রিত্বের শপথ নেবার কিছুদিন পর তিনি তালবনিতে ছুটে গিয়েছিলেন। আগের বার যতদিন এম এল এ ছিলেন বেশির ভাগ সময় ট্রেনেই সেখানে যাতায়াত করেছেন। মনে আছে, বড় ছেলে পল্টুকে ধরে যারা সুযোগসুবিধার জন্য আসত তাদের কেউ কেউ বার কয়েক তাঁকে তালবনিতে পৌঁছে দিয়েছে। প্রথমটা তিনি রাজি হননি। কিন্তু পল্টুই জোর করেছে। বলেছে, 'সারা জীবন তো ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাসের গাদানো ভিড়ের ভেতর কষ্ট করে ট্র্যাভেল করেছ। একজন যদি ভালবেসে তার গাড়িতে তোমার কনস্টিটিউয়েন্সিতে নিয়ে যায়, আপত্তি করছ কেন?' নিখিলেশ একটি শর্তে রাজি হয়েছেন, এর জন্য কেউ যেন তাঁর কাছে বেশি কিছু প্রত্যাশা না করে। পল্টু বলেছে, 'ঠিক আছে, করবে না।'

মন্ত্রী হবার পর সরকারি গাড়িতেই তালবনি গেছেন। দলের স্থানীয় কর্মী, বিশেষ করে পরিমল এবং সত্যজিৎকে একটা জনসভার আয়োজন করতে বলেছিলেন নিখিলেশ।

মনে পড়ে, সেবার চারদিন তালবনিতে ছিলেন তিনি। কিন্তু মন্ত্রী তো ঝাড়া হাত-পা

সাধারণ মানুষ নন, তাঁদের সঙ্গে বডিগার্ড, পার্সোনাল অ্যাসিস্টান্ট ইত্যাদি নানা ধরনের লেজুড় থাকে। শুধু দেহরক্ষীই নয়, স্থানীয় প্রশাসনকে তাঁদের সিকিউরিটিরও ব্যবস্থা করতে হয়। তাঁদের কাছে সারাক্ষণ ভিড় লেগে থাকে। এস পি, ডি এস পি, এ ডি এম, ডি এম— এঁরা তো আছেনই, অঞ্চলের বিশিষ্ট বিজনেসম্যান আর অনুগ্রহপ্রার্থীরা সারাক্ষণ তাঁদের চারপাশে ভনভনে মাছির মতো ঘিরে থাকে।

নিখিলেশের ইচ্ছা ছিল যোগেন মাস্টারের বাড়িতেই ক'টা দিন থাকবেন কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। এত লোকজন আর ভিড়ভাট্টা নিয়ে সেখানে গেলে ওঁদের চূড়ান্ত অসুবিধায় ফেলা হবে। তাই তিনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের গেস্ট হাউসে উঠেছিলেন। তবে রোজ একবার করে যোগেন মাস্টারদের কাছে ছুটে গেছেন। বডিগার্ড বা পি এ, কাউকে সঙ্গে নেননি। এতে সিকিউরিটির লোকেরা আপত্তি করেছিল। তিনি গ্রাহ্য করেন নি। নিরাপত্তার এত কড়াকড়ি হলে জনসংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। মানুষেব কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। তিনি জোর করে সশস্ত্র রক্ষী ছাড়া শুধু যোগেন মাস্টারের বাড়িতেই যেতে পেরেছিলেন কিন্তু হাজার হাজার সাধারণ মানুষের কাছে তাঁকে একা যেতে দেওয়া হয় নি।

মনে আছে, যোগেন মাস্টারের বাড়ি গেলে তিনি বলেছিলেন, 'মন্ত্রী হবার পর তালবনিতে এলেন। কথা রেখেছেন তা হলে!'

নিখিলেশ জোর দিয়ে বলেছেন, 'ইলেকশানের আগে যা যা বলেছি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। আপনি মিলিয়ে নেবেন।'

'সত্যিই যদি তা পারেন,' যোগেন মাস্টার বলেছিলেন, 'সেটা হবে একটা বড় রকমের দৃষ্টান্ত। পলিটিক্যাল নেতারা পিপলকে মই হিসেবে ইউজ করে। স্বার্থসিদ্ধি হয়ে গেলে তাদের লাথি মেরে ফেলে দেয়। নাইনটি নাইন পারসেন্ট ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের এটাই হল তিক্ত অভিজ্ঞতা।'

'সেই অভিজ্ঞতা এবার বদলে যাবে।'

'আমরা তার জন্যে আশা করে থাকব।'

একটু ভেবে নিখিলেশ বলেছেন, 'শুনেছেন বোধহয়, আমি এখানে একটা মিটিং করছি।'

যোগেন মাস্টার বলেছেন, 'আপনার পার্টির ওয়ার্কাররা সারাদিন লাউড স্পিকারে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তালবনি আর আশেপাশের গাঁগুলোতে মিটিংয়ের কথা জানাচ্ছে। না শুনে উপায় আছে?'

'কষ্ট করে একবার মিটিংটায় যাবেন। তালবনির ডেভলাপমেন্টের জন্যে আমি কিছু অ্যানাউন্স করব।'

'অবশ্যই যাব।'

সত্যজিৎ, পরিমল এবং দলের কর্মীরা স্টেশনের পাশে বাজারের পেছন দিকের ফাঁকা মাঠটায় বিশাল জনসভার আয়োজন করেছিল। এই অঞ্চলের ভোটে নির্বাচিত মন্ত্রী নিখিলেশ মজুমদার কী বলেন তা শোনার জন্য সাধারণ মানুষের সে কী উদ্দীপনা! দলের

কর্মীরা আগেই মিটিংয়ে যোগ দেবার কথা বলতে গিয়ে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে জানিয়ে দিয়েছিল, নিখিলেশ তালবনি এলাকার উন্নয়নের জন্য বিরাট 'প্যাকেজ' নিয়ে এসেছেন। মূলত সেই কারণেই বেশি করে সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

মিটিং হবার কথা চারটেয়। তার অনেক আগেই লোক আসতে শুরু করেছিল। চারটের মধ্যেই মাঠ জুড়ে জনসমুদ্র। অবশ্য মঞ্চে সিকিউরিটি গার্ডরা নির্মম পাথুরে মুখ নিয়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে ছিল। মন্ত্রী হবার পর এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। তিনি যেখানেই যান ওরা ছায়ার মতো পাশে পাশেই থাকে।

নিখিলেশই ছিলেন একমাত্র বক্তা। পরপর দু'বার তাঁকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করার জন্য জনগণকে অসীম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিলেন, মন্ত্রী হলেও তিনি তাদেরই একজন। সুখে দুঃখে সর্বক্ষণ তাদের সকলের পাশে থাকবেন।

এরপর তালবনি অঞ্চলের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির কথা ঘোষণা করেছিলেন নিখিলেশ। মেঘাই নদীর কাঠের পুলটা জরাজীর্ণ হয়ে গেছে, সেখানে একটা মজবুত কংক্রিটের ব্রিজ করা হবে। তালবনির জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে আরও একটা কলেজ, বেশ কয়েকটা প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি স্কুল, প্রসূতিদের জন্য আলাদা মেটার্নিটি হোম করে দেবেন। এখানকার হাসপাতালের হাল শোচনীয়। সেখানে মাত্র কুড়িটা বেড। এক্স-রে মেশিন থেকে শুরু করে অন্যান্য যন্ত্রপাতি বহুকালের পুরনো। অপারেশন থিয়েটারের অবস্থা কহতব্য নয়। সব পালটে ফেলে এখানকার হাসপাতালের গায়ে একটা অ্যানেক্স বিল্ডিং করা হবে, সেখানে থাকবে দেড়শ'টা বেড। রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা, খানখন্দে বোঝাই। সেগুলো সারানো তো হবেই, নতুন নতুন পিচের রাস্তাও বানানো হবে। চারপাশের গ্রামগুলোতে পানীয় জলের অভাব, দূর দূর থেকে খুব কষ্ট করে মেয়েদের জল বয়ে নিয়ে আসতে হয়। প্রতিটি গ্রামে দুটো করে টিউবওয়েল বসানো হবে। বৃষ্টি না হলে এখানকার চাষবাস বন্ধ, সেচের জন্য নদী থেকে ক্যানাল কেটে জল আনার ব্যবস্থা করা হবে। গ্রামের দিকে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। বছর দুয়েকের মধ্যে যাতে পৌঁছয় তার জন্য চেষ্টা করা হবে।

নিখিলেশ এক একটা প্রকল্প ঘোষণা করছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাততালিতে চারিদিক ফেটে পড়ছিল। জনগণ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল, স্বপ্নের এক সওদাগর সামান্য একটা করে ভোটের বিনিময়ে পার্থিব যাবতীয় সুখ তাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

মিটিংয়ের পরের দিন নিখিলেশ সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তালবনি শহর এবং তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে কলেজ, স্কুল, ব্রিজ, হাসপাতালের শিলান্যাস করলেন। এইসব অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিশিষ্ট মানুষেরা — কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, হায়ার সেকেন্ডারি বয়েজ এবং গার্লস স্কুলের হেডমাস্টার, হেডমিস্ট্রেস, উকিল, অধ্যাপক, বড় বড় বিজনেসম্যানরা হাজির তো ছিলেনই, কাতারে কাতারে সাধারণ মানুষ এসে জমা হয়েছিল। তালবনির অধিবাসীদেব কাছে শিলান্যাসের এই অনুষ্ঠানগুলো ছিল দারুণ উৎসবের মতো। নিখিলেশের নামে তারা গলার শির ছিঁড়ে একটানা জয়ধ্বনি দিয়ে যাচ্ছিল। কাউকেই থামানো যাচ্ছিল না, প্রচণ্ড এক হিস্টিরিয়া যেন তাদের ওপর ভর করেছিল।

শিলান্যাস শেষ হবার পর সেদিনই কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন নিখিলেশ। যাবার আগে যোগেন মাস্টারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

যোগেন মাস্টার বলেছিলেন, 'এতগুলো প্রোজেক্ট একসঙ্গে অ্যানাউন্স না করলেই পারতেন নিখিলেশবাবু। মিটিংয়ে শুধু ঘোষণাই নয়, প্রত্যেকটার ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করে গেলেন। প্রোজেক্টগুলো শেষ পর্যন্ত কমপ্লিট হবে তো?'

স্পষ্টভাষী, নির্লোভ যোগেন মাস্টারকে খুবই শ্রদ্ধা করেন নিখিলেশ। তিনি যা বলেন তার প্রতিটি শব্দ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে শোনেন। কিন্তু সেদিন প্রথম তাঁর মনে হয়েছিল, লোকটার স্বভাব হল অন্যের খুঁত ধরা। কোনও কিছুই সহজভাবে নিতে পারে না, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দোষত্রুটি বার করতে চেষ্টা করে।

তখনও হাজার হাজার মানুষের জয়ধ্বনি কানে বাজছে নিখিলেশের। জনগণের উদ্দীপনা তাঁকে যেন অদ্ভুত আবেগের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। জনপ্রিয়তা ভেতরে ভেতরে সুখকর তৃপ্তি আর উত্তেজনার সৃষ্টি করছিল। এরই মধ্যে যোগেন মাস্টারের বাঁকা সুরের প্রশ্নটা তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। বিরক্ত গলায় বলেছিলেন, 'কমপ্লিট হবে কিনা, দু'বছরের ভেতর মিলিয়ে নেবেন।'

যোগেন মাস্টার হেসে হেসে বলেছেন, 'ঠিক আছে, দু'বছর অপেক্ষা করে দেখি —'

শিলান্যাস করে সেই যে চলে এসেছিলেন, তারপর অনেক দিন তালবনিতে যাওয়া হয়নি। নিজের ডিপার্টমেন্টে প্রচুর গোলমাল ছিল, সেগুলো ঢেলে সাজাতে হয়েছে। শুধু তালবনিই তো নয়, মন্ত্রী হবার পর এত বড় একটা স্টেটের নানা জায়গার জন্য নতুন নতুন পরিকল্পনা তৈরি করতে হচ্ছিল। তার মধ্যে কোনওটা দীর্ঘমেয়াদি, কোনওটা স্বল্পকালীন। এর জন্যে তাঁর ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ছাড়াও অন্যান্য অফিসারদের নিয়ে বসে যে সব প্রোজেক্টের কাজ চলছে সেগুলোর কোনও সমস্যা থাকলে আলোচনা করে তা দূর করতে হয়। ভবিষ্যতের প্রোজেক্টগুলোর রূপরেখার ব্যাপারে মতামত দিতে হয়।

তাছাড়া প্রতি সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রী অন্য মন্ত্রীদের ডেকে মিটিং করেন। কার ডিপার্টমেন্টে কী কাজ হচ্ছে সে সম্বন্ধে তাঁকে নিয়মিত জানাতে হয়। এই মিটিংগুলোতে হাজির না হলেই নয়। ওদিকে বিধানসভার অধিবেশন চলার সময় বিরোধী পক্ষের ঝানু সদস্যরা তাঁর ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকেন। উত্তর দেবার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত হতে হয়।

মনে পড়ে, এক রবিবারের বিকেলে বাড়িতেই ছিলেন নিখিলেশ। ছুটির দিনগুলোতেও ছাড় নেই। নানারকম সরকারি এবং বেসরকারি অনুষ্ঠান থাকে। উদ্যোক্তারা জোর করে ধরে নিয়ে যায়। তবে পারতপক্ষে সপ্তাহের এই একটা দিন বেরুতে চান না তিনি। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হালকা মেজাজে গল্প করে কাটিয়ে দেন। টিভি দেখার অভ্যাস তাঁর কোনও কালেই নেই। তবে ভাল ফিল্ম বা খেলা থাকলে সবার পাল্লায় পড়ে দেখতে হয়।

সেদিন একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে একটা চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করার কথা ছিল

নিখিলেশের। ছবিটবি তিনি বিশেষ বোঝেন না। কিন্তু মন্ত্রী হলে এসব করতে হয়। শুধু জনগণ নয়, শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগটাও রাখা দরকার।

হঠাৎ জ্বর হওয়ায় উদ্বোধন করতে যাওয়া হয়নি। ড্রইংরুমে অনুপমা আর মিলির সঙ্গে বসে টিভিতে একটা জনপ্রিয় বাংলা ছবি দেখছিলেন নিখিলেশ। পল্টু আর সন্তু কেউ বাড়িতে ছিল না।

ছবিটা যখন দারুণ ক্লাইমেক্সে পৌঁছেছে সেই সময় পল্টু বাড়ি ফিরে এল। সঙ্গে মাঝবয়সী দুটি লোক। একজনের পরনে ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি। ধুতি পরার ধরন আর নকশাওলা টুপি দেখে বোঝা যায় লোকটি গুজরাটি। অন্যজনের গায়ে সাফারি স্যুট। তিনিও অবাঙালি, তবে ভারতের কোন অঞ্চলের মানুষ সেটা অবশ্য প্রথমে ধরা যায়নি।

লম্বা ড্রইংরুমের একধারে যেখানে টিভিটা রয়েছে, সেখানে বসার জন্য এক সেট সোফা আছে। দূরে, অন্য ধারে আর একটা সেট। সেগুলোর পাশে নিচু ডিভান। পল্টু তার সঙ্গীদের সেখানে বসিয়ে নিখিলেশদের কাছে এল। বলল, 'বাবা, দুই ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

নিখিলেশ আগন্তুকদের লক্ষ করেছিলেন। বললেন, 'কেন?'

'বিশেষ দরকার আছে। এস—'

একজন মন্ত্রীর সঙ্গে আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে দেখা করা যায় না। কিন্তু ছেলে নিয়ে এসেছে। মনে মনে বিরক্ত হলেও না বলা যায়নি। নিখিলেশ বলেছিলেন, 'ওয়েট করতে বল। আমি আসছি।'

সাক্ষাৎপ্রার্থীরা ঘাড়ের ওপর বসে আছে। সিনেমায় মন বসাতে পারছিলেন না নিখিলেশ। মিনিট দশেক বাদে উঠে পল্টুদের কাছে চলে এসেছিলেন।

পল্টুর সঙ্গীরা কোমর থেকে শরীরের ওপর দিকটা অনেকখানি ঝুঁকিয়ে, হাতজোড় করে বশংবদ ভঙ্গিতে নমস্কার করেছিলেন।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে তাঁদের বসতে বলেছেন নিখিলেশ। পল্টু দু'জনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। ধুতি-পরা লোকটি মোহনদাস পারেখ, আর সাফারি পরাটি প্রভুদয়াল মোদি। ওঁরা বিখ্যাত বিজনেসম্যান। নিখিলেশ তাঁদের নাম আগেই শুনেছেন। এর আগে তাঁদের বাড়িতে কোনও ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বা বিজনেসম্যান আসেনি। এ জাতীয় মানুষদের সঙ্গে তাঁর যেটুকু দেখাসাক্ষাৎ সব বাড়ির বাইরে।

রীতিমত অবাক হয়ে নিখিলেশ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনাদের জন্যে কী করতে পারি বলুন—'

মোহনদাস বা প্রভুদয়াল মুখ খোলার আগে পল্টু বলেছিল, 'আমি বলছি বাবা। এম. এসসি'র রেজাল্ট বেরুবার পর তোমাকে বলেছিলাম, চাকরি করব না, বিজনেস করতে চাই — মনে আছে?'

পল্টু বিজনেস করার কথা আদৌ বলেছে কিনা মনে করতে পারেননি নিখিলেশ। বলেছিলেন, 'হয়তো বলেছ।'

পল্টু বলেছে, 'আমি একটা বড় সুযোগ পাচ্ছি। বিজনেসের ব্যাপারে মিস্টার পারেখ আর মিস্টার মোদি আমাকে সাহায্য করতে চাইছেন। এই ব্যাপারে ওঁরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন।'

নিখিলেশের বিস্ময় এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছেন, 'মিস্টার মোদি আর মিস্টার পারেখের মতো বড় বিজনেসম্যানের সঙ্গে তোর আলাপ হল কী করে?'

পল্টু জানিয়েছিল, মোহনদাস পারেখের এক ভাইপো অক্ষয় তার সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়ত। সে-ই তার সঙ্গে কাকার আলাপ করিয়ে দেয়। মোহনদাসের একটা ব্যবসার পার্টনার প্রভুদয়াল। মোহনদাসের সূত্রেই প্রভুদয়ালের সঙ্গে পরিচয়।

নিখিলেশ এবার আগন্তুকদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মিস্টার মোদি, মিস্টার পারেখ, আমার ছেলে সবে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েছে। ব্যবসা করার ইচ্ছে হয়তো আছে কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনওরকম এক্সপিরিয়েন্স নেই। আপনাদের মতো বিগ বিজনেসম্যান ওকে হেল্প করতে চাইছেন কেন?'

মোহনদাস বলেছিলেন, 'হি ইজ আ ভেরি ব্রাইট ইয়াং ম্যান। ও বিজনেসে এলে শাইন করবে। একজন এন্টারপ্রাইজিং যুবকের পেছনে দাঁড়ানোই তো উচিত।'

প্রভুদয়াল বলেছিলেন, 'কিছু মনে করবেন না স্যার, বাঙালিদের মধ্যে বিজনেস অ্যাকুমেনটা একেবারেই নেই। সবাই বি. এ, এম. এ পাস করে চাকরি করতে চায়। চাকরি করে কতদূর আর এগুনো যায়? আপনার ছেলের মধ্যে প্রসপেক্ট আছে। তাকে উৎসাহ না দিলে অন্যায় করা হবে।'

বলার মধ্যে সামান্য একটু টান থাকলেও প্রভুদয়ালরা নির্ভুল বাংলাতেই কথা বলছিলেন। খুব সম্ভব এখানেই তাঁদের জন্ম এবং কয়েক পুরুষ ধরে কলকাতাতেই আছেন।

প্রভুদয়ালদের বাংলা ভাষার দখল নিয়ে কিছুই ভাবছিলেন না নিখিলেশ। দেশে উদ্যমশীল যুবকের অভাব নেই। তবু পল্টুকেই ওঁরা বেছে নিলেন কেন? শুধু তাই নয়, ওর সম্বন্ধে প্রভুদয়ালরা এতটাই উচ্ছ্বসিত যে নিজেদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে বাড়ি পর্যন্ত ছুটে এসেছেন। এটাই নিখিলেশকে দারুণ ভাবিয়ে তুলেছিল।

কখন যে টিভিতে সিনেমা দেখে অনুপমা পাশের একটা সোফায় এসে বসেছেন, লক্ষ করেননি নিখিলেশ।

অনুপমা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু অনুমান করে বলেছিলেন, 'অত কী চিন্তা করছ! ওঁরা ভাল কথাই তো বলছেন।'

একটু চমকে উঠে নিখিলেশ একপলক অনুপমাকে দেখে নিয়ে বলেছিলেন, 'না, মানে—'

অনুপমা বলেছেন, 'ছেলেটা যখন চাকরি-বাকরি করবে না তখন ব্যবসাই করুক। মিস্টার মোদি আর মিস্টার পারেখের মতো ফোরমোস্ট বিজনেসম্যানরা ওকে গাইড করলে তার চেয়ে ভাল কিছু হতে পারে না।'

কয়েক পলক স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে চোখ দুটো প্রভুদয়ালদের দিকে ফিরিয়ে এনেছিলেন নিখিলেশ। বলেছিলেন, 'বিজনেস যে করবে, ক্যাপিটাল পাবে কোথায়?'

মোহনদাস বলেছেন, 'সেজন্যে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না স্যার। ওটা আমরা দেখব।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর নিখিলেশ জিজ্ঞেস করেছেন, 'সবই তো দেখছি আপনারা ঠিক করে ফেলেছেন। তা হলে আমার কাছে এসেছেন কেন?'

মোহনদাস বলেছেন, 'আপনার আশীর্বাদ চাইতে।'

চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গিয়েছিল নিখিলেশের। তিনি বলেছেন, 'আমার শুভেচ্ছা রইল। এর বেশি আমার কিন্তু আর কিছু দেবার নেই।'

পল্টু সেই যে মোহনদাসদের নিয়ে এসেছিল তার মাসখানেক কি মাসদেড়েক পর হঠাৎ একদিন খুব সকালে যোগেন মাস্টার এসে হাজির। কী একটা উপলক্ষে সেদিন সরকারি ছুটি ছিল।

যোগেন মাস্টার আগে কখনও তাঁদের নতুন বাড়িতে আসেননি। গৃহপ্রবেশের সময় সস্ত্রীক ওঁকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। কিন্তু আরতি অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসতে পারেননি। পরেও আসার জন্য অনেক বার অনুরোধ করা হয়েছে কিন্তু নানা কারণে ওঁদের আসাটা হয়ে ওঠেনি।

যোগেন মাস্টারকে দেখে নিখিলেশরা যতটা অবাক, অর চেয়ে অনেক বেশি খুশি।

অনুপমা বলেছিলেন, 'যাক, এতদিনে আসার সময় পেলেন তাহলে?'

নিখিলেশ মজার গলায় বলেছেন, 'সূর্যোদয়টা বোধহয় আজ পুবদিকের বদলে পশ্চিম দিকে হয়েছিল। নইলে এমন একটা অঘটন ঘটতে পারে!'

যোগেন মাস্টার উত্তর না দিয়ে একটু হেসেছিলেন।

নিখিলেশ এবার জিজ্ঞেস করেছেন, 'এত সকালে কোত্থেকে এলেন? তালবনির ট্রেন তো এসময় কলকাতায় আসে না।'

যোগেন মাস্টার বলেছেন, 'কাল এসেছি। রাত্তিরটা মির্জাপুর স্ট্রিটে আমার এক বন্ধুর মেসে কাটিয়ে আজ ভোরে বাস ধরেছিলাম।'

ক্ষুব্ধ স্বরে অনুপমা বলেছিলেন, 'এটা কিরকম হল! রাতটা মেসে না থেকে আমাদের এখানেও তো চলে আসতে পারতেন।'

যোগেন মাস্টার বলেছেন, 'শুনেছি একানকার রাস্তা টাস্তা সব একরকম। সেই গোলকধাঁধায় ঢুকে রাত্তিরে আপনাদের বাড়ি খুঁজে বার করতে পারব কিনা, বুঝতে পারছিলাম না। ভাবলাম, অন্ধকারে না হাতড়ে সকালেই যাব।'

নিখিলেশ বলেছেন, 'এটা একটা এক্সকিউজ হল? ঠিকানা জানা থাকলে বাড়ি বার করা কি খুব একটা কঠিন কাজ? কত দূর দূর থেকে রাত্তিরে লোক এসে দেখা করছে।' একটু থেমে বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানেন—'

‘কী?’

‘আপনি আজকাল আমাদের বন্ধু বলে ভাবেন না।’

যোগেন মাস্টার বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। বলেছেন, ‘এ আপনি কী বলছেন! নিজের লোক না ভাবলে কি আসতাম?’

অনুপমা বলেছিলেন, ‘যাও এলেন—একা একা। আরতিদিকে কি নিয়ে আসা যেত না?’

যোগেন মাস্টার জানিয়েছিলেন, দুটো খুব জরুরি কাজে তাঁকে কলকাতায় আসতে হয়েছে। প্রথমটা হল, তালবনি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ব্যাপারে স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলা। আরতি সঙ্গে এলে তাঁকে তাঁর কোনও ভাই বা বোনের বাড়িতে রাখতে হ’ত। অনেকদিন পর আসার জন্য আরতিকে কেউ ছাড়তে চাইতেন না। অথচ এখন কলকাতায় থাকার উপায় নেই। আজই যোগেন মাস্টারকে তালবনি ফিরে যেতে হবে। মাত্র একটা দিনের জন্য স্ত্রীকে এনে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে টানাহেঁচড়া করে নিয়ে যাওয়াটা খুবই খারাপ দেখায়। তাই আর ওই ঝঞ্ঝাটে তিনি যাননি।

যোগেন মাস্টারের দ্বিতীয় কাজটা হল, নিখিলেশের সঙ্গে দেখা করে তালবনি সম্পর্কে কিছু খবর দেওয়া।

নিখিলেশ উৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘কী খবর বলুন তো?’

অনুপমা বলেছিলেন, ‘দাঁড়াও। ঘুম থেকে উঠে ভদ্রলোক চলে এসেছেন। আগে ওঁর ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করি। তারপর সব শুনো।’

ব্যস্তভাবে নিখিলেশ বলেছিলেন, ‘কথা বলতে বলতে একেবারে খেয়াল ছিল না। যাও, সুধাকে খাবার টাবার করতে বল।’ সুধা অনেকদিন নিখিলেশদের বাড়িতে আছে। রান্নাবান্না, দু’বেলার জলখাবার তৈরি — এসব করে থাকে।

কিছুক্ষণ পর লুচি তরকারি সন্দেশ খেতে খেতে যোগেন মাস্টার বলেছিলেন, ‘আপনাকে শুধু খবরই না, ওয়ার্নিংও দিতে এসেছি নিখিলেশবাবু।’

বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলেন নিখিলেশ। এর আগেও দু-একটা ব্যাপারে সতর্ক করেছেন যোগেন মাস্টার। উদ্বিগ্ন মুখে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘কিসের ওয়ার্নিং?’

‘আপনি তালবনি অঞ্চলের ডেভলাপমেন্টের জন্যে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন। অনেকগুলো প্রোজেক্টের শিলান্যাস করে জনতার প্রচুর হাততালিও পেয়েছেন। কিন্তু —’

নিখিলেশ চুপ। এরপর যোগেন মাস্টার কী বলবেন সেটা আন্দাজ করে ভেতরে ভেতরে খুব অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি।

যোগেন মাস্টার থামেননি, ‘সেই সব গাল-ভরা, লম্বাচওড়া প্রতিশ্রুতির একটাও কিন্তু এখন পর্যন্ত পালন করেননি।’

নিখিলেশ চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছিলেন, ‘হ্যাঁ। নানারকম কাজের চাপে—’ কথাটা শেষ করেননি তিনি।

‘লেম এক্সকিউজ। আপনার সব চেয়ে বড় জোরের যে জায়গা সেটাকে কিন্তু অবহেলা করছেন নিখিলেশবাবু। এর আগেও ইলেকশানের সময় আপনাকে সাবধান

করে দিয়েছিলাম, আশা করি ভুলে যাননি।'

'না। মানে—'

'পিপলের মধ্যে খুব খারাপ রি-অ্যাকশন হচ্ছে।'

নিখিলেশ চমকে উঠেছেন। বলেছেন, 'তালবনির লোকেরা কিছু বলেছে?'

যোগেন মাস্টার খুব নির্লিপ্ত মুখে বলেছিলেন, 'এখনও বাপ-মা, চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছে না। তবু যা বলছে কানে সেগুলো মধুবর্ষণ করে না।'

আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয়নি নিখিলেশের। গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে শুধু তাকিয়ে ছিলেন।

যোগেন মাস্টার একটানা বলেই যাচ্ছিলেন, 'ওরা বলছে নিখিলেশ মজুমদার এক নম্বরের ফেরেববাজ। অন্য পলিটিক্যাল লিডারদের সঙ্গে তার কোনও তফাত নেই। মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ গুছিয়ে মন্ত্রী হয়ে বসেছে। পরের বার ভোটে দাঁড়াক, টের পাইয়ে ছাড়ব কত ধানে কত চাল।'

দেওয়াল ঘড়িতে শব্দ করে ন'টা বাজতে সেদিকে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন নিখিলেশ। বলেছেন, 'যোগেনবাবু, আমাকে এখনই বেরুবার জন্যে তৈরি হতে হবে। চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে আজ উইকলি মিটিংয়ে বসার দিন। আপনি একটু কষ্ট করে আজকের দিনটা আমাদের এখানে থেকে যান। তালবনির ব্যাপারে আপনার সঙ্গে ভাল করে আলোচনা করতে চাই।'

'আমার থাকার উপায় নেই। আজ ফিরে না গেলে আরতি খুব চিন্তা করবে।'

তখনও ফোন আসে নি যোগেন মাস্টারদের। নিখিলেশ সেটা জানতেন। বলেছিলেন, 'তার ব্যবস্থা করছি। রেডিও মেসেজে তালবনি থানাকে জানিয়ে দেওয়া হবে, আজ আপনি যাচ্ছেন না। ওরা গিয়ে আরতি বৌদিকে খবরটা দিয়ে আসবে।'

'শুধু সেই জন্যে নয়। স্কুলের ছেলেদের বলা আছে, আজ আমি ক্লাস নিতে পারব না, কেননা তালবনিতে ফিরতে ফিরতে দুটো আড়াইটে বেজে যাবে। তখন গিয়ে আর ক্লাস নেওয়া যায় না। কাল প্রথম ট্রেনটা ধরলে ফিরতে সেই দুটো আড়াইটা। কালও স্কুল কামাই হবে। ছেলেগুলোর ক্ষতি হোক, এটা আমি চাই না।'

যোগেন মাস্টারের ধাতটা চেনা আছে নিখিলেশের। একেবারে বিছানায় শুয়ে না পড়লে পারতপক্ষে পড়ানোয় ফাঁকি দেন না। ফাঁকি শব্দটাকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন। বার বার অনুরোধ করলেও তাঁকে আটকানো যাবে না।

যোগেন মাস্টার এবার বলেছেন, 'আলোচনার কী আছে। যে প্রমিসগুলো করেছেন সেগুলো পালন করতে চেষ্টা করুন। তা হলেই জনমত আপনার ফেভারে চলে আসবে।'

'হ্যাঁ, তাই করতে হবে।'

মনে আছে, যোগেন মাস্টারের সতর্কবাণী তাঁকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলেছিল। লোকটার জিভ ক্ষুরের মতো শানানো হলেও তিনি তাঁর সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী। নইলে পয়সা খরচ এবং সময় নষ্ট করে এতদূর ছুটে আসবেন কেন?

নিখিলেশ স্থির করে ফেলেছিলেন, তালবনির জন্য কাজের কাজ কিছু করতেই হবে। ব্যাপারগুলো আর ফেলে রাখা ঠিক হবে না।

পরের সপ্তাহেই তালবনি গিয়েছিল নিখিলেশ। জনসভা করে জানিয়ে দিয়েছিলেন, যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়ে গেছেন সেগুলো অবশ্যই পালন করা হবে। তবে সরকারি কাজে একটু বেশি সময় লাগে। দেরি হওয়ার জন্য তালবনির অধিবাসীদের কাছে বার বার ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও স্থানীয় মানুষের অসন্তোষ যে কেটে যায়নি সেটা টের পাওয়া যাচ্ছিল। শ্রোতাদের ভেতর থেকে বন্দুকের গুলির মতো কুৎসিত সব মন্তব্য ছুটে আসছিল। এসব বিরোধী পক্ষের চক্রান্ত বলে উড়িয়ে দেবার কারণ নেই। সভায় লোক ঢুকিয়ে এর আগে তাঁকে নাজেহাল করতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু ভিড়ের ভেতর এবার যে রুষ্ট, পরিচিত মুখগুলি তিনি দেখতে পেয়েছেন তারা একসময় তাঁর খুবই অনুগত ছিল। মাত্র ক'টা বছরের মধ্যে সব কেমন যেন বদলে গেছে।

নিখিলেশের মনে পড়ে, তিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। দলের স্থানীয় সংগঠনগুলোর দায়িত্ব যাদের দেওয়া হয়েছিল, সভা শেষ হলে সেই পরিমল এবং সত্যজিতের সঙ্গে আলোচনা করতে বসেছেন নিখিলেশ। স্পষ্টই বোঝা গেছে ওঁরা দু'জনেও খুবই চিন্তিত।

সত্যজিৎ বলেছিলেন, 'আর দেরি করবেন না নিখিলেশদা, নেক্সট ইলেকশান দেখতে দেখতে এসে যাবে। প্রোজেক্টগুলো যেভাবে হোক, যত তাড়াতাড়ি পারেন শুরু করে দিন।'

পরিমল বলেছিলেন, 'শুরুটা হয়ে গেলে লোকে বুঝতে পারবে তাদের মিথ্যে আশ্বাস দেওয়া হয়নি। নিজের চোখেই দেখলেন, জনমত আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। এটা ঠেকাতে না পারলে পরের নির্বাচনে কিন্তু বিপদে পড়তে হবে।'

এসব সতর্কবাণী যোগেন মাস্টার আগেই শুনিয়ে এসেছেন। নিখিলেশ স্থির করে ফেলেছিলেন, এবার কিছু একটা করবেনই।

কিন্তু তালবনি অঞ্চলে যে প্রোজেক্টগুলোর কথা তিনি ঘোষণা করেছেন, দু-একটা বাদ দিলে তার বেশির ভাগই তাঁর ডিপার্টমেন্টের আওতায় পড়ে না। পূর্ত, শিক্ষা, জনকল্যাণ ইত্যাদি বিভাগগুলোর দায়িত্ব অন্য মন্ত্রীদের। কলকাতায় ফিরে এসে নিখিলেশ তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন, অনুরোধ করেছেন জরুরি ভিত্তিতে ওঁরা যেন তালবনির প্রোজেক্টগুলো রূপায়িত করতে সাহায্য করেন।

কিন্তু সহকর্মী এই মন্ত্রীদের ডিপার্টমেন্টগুলো তাদের নিজেদের বিভিন্ন প্রোজেক্ট নিয়ে তখন ভীষণ ব্যস্ত। সেগুলোর জন্য যে বাজেট করা হয়েছে, তার থেকে টাকা বার করে নতুন প্রোজেক্টে হাত দেওয়া সম্ভব নয়। তবে পরের বছরের বাজেটের মধ্যে নিশ্চয়ই তালবনিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে নিখিলেশকে আশ্বাস দেওয়া হল।

এই সময় পল্টুর বিয়ে হয়ে গেল। বি. এসসি পড়ার সময় থেকে সহপাঠিনী কেয়ার সঙ্গে তার প্রেম চলছিল। কেয়া কলকাতার এক পয়সাওলা বনেদি পরিবারের মেয়ে। নিখিলেশ আর অনুপমার সঙ্গে আগেই তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল পল্টু। সেই কেয়াই এবার নিখিলেশদের পুত্রবধূ হয়ে এল।

বিয়েতে খুব একটা ধুমধাম করার পক্ষপাতী ছিলেন না নিখিলেশ। কিন্তু তাঁর কথা

কেউ কানেই তুলল না। এমনকি, অনুপমাও নন। নিজেদের বিয়েটা নেহাতই সাদামাঠা হয়েছিল বলে ছেলের বিয়েতে দারুণ জাঁকজমক করে অতৃপ্ত, গোপন কোনও সাধ তিনি মেটাতে চেয়েছিলেন কিনা, কে জানে। তবে এ ব্যাপারে বিজনেসে পল্টুর যাঁরা গডফাদার সেই মোহনদাস আর প্রভুদয়ালের উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁরা বলেছিলেন, পল্টুর বিয়েটাকে ম্যারেজ অফ দা ইয়ার করে ছাড়বেন।

নিখিলেশের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু প্রভুদয়ালরা বিশাল লন-ওলা একটা বাড়ি ভাড়া করে শামিয়ানা খাটিয়ে, সানাইওলা বসিয়ে, কলকাতার সবচেয়ে দামি কেটারারকে ডাকিয়ে একটা এলাহি কাণ্ড ঘটিয়ে ছেড়েছিলেন।

নিখিলেশের আত্মীয়স্বজন বিশেষ নেই। দূর সম্পর্কের যে দু-চারজন ছিল তাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল যোগাযোগ ছিল না, তাদের ঠিকানাও জানতেন না। কাজেই ওদের নেমন্তন্ন করা যায়নি। তবে পার্টির কিছু ঘনিষ্ঠ লোকজন আর সহকর্মী মন্ত্রীদের আমন্ত্রণ করেছিলেন। অনুপমার নিমন্ত্রিতদের তালিকাটি ছিল তুলনায় অনেক লম্বা। কলেজের কলিগ, গভর্নিং বডির মেম্বার থেকে সল্ট লেকের প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কার্ড দিয়ে এসেছিলেন। এমনকি বহুকাল পর বাপের বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলেন। বাবা-মা তখনও জীবিত। পার্টি-করা, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন, বাউন্ডুলে নিখিলেশের সঙ্গে নিজেদের মেয়ের বিয়েতে তাঁরা যাননি কিন্তু মন্ত্রী নিখিলেশের ছেলের বিয়েতে সপরিবারে এসেছিলেন।

এতকাল পর অনুপমা কেন বাপের বাড়ি ছুটে গিয়েছিলেন? যে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে তার পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনটা হঠাৎ এত জরুরি হয়ে উঠেছিল কেন? অনুপমাকে এ নিয়ে কখনও কোনও প্রশ্ন করেননি নিখিলেশ। তবে এর পেছনে একটা মনস্তাত্ত্বিক কারণ থাকলেও থাকতে পারে। যে চালচুলোহীন, অপদার্থ যুবকটিকে মা, বাবা, দাদারা ঘৃণা করতেন, তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতেন, তিনি যে আজ রাজ্যের বিশিষ্ট একজন মন্ত্রী, হয়তো সেটা দেখানোই ছিল তাঁর সঙ্গোপন উদ্দেশ্য।

সবচেয়ে বেশি অতিথি ছিল পল্টুর। কলকাতার নাম-করা বেশ কিছু বিখ্যাত ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর বিজনেস ম্যাগনেট এয়ার-কন্ডিশনড, ফরেন গাড়িতে চড়ে এসেছিলেন।

নিখিলেশ অবাক হয়ে ভেবেছেন, পল্টুর মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের সাতাশ-আটাশ বছরের একটি যুবক এতগুলো নাম-করা শিল্পপতি আর বিজনেস ম্যাগনেটের সঙ্গে এত অল্প সময়ে কী করে এমন ঘনিষ্ঠতা করে ফেলল? পরে মনে হয়েছে, প্রভুদয়াল আর মোহনদাসের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল।

বিয়েতে ডজন দেড়েক ফ্রিজ, আট-দশটা কালার টিভি আর ওয়াশিং মেশিন পেয়েছিল কেয়া। এ ছাড়া দামি দামি শাড়ি, ক্রকারি, গয়না এবং অন্যান্য জিনিস যে কত পেয়েছে তার হিসেব নেই।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন নিখিলেশ। নিমন্ত্রিত অতিথিরা, বিশেষ করে শিল্পপতি আর বিজনেসম্যানরা সারাক্ষণ তাঁকে ঘিরে তোষামুদি করে গেছে।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের পর সন্তু তার দাদার বিজনেসে ঢুকেছিল। পন্টুই তাকে টেনে নিয়েছিল, অন্য কোথাও চাকরি টাকরি করতে দেয় নি। সন্তুরও একটি প্রেমিকা ছিল —মধুমন্তী। তার সঙ্গে মধুমন্তীরও একদিন বিয়ে হল। মিলির বিয়ে হল তারও কয়েক মাস বাদে। দুই দাদার মতো সেও প্রেম করে বিয়ে করেছে। তার স্বামীর নাম শুভময়। সে দুর্দান্ত ছাত্র, এম বি এ করে একটা কোম্পানিতে টপ একজিকিউটিভ।

সন্তু আর মিলির বিয়েতেও প্রচুর হইচই হয়েছিল। পন্টুর বিয়ের মতোই এই দুটো বিয়েতেও বিরাট সমারোহ। তেমনই সানাই, তেমনই সেরা কেটারার, তেমনই আলোকোজ্জ্বল শামিয়ানার নিচে শিল্পপতি আর ব্যবসায়ীদের ভিড়, একইরকম মহার্ঘ উপহার। এই দুই বিয়েরও উদ্যোক্তা ছিলেন প্রভুদয়াল আর মোহনদাস।

মিলির সঙ্গে বিয়ের পর শুভময় চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। নিজে থেকে ছাড়েনি, পন্টু আর সন্তু তাকে ছাড়িয়ে এনে নিজেদের বিজনেসে পার্টনার করে নিয়েছিল। আসলে তাদের ব্যবসা দ্রুত এতে বেড়ে যাচ্ছিল যে দেখাশোনার জন্য নিজস্ব বিশ্বাসী এবং দক্ষ লোকের দরকার। এমন সব দিক আছে যা কর্মচারীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

মনে আছে, এই সময় তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভাগনী সীমা তার স্বামী প্রবালকে সঙ্গে নিয়ে সল্ট লেকের বাড়িতে এল। ওরা শিলিগুড়িতে থাকত। প্রবাল ওখানকার এক ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে কাজ করত। মাইনে ভাল নয়। দুই ছেলেমেয়ে আর স্বামী-স্ত্রী, মোট চারজনের সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছে। সঞ্চয় বলতে কিচ্ছু নেই। মন্ত্রী মামাবাবুর কাছে তারা কৃপাপ্রার্থী হয়ে এসেছিল। যদি তিনি দয়া করে ভাল চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা করে দেন ওরা বেঁচে যাবে।

সীমাদের কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল নিখিলেশের। প্রবালকে বলেছিলেন, 'সরকারি চাকরি তোমার এই বয়েসে হওয়া সম্ভব নয়। হলেও আমি কিছু করতে পারতাম না। পাবলিক সারভিস কমিশনের পরীক্ষাটরীক্ষা দিয়ে ওসব পেতে হয়। তবে পন্টুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। হয়তো ও কিছু করতে পারে।'

পন্টু সীমাদের ফিরিয়ে দেয়নি। প্রবালকে তাদের বিজনেসে একটা ভাল পোস্টে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

মনে পড়ে, তিন ছেলেমেয়ের বিয়ের খবর ছবিটবি দিয়ে বেশ ফলাও করে খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। পন্টুর বেলায় ততটা না হলেও সন্তু আর মিলির বিয়ের যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তাতে তীক্ষ্ণ খোঁচা ছিল। আদর্শবাদী, সৎ একজন জননেতা, যিনি বঞ্চিত, পিছিয়ে-পড়া মানুষের প্রতিনিধি, তাঁর ছেলেমেয়েদের বিয়েতে এত ধুমধাম হয় কী করে? তাঁকে ঘিরে এখন বিজনেসম্যান আর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের একটা বলয় তৈরি হয়েছে। এঁরা যেসব উপহার দিয়েছেন তার বিস্তারিত তালিকাও কাগজগুলোতে বেরিয়েছিল। এই প্রতিবেদনগুলো ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল নিখিলেশকে।

অস্বস্তি এবং উৎকণ্ঠা বেড়েছিল আরও একটি কারণে। সাদরে নিমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও তিন ছেলেমেয়ের কারও বিয়েতেই আসেননি যোগেন মাস্টার। প্রতিবারই হয় তিনি,

নইলে আরতি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মনে পড়ে, প্রতিটি বিয়ের পর ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি এবং কিছু উপহার পাঠিয়েছেন তিনি।

এই বিয়েগুলোর সঙ্গে যোগেন মাস্টারদের কাকতালীয় অসুস্থতাটা নিখিলেশের মনে কিছুটা সংশয়ের সৃষ্টি যে করেনি তা নয়। ওঁরা কি এইরকম একটা অজুহাত তৈরি করে নিজেদের সরিয়ে রাখতে চেয়েছেন? পরক্ষণে মনে হয়েছে, যোগেন মাস্টারের স্বভাবে মিথ্যাচার ব্যাপারটা নেই। হয়তো সত্যিই ওঁরা অসুস্থ হয়েছিলেন।

মনে আছে, মিলির বিয়ের বেশ কিছুদিন পর ক্ষমা চেয়ে যোগেন মাস্টার যে চিঠিটা লিখেছেন সেটার সঙ্গে তালবনির একটা দৈনিক আর একটা পাক্ষিকের ক'টা কাটিং পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কোনও এক প্রতিবেদক মিলির বিয়ের রিপোর্টটা অত্যন্ত নির্মম ভাষায় লিখেছে। নিখিলেশের মতো একজন আইডিয়ালিস্ট যিনি শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখতেন তাঁর যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন বড় লোকদের সঙ্গ ছাড়া তাঁর একটা মুহূর্তও কাটে না। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেন। তাঁর চিন্তার মধ্যে সাধারণ মানুষেরা আর নেই। এখনও সময় আছে, নিজেকে তিনি শুধরে নিন। আমরা আগের সেই শ্রদ্ধেয়, আদর্শবাদী নিখিলেশকে ফিরে পেতে চাই।

কাটিংগুলো পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, মুখের ওপর চাবুকের ঘা এসে পড়ছে। বুঝতে পারছিলেন, তাঁর এতদিনের উজ্জ্বল ভাবমূর্তিতে কালির ছিটে লাগতে শুরু করেছে। ভেতরে ভেতরে ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। দামি দামি উপহারে বাড়ি বোঝাই। তখন আর কিছু করার ছিল না তাঁর।

প্রথম বার মন্ত্রিত্বের শেষ বছরে নিখিলেশের পারিবারিক এবং রাজনৈতিক জীবনে বেশ বড় ধরনের ক'টা ঘটনা জোরাল ধাক্কা দিয়ে যায়।

একদিন রাতে বাড়ির সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছিল। খাবার টেবলে অনুপমা আর নিখিলেশ তো ছিলেনই। পন্টু, সন্তু, তাদের দুই স্ত্রী কেয়া এবং মধুমন্তীও ছিল।

খেতে খেতে পন্টু বলেছে, 'মা বাবা, তোমাদের সঙ্গে খুব আর্জেন্ট কথা আছে।'

নিখিলেশ, অনুপমা, দু'জনেই বড় ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী রে?'

'তোমরা আমাদের ভুল বুঝবে না তো?'

'কী আশ্চর্য, আগে কথাটা শুনি।'

পন্টু যা বলেছিল তা এইরকম। তাদের ব্যবসা বড় হচ্ছে। এতদিন তারা ইমপোর্ট এক্সপোর্ট, স্টিভেডরি, বড় বড় কোম্পানির ডিলারশিপ থেকে শুরু করে নানা ধরনের বিজনেস করছিল। এবার তারা ফরেন কোলাবরেশনে ইন্ডাস্ট্রিতে হাত দেবে।

ছেলেরা কী ধরনের বিজনেস করে সে সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা ছিল নিখিলেশের। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির কথা আগে শোনেন নি। হতভম্বের মতো জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ইন্ডাস্ট্রি! কিসের ইন্ডাস্ট্রি?'

পন্টু বলেছিল, 'কেমিকেলস, কসমেটিকস, ইলেকট্রনিকস — এইরকম আরও কিছু

কিছু। কারখানার জন্যে কয়েক একর প্রাইভেট ল্যান্ড কেনা হয়েছে। সরকারি কিছু জমিরও দরকার হবে। সে ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাই। তবে সেটা এখন নয়, পরে। সময়মতো তোমাকে জানাব।'

নিখিলেশ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। বলেছেন, 'সরকারের জমি আমি কী করে দেব? তার ওপর তুই আমার ছেলে—'

'এখন ও নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। এবার অন্য একটা কথা শোন —'

পন্টু জানিয়েছিল, সল্ট লেকের এই বাড়িটা খুব ছোট। ইন্ডাস্ট্রি এবং বিজনেস ওয়ার্ল্ডের লোকেরা সবসময় বাড়িতে আসতে চায়। তাদের সঙ্গে এমন অনেক কাজের কথা থাকে যা বাইরে বলা যায় না।

তাছাড়া অনেকে ড্রিংক ট্রিংক করে। নিখিলেশ আবার সুপুরি পর্যন্ত খান না। তেমন কাউকে বাড়িতে আনলে দু পক্ষেরই অস্বস্তি। বিজনেসম্যানরা, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা তাঁর ছেলেমেয়েদের বিয়েতে এসেছেন, তাতেই কাগজে লেখালেখি হয়েছে। নিয়মিত এলে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাবে। খবরের কাগজওলারা প্রায় সব কিছুর ভেতর নোংরা গন্ধ পায়।

নানারকম ভণিতার পর পন্টু শেষ পর্যন্ত জানিয়েছে, ল্যান্সডাউন রোডে একটা নতুন মাল্টি-স্টোরিড বাড়িতে তারা তিনটে সতেরো শ স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট বুক করেছে। একটা তার, বাকি দুটো মিলি আর সন্তুর। এখন মা এবং বাবা অনুমতি দিলে তারা সেখানে চলে যেতে পারে।

ব্যাপারটা এমনই অত্যাশিত যে কী উত্তর দেবেন প্রথমটা ভেবে পাননি নিখিলেশ আর অনুপমা। ছেলেরা ব্যবসা ট্যবসার কথা জানালেও ফ্ল্যাট সম্পর্কে আগে কিছু বলেনি। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর নিখিলেশ বলেছেন, 'তোদের যদি তাতে সুবিধে হয়, নতুন ফ্ল্যাটে যা।'

অনুপমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। ধরা গলায় বলেছিলেন, 'ভেবেছিলাম, বাকি জীবনটা একসঙ্গে কাটিয়ে দেব। তা আর হল না।'

সন্তু বলেছিল, 'আ হা, ল্যান্সডাউন আর কতদূর! রোজই ওখান থেকে কেউ না কেউ আসবে। তোমরাও যাবে। এখানে স্পেসের প্রবলেম হচ্ছে বলেই তো যেতে হচ্ছে।'

পরের মাসেই চলে গিয়েছিল পন্টুরা। এমন একটা সময় ছিল যখন জীবনের অনেকগুলো বছর একা একা তালবনিতে কাটিয়েছেন নিখিলেশ। নির্বাচনে জিতে প্রথম বার এম এল এ হবার পর কলকাতায় এসে স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থাকতে থাকতে পারিবারিক জীবনের মাধুর্য অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। একজন ছন্নছাড়া রাজনৈতিক কর্মীকে ঘিরে অন্তহীন সুখের একটা বৃত্ত তৈরি হচ্ছিল। অনুপমার মতো তাঁরও মনে হয়েছিল, শেষ জীবনটা নিজের সবচেয়ে প্রিয়জনদের মধ্যে কেটে যাবে। কিন্তু তা আর হল না।

পরে নিখিলেশের মনে হয়েছে, এ একরকম ভালই হল। তিনি বাবা হলেও একজন জননেতা। এই আইডেনটিটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দীর্ঘকাল ধরে অসীম পরিশ্রম এবং যত্নে

তিনি সেটা তৈরি করেছেন। পল্টুরা যেভাবে ব্যবসা ট্যবসার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে সেটা তাঁর রাজনৈতিক ইমেজের ক্ষতি করতে শুরু করেছিল।

ছেলেরা চলে যাবার পর তালবনি থেকে খবর এল সেখানকার হাল ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। অনেকগুলো কারখানায় বেশ কিছুদিন ধরে অশান্তি চলছিল। মালিকপক্ষ প্রথমে সাসপেনসন অফ ওয়ার্কের অর্ডার দিয়ে পরে লক-আউট করে দেয়। শ্রমিকরা ফ্যাক্টরিগুলোর সামনে তেরপল খাটিয়ে তার তলায় দিনরাত অবস্থান করতে থাকে। সমস্যা অত্যন্ত ঘোরালো হয়ে ওঠায় তালবনি থেকে পরিমল আর সত্যজিৎ কলকাতায় ছুটে এসেছিলেন।

শ্রম দপ্তরটা নিখিলেশের হাতে নেই। তালবনি যেহেতু তাঁর কনস্টিটিউয়েন্সি এবং সেখানকার এতগুলো মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়েছে, তাই শ্রমমন্ত্রীকে অনুরোধ করে কারখানাগুলোর মালিকদের ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলেন। মালিকেরা সবাই আসেননি। যে ক'জন এসেছিলেন তাঁরা জানিয়েছেন, ফ্যাক্টরির অবস্থা ভাল নয়, তিন চার বছর ধরে লোকসানে চলছে। তার ওপর শ্রমিকদের অসহযোগিতা, গো-স্লো, কথায় কথায় স্ট্রাইক এবং অযৌক্তিক দাবির জন্য তাঁদের পক্ষে কারখানা আর খোলা সম্ভব নয়। শ্রমিক প্রতিনিধিদেরও ডাকা হয়েছিল। তাঁরা বলেছেন, তাঁদের একটি দাবিও অসঙ্গত নয়। দু'বছর ধরে ইনক্রিমেন্ট বন্ধ, বোনাস নামমাত্র দেওয়া হয়। মালিকপক্ষের কাছে বহু আবেদন-নিবেদন করেও কোনও ফল হয়নি। অগত্যা শেষ অস্ত্র হিসেবে আন্দোলনের পথে যেতে হয়েছে।

যে মালিকেরা আসেননি তাঁরা শ্রম দপ্তরে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তালবনির বন্ধ কারখানা খোলা হবে না। এই নিয়ে একটানা অনেকদিন গোলমাল চলেছিল।

মনে আছে, তালবনির পক্ষে এটা ছিল দারুণ এক দুঃসময়। বেশ কিছুকাল ধরেই ওখানে অ্যান্টি-সোসালরা ঘাঁটি গাড়ছিল। হঠাৎ ক্রাইমটা বেড়ে যেতে থাকে—চুরি, ছেনতাই, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, রেলের ওয়াগন ভেঙে মাল লোপাট, বোমাবাজি, এমনকি মার্ডারও। তালবনিতে নতন কাজেব সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। ফলে বছর বছর বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। আর বেকার যত বাড়ে, তাব সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে ক্রাইম রেটও। এটাই স্বাভাবিক ঘটনা।

এর ভেতর নতুন নির্বাচন এসে গেল। পার্টি এবারও নিখিলেশকে টিকেট দিল। মনে পড়ে, তাঁর নিজের মধ্যে বেশ অস্বস্তি ছিল, ছিল কিছুটা অপরাধবোধ। দশ, দশটা বছর তিনি তালবনির প্রতিনিধিত্ব কবছেন কিন্তু অঞ্চলের বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি। আগের বার নির্বাচনী প্রচারেব সঙ্গে স্লোগান ছিল, এলাকার সার্বিক উন্নয়ন। এবার তিনি ভোটারদের সামনে দাঁড়িয়ে কী বলবেন?

নিজের দ্বিধার কথা জানিয়ে নিখিলেশ পার্টি নেতৃত্বকে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁকে এবার যেন অব্যাহতি দেওয়া হয়। নেতারা রাজি হননি। নিখিলেশের ব্যক্তিগত সততায় তাঁদের আস্থা ছিল। তাঁর চেয়ে যোগ্য প্রার্থী তালবনি অঞ্চলে আর দ্বিতীয়টি নেই।

নেতাদের তিনি বলেছেন, উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি বলে মানুষ রুষ্ট হয়ে আছে। এই অবস্থায় জনসমর্থন পেতে অসুবিধে হবে। তাঁর আশঙ্কা যে অমূলক নয়, নেতারা তা বুঝেছেন। বলেছেন, ত্রুটি যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এবারের নির্বাচনের পর তালবনির উন্নতিকে টপমোস্ট প্রায়োরিটি দিলেই চলবে। তা ছাড়া পুরনো বন্ধ কারখানাগুলোর যে ক'টা সম্ভব খুলে দিতে হবে। নতুন কিছু ইন্ডাস্ট্রিও ওখানে করতে হবে। ভাল রাস্তাঘাট, বাজার, স্কুল, কলেজ-হাসপাতাল, কারখানা, এসব তৈরি হলে মানুষের অসন্তোষ থাকবে না। পুরনো ক্ষোভ তারা ভুলে যাবে।

অন্য দু'বারের মতো এবারও সেই একই পদ্ধতিতে নির্বাচনী প্রচার চলতে লাগল। সেই জনসভা, মিছিল, স্লোগান, পোস্টার, বাড়ি বাড়ি ঘুরে জনসংযোগ। তবে আগের তুলনায় মাত্রাটা অনেক গুণ বেশি।

পার্টির কর্মীরা তো ছিলই। কলকাতা থেকে দুই ছেলে, মেয়ে, ভাগনী এবং ভাগনী-জামাইও মাঝে মাঝে এসে দেখে গেছে। শুধু তাই না, গণ্ডা গণ্ডা জিপ, প্রাইভেট কারও পাঠিয়ে দিয়েছে। ওগুলো প্রচারের কাজে লাগানো হবে।

এসব সত্ত্বেও স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, হাল খুব খারাপ। আগের নির্বাচনেও নিখিলেশ সম্পর্কে মানুষের যেটুকু উৎসাহ ছিল, এখন তার আধাআধিও নেই। জনসভাগুলোতে ভিড় অনেক কমে গেছে। যারা বক্তৃতা শুনতে আসে তাদের বেশির ভাগই মিটিং চলার সময় হল্লা তো বাধায়ই, এমন সব মন্তব্য করে যা শুনলে কান গরম হয়ে ওঠে। হাতজোড় করে বাড়ি বাড়ি যখন যান, মুখের ওপর কেউ দরজা বন্ধ করে দেয় না ঠিকই, তবে খুব নিস্পৃহ, ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকে।

নির্বাচনের মাসখানেক আগে তালবনির ছবিটা ক্রমশ পরিষ্কার হতে লাগল। এবার জেতার আশা আগের বারের তুলনায় অর্ধেক বলা যায়।

দলের কর্মীরা একদিন খবর দিল, নিখিলেশের প্রতিদ্বন্দ্বী নিবারণ হালদার এবারকার ইলেকশানে আর মিটিং মিছিলের ওপর নির্ভর করে থাকছেন না। তিনি অ্যান্টি-সোসালদের কাজে লাগাবেন।

বিমূঢ়ের মতো নিখিলেশ জিজ্ঞেস করেছেন, 'কিভাবে?'

'যেসব বুথে আমাদের বেশি ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা সেখানে ওরা জ্যাম করে দেবে। যাতে মানুষ ভোট দিতে না বেরোয় তার ব্যবস্থা করবে।'

'তাহলে?'

'আমাদেরও পালটা ব্যবস্থা করা দরকার।'

সত্যজিৎ এবং পরিমলেরও সেই একই মত। ক্ষমতা ধরে রাখতে হলে জিততেই হবে, জয়ের পদ্ধতিটা যেরকমই হোক না।

নিখিলেশ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। নির্বাচনটা যে এক ধরনের যুদ্ধ তা তিনি এতদিনে জেনে গেছেন। কিন্তু রাজনীতিতে অ্যান্টি-সোসালদের টেনে আনতে তাঁর মন সায় দেয়নি। তাঁর ধারণা এতে তাৎক্ষণিক কিছু লাভ হলেও তার ফল ভাল হবে না।

কিন্তু এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ছিল সন্তু, পন্টু আর ভাগনী-জামাই

প্রবালের। তাদের কেউ না কেউ এইসময়টা প্রায় রোজই তালবনি আসত। তারা সরাসরি প্রচারের কাজে কখনও নামেনি। তবে পেছন থেকে যে অনেক ছক কষছে, চারিদিকে ছোটাছুটি করে নানা লোকের সঙ্গে গোপনে যোগযোগ রাখছে তা টের পাওয়া যাচ্ছিল। নিখিলেশের জেতার ওপর তাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ যেন নির্ভর করছে।

মনে পড়ে, এই সময় অনুপমাও খুব সম্ভব দু-একদিন এসেছিলেন। নিখিলেশ পন্টুদের কথা তাঁকে জানিয়েছেন। অনুপমা বলেছেন 'ছেলেমেয়েরা যা করছে তাতে যদি তুমি জিতে যাও সে তো আমাদের সবার পক্ষেই ভাল।'

যে অনুপমা একদিন সৎ, আদর্শবাদী একটি যুবকের জন্য বিপুল ঐশ্বর্য, অঢেল আরাম ছেড়ে মা-বাবার কাছ থেকে চলে এসেছিলেন, জীবনের দীর্ঘ অনেকগুলো বছর এককভাবে লড়াই করে গেছেন, কত কষ্ট সহ্য করেছেন, তিনি যে এমনটা বলতে পারেন ভাবা যায়নি। আমাদের বলতে শুধু পন্টুরাই নয়, তিনি নিজেও আছেন তার মধ্যে। একজন মন্ত্রীর স্ত্রী হিসেবে তাঁর সামাজিক মর্যাদা বহু গুণ বেড়ে গেছে। নিখিলেশ হেরে গেলে সেই স্টেটাসটা আর থাকবে না। জীবনের লম্বা ম্যারাথন দৌড় শেষ করার মুখে এসে সেটা ধরে রাখার জন্যই কি নিখিলেশের যে কোনওভাবে জেতাটা তাঁর কাছে ভীষণ জরুরি?

কয়েক দিনের মধ্যে দেখা গিয়েছিল, তালবনির ক'টা মার্কামারা মস্তান তাঁর হয়ে হইহই করে প্রচারের কাজে নেমে পড়েছে। এরা হল লেলো, পন্টা, তারক, গাল-কাটা সেলিম, বুটাই এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা। ওদের কাজ ছিল দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার সাঁটা আর মিছিলে স্লোগান দেওয়া। ওদিকে নিবারণ হালদারও আর একদল দাগী ক্রিমিনালকে নামিয়ে দিয়েছিলেন।

এই সময় একদিন বিকেলে প্রচারের কাজ সারার পর পার্টি অফিসে এসে ক্লান্তভাবে নিখিলেশ একটা তক্তাপোযে আধময়লা তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে ছিলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষমতা অনেক কমে গেছে। খানিকটা হাঁটাহাঁটি করলে কিংবা একটানা কিছুক্ষণ বক্তৃতা করলে হাঁপিয়ে পড়তেন। সেদিন ক্লান্তিতে তাঁর দু'চোখ বুজে আসছিল। হঠাৎ 'তালবনি সমাচার'-এর সম্পাদক অরিজিৎ মাইতি এসে হাজির। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় সবে পা রেখেছে। পাতলা, মেদহীন শরীর, লম্বাটে তরতরে মুখ, পুরু লেন্সের চশমার ওধারে উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, চওড়া কপাল, কাঁধ পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল। পরনে ঢোলা পাজামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবি, কাঁধ থেকে রঙিন কাপড়ের শ্রীনিকেতনী ঢাউস ব্যাগ ঝুলছে। অরিজিতের সমস্ত চেহারার মধ্যে দারুণ একটা ধারাল ব্যাপার আছে।

পনের যোল বছর আগে 'তালবনি সমাচার' প্রথম বেরিয়েছিল। তখন অরিজিৎ ছিল জুনিয়র একজন রিপোর্টার। সাংবাদিক হিসেবে গোড়া থেকেই সে দুর্দান্ত, বেপরোয়া এবং দুঃসাহসী। দিনরাত খবরের খোঁজে চারিদিক তোলপাড় করে বেড়াত। ওর ক'টা অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদন তালবনিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তার ফল হয়েছিল এই, দু'বছরের ভেতর প্রোমোশন পেয়ে সে হয়েছিল স্পেশাল করেসপনডেন্ট। তারপরের

উত্থানটা আরও চমকপ্রদ। তিরিশ পেরুবার আগেই অরিজিৎ ডেপুটি এডিটর, এবং পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে প্রধান সম্পাদক।

পত্রিকা প্রকাশের পর থেকে, অর্থাৎ পনের ষোল বছর ধরে অরিজিতের সঙ্গে নিখিলেশের চমৎকার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। নিখিলেশের প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা। নিখিলেশও অরিজিৎকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। অরিজিতের লেখায় যে শাণিত রাজনৈতিক বিশ্লেষণ থাকে সেগুলো সম্বন্ধে তাঁর খুবই উঁচু ধারণা।

কিন্তু সেবার পার্টি অফিসে এসে খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে অরিজিৎ বলেছিল, 'এ আপনি কী করলেন নিখিলেশদা!'

চমকে সোজা হয়ে উঠে বসেছিলেন নিখিলেশ। বলেছিলেন, 'কী করেছি?'

উত্তর না দিয়ে অরিজিৎ জিজ্ঞেস করেছে, 'আত্মবিশ্বাসটা কি একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে আপনার?'

'তার মানে?'

'এক সময়কার ডেডিকেটেড, রেসপেক্টেড, সেলফ-কনফিডেন্সে ভরপুর একজন রাজনৈতিক নেতাকে ইলেকশানের বৈতরণী পেরুবার জন্য শেষ পর্যন্ত ক্রিমিনালদের শরণাপন্ন হতে হল? আপনার এমন অধঃপতন হবে ভাবতেও পারি নি।'

একদিক থেকে যোগেন মাস্টারের সঙ্গে অরিজিতের দারুণ মিল রয়েছে। দু'জনেই অত্যন্ত স্পষ্টভাষী। যতই অপ্রিয় হোক, যেটা তারা নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধিমতো উচিত মনে করে, রূঢ়ভাবে তা মুখের ওপর বলে দিতে পারে। অরিজিতের ধিক্কারটা নিখিলেশকে আমূল ঝাঁকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। তিনি হতবুদ্ধির মতো তাকিয়ে থেকেছেন।

অরিজিৎ থামে নি, 'দুঃখটা কোথায় জানেন নিখিলেশদা, ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিকসটা আপনার মতো একজন মানুষের হাত দিয়ে হল!'

অসহায়ভাবে নিখিলেশ বলেছেন, 'আমার কথাটা একটু বুঝতে চেষ্টা কর অরিজিৎ। কতটা নিরুপায় হলে—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে অরিজিৎ বলেছেন, 'যে যত খারাপ কাজই করুক, নিজের মতো করে তার একটা লজিক দাঁড় করায়। আমি পাঁচ বছরের বাচ্চা নই নিখিলেশদা। তারক, পন্টারা ক্রিমিনালই। তাদের গায়ে রাজনৈতিক তকমা এঁটে দিলেও তারা ক্রিমিনালই থেকে যাবে। ইলেকশানে যদি হেরেও যান, এদের সাহায্য নেওয়া কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না।'

নিখিলেশ বিপন্ন মুখে বলেছিলেন, 'নিবারণ হালদারদের দেখাদেখি বাধ্য হয়ে আমাদের ওটা —'

হাততালি দিতে দিতে তীব্র শ্লেষে ঠোঁট দুটো বেঁকে গিয়েছিল অরিজিতের। সে বলেছে, 'একসেলেন্ট। এই না হলে গ্রাসরুট লেভেলের নেতা! নিবারণ হালদাররা ভোটের জন্য যদি আরও নিচে নামে, আপনিও তাই করবেন?'

কিছুই বলার ছিল না নিখিলেশের। তিনি চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন।

অরিজিৎ বলেছিল, 'আমি কিন্তু আপনাকে ছাড়ব না। যখন আপনি ভাল কাজ

করেছেন, লিখেছি। এবার ক্রিমিনালদের ওপর ভর করে যে নির্বাচনে জিততে চাইছেন, সেটাও লিখব। পাঠকের কাছে আমরা দায়বদ্ধ। তাদের সামনে সত্যিকারের চিত্রটা তুলে ধরা দরকার।'

নিখিলেশ জবাব দেন নি, বা দিতে পারেন নি।

পরদিনই চাঁছাছোলা ভাষায় নিখিলেশের বিরুদ্ধে তিন কলম জুড়ে লিখেছিল অরিজিৎ। তালবনিতে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন যে শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে দিয়েছিল।

সেবারের নির্বাচনী প্রস্তুতির সময় নিখিলেশ যে তালবনিতে এসে ছিলেন, তার মধ্যে দু-তিন দিনের বেশি যোগেন মাস্টারের সঙ্গে দেখা হয় নি তাঁর। যেটুকু দেখা হয়েছে তাতে খুবই অস্বস্তি বোধ করতেন তিনি। যোগেন মাস্টার বিশেষ কথা বলতেন না। শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন।

ক্রিমিনালরা প্রচারে নামার পর যোগেন মাস্টার একদিন নিখিলেশের কাছে এসে হাজির। অবিকল অরিজিতের মতো বলেছেন, 'আপনার কাছে এটা আশা করি নি। এর পরিণতি কী হবে, চিন্তা করে দেখবেন।'

কী উত্তর দেবেন, নিখিলেশ ভেবে পান নি। তিনি চুপ করে ছিলেন। আর একটি কথাও না বলে নিঃশব্দে চলে গিয়েছিলেন যোগেন মাস্টার।

মনে পড়ে, তালবনির নির্বাচনে সেবারই প্রথম প্রচুর বোমাবাজি এবং মারদাঙ্গা হয়েছিল।

নিখিলেশ জিতেছিলেন ঠিকই, তবে জয়ের মার্জিন অনেক কমে গিয়েছিল। নিবারণ হালদারের চেয়ে মাত্র চার হাজার দুশ' ভোট বেশি পেয়েছেন। জনসমর্থনের ভিত যে কতটা ধসে পড়েছে, নির্বাচনের সেবারকার রেজাল্ট তাঁর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল।

রেজাল্ট বেরুবার পর যথারীতি তাঁকে নিয়ে বিজয় মিছিল বেরিয়েছে। দলের কর্মী আর সমর্থকদের মাতামাতি, আবীর মাখামাখি চলেছিল অনেক রাত পর্যন্ত।

সেই রাতটা তালবনিতে কাটিয়ে নিখিলেশ পরদিন সকালে যখন কলকাতায় ফেরার তোড়জোড় করছেন, তারকরা এসে হাজির। তারা তাঁকে প্রণাম করে যা বলেছে, সংক্ষেপে এইরকম। জান বাজি রেখে ওরা স্যারকে, অর্থাৎ নিখিলেশকে জিতিয়ে দিয়েছে। এটা তাদের ডিউটি। যতদিন ওদের গায়ে একফোঁটা রক্ত থাকবে স্যারের জন্য লড়ে যাবে। তালবনিতে থেকে অন্য কোনও ক্যান্ডিডেটকে জিততে হবে না। নিখিলেশের জন্য এই যে তারা জীবন উৎসর্গ করেছে সেই কারণে নগদ নগদ কিছু চাইছে না। তবে পুলিশ প্রায়ই তাদের ওপর হামলা চালায়, টেনে হেঁচড়ে থানায় নিয়ে যায়। ভবিষ্যতে সেটা যাতে না হয়, স্যার যেন দয়া করে তা দেখেন। তাঁর কাছে ওরা আশ্রয় নিয়েছে। তারকরা বার বার মনে করিয়ে দিয়েছিল, স্যারের বিপদে আপদে ওরা যেমন তাঁর পাশে থাকবে, তিনিও যেন ঝামেলা হলে তাদের রক্ষা করেন। তারকদের বক্তব্যে এতটুকু মারপ্যাঁচ নেই। পরিষ্কার 'গিভ অ্যান্ড টেক'। অর্থাৎ আমাদের জন্য তুমি কিছু কর, আমরাও

তোমার জন্য কিছু করব। ওদের কথা শুনতে শুনতে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন নিখিলেশ। তারকরা কি এরপর খুনখারাপি ডাকাতি রাহাজানি করে তাঁর নাম করে পার পেয়ে যেতে চাইছে?

নিখিলেশকে চুপচাপ দেখে তারকরা হয়তো ভেবেছিল, ওদের কথায় তাঁর সায় আছে। দারুণ খুশিতে আরেক বার প্রণাম করে তারা চলে গিয়েছিল।

আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন নিখিলেশ।

সেবারও তাঁকে মন্ত্রী করা হয়েছে এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ পোর্টফোলিও-ও তিনি পেয়েছেন।

তালবনির উন্নয়নের ব্যাপারটা সেবার গোড়া থেকেই নিখিলেশের মাথায় ছিল। প্রোজেক্ট কি সেখানে দু-একটা? স্কুল, ব্রিজ, মেয়েদের কলেজ—এসব তো আছেই। তার ওপর বন্ধ কল-কারখানাগুলো যেভাবেই হোক খুলে দিতে হবে।

মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবার পর নিখিলেশ আন্তরিকভাবেই তালবনির প্রোজেক্ট নিয়ে এবার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছিলেন। এই সময় হঠাৎ খবরের কাগজগুলোতে পল্টুদের নিয়ে চাঞ্চল্যকর সব খবর বেরুতে থাকে। তারা ব্যাঙ্ক এবং অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ব্যবসা এবং কল-কারখানা বসানোর জন্য তাঁর নাম কাজে লাগিয়ে কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। ব্যাঙ্ক ট্যাঙ্কের টাকা হল জনগণের টাকা। বেশ ক'বছর কেটে গেলেও সেই অর্থের ভগ্নাংশও শোধ করেনি। দু-একটা কাগজ এমন ইঙ্গিতও দিয়েছে, নিখিলেশ গোপনে প্রভাব না খাটালে এই বিপুল অঙ্কের টাকা কোনওভাবেই পল্টুদের পক্ষে বার করা সম্ভব হ'ত না।

দিশেহারা নিখিলেশ ছেলেদের ডেকে পাঠিয়ে খবরের কাগজের প্রতিবেদনগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, 'এসব কী? সত্যিই তোরা এত টাকা নিয়েছিস?'

পল্টু বলেছে, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমার নামটা এর মধ্যে জড়ানো হচ্ছে কেন?'

'যেহেতু আমরা তোমার ছেলে সেজন্যে তোমার পলিটিক্যাল শত্রুরা সুযোগ নিচ্ছে। কাগজগুলোকে তারাই তাতাচ্ছে। স্ক্যান্ডাল রটিয়ে তোমার ক্যারেক্টার অ্যাসঅ্যাসিনেট করতে চাইছে।'

সরাসরি ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে নিখিলেশ জিজ্ঞেস করেছেন, 'লোনের টাকা কি ফেরত দিয়েছিস?'

বেশ অস্বস্তি বোধ করেছে পল্টু। বলেছে, 'না। এখনও দেওয়া হয়নি।'

'এটা পাবলিক মানি। নয়ছয় করার অধিকার তোদের কেউ দেয়নি।'

'নয়ছয় কে বলল? আমরা ইন্ডাস্ট্রি করেছি, বিজনেসে লাগিয়েছি। বহু লোকের এতে এমপ্লয়মেন্ট হয়েছে। তাছাড়া আমরা টাকাগুলো এমনি এমনি নিইনি। রীতিমতো ইন্টারেস্ট দেব।'

'আমি জানতে চাই, টাকা কবে ফেরত দিচ্ছিস?'

নিখিলেশের সঙ্গে তর্ক করতে আর সাহস হয়নি পন্টুর। সে বলেছে, 'দেখি, যত তাড়াতাড়ি পারি—'

পন্টু চলে যাবার পর অনুপমা বলেছিলেন, 'পন্টুকে এত কড়া কথা না বললেই পারতে।'

নিখিলেশ বলেছেন, 'কেন বলেছি, বুঝতে পারছ না? ওরা আমাকে কোথায় নামিয়ে এনেছে, চিন্তা করে দেখ তো—'

'তুমি ভেবো না, টাকা ওরা ঠিক শোধ করে দেবে—'

স্ক্যান্ডালটা কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেনি। দু-তিনটে কাগজ তাঁর বিরুদ্ধে যেন কোমর বেঁধে নেমে পড়েছিল। শুধু লোনের ব্যাপারই নয়, পন্টুরা কোথায় কী অ্যাসেট করেছে, বেআইনিভাবে কতটা সরকারি আর বেসরকারি সুযোগ সুবিধা কাজে লাগিয়েছে, ব্যবসার ব্যাপারে বিদেশি মুদ্রার আইনভঙ্গ করেছে, তার বিবরণ বেরুতে লাগল। প্রতিটি প্রতিবেদনেই খোঁচা থাকত, নিখিলেশের মদত ছাড়া এসব সম্ভব নয়।

প্রতিবেদনগুলো কতটা সত্যি, কতটা অন্যের উসকানিতে লেখা বুঝতে পারছিলেন না নিখিলেশ। এই সময়টা উদ্‌ভ্রান্তের মতো হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। খেতে পারতেন না, ঘুমোতে পারতেন না, কারও সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগত না। সারারাত পায়চারি করে বেড়াতেন। ঘুণপোকার মতো অদৃশ্য কোনও কীট সর্বক্ষণ তাঁর অস্থিমজ্জা কুরে কুরে যেন বিষ ঢেলে দিত।

যতই সৎ, নির্বিরোধ আর আদর্শবাদী হ'ন না, নিখিলেশ অজাতশত্রু নন। তাঁর জনপ্রিয়তা সহকর্মীদের মধ্যে কয়েকজনকে যথেষ্ট ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল। প্রকাশ্যে তারা কখনও খারাপ কোনও মন্তব্য করে নি। বরং এমন ভাব করত যেন কতই না বিনীত আর বশংবদ। কিন্তু গোপনে শত্রুতা চালিয়ে যেত। নিখিলেশের দৃঢ় বিশ্বাস, এদের ভেতর কেউ কেউ খবরের কাগজগুলোকে তাঁর বিরুদ্ধে ছেলেমেয়েদের জড়িয়ে স্ক্যান্ডাল রটাবার জন্য তাতিয়ে দিয়েছিল। এমনকি কোন কোন ব্যাঙ্ক থেকে পন্টুরা কবে কী পরিমাণ টাকা লোন নিয়েছে, তাঁর নাম করে নানা সরকারি সুযোগ সুবিধা আদায় করেছে, এ সবের যাবতীয় তথ্য তারাই সাংবাদিকদের যোগান দিচ্ছে।

এই ছদ্মবেশী বন্ধুদের একজন তাঁকে বলেছিল, 'এত ভেঙে পড়বেন না নিখিলেশদা। খবরের কাগজে কত কিছুই লেখা হয়। ও সব গ্রাহ্য করলে কি চলে?'

নিখিলেশ মুহ্যমানের মতো বলেছেন, 'তোমরা সকলেই তো জানো, কোনওরকম প্রত্যাশা নিয়ে আমি রাজনীতি করতে আসি নি। অর্থের লোভ আমার নেই। কিন্তু শেষ বয়েসে ছেলেমেয়েদের জন্য গায়ে কালি লেগে গেল!'

'টাকাপয়সা তো আর আপনি ছোঁন নি। আমরা জানি এ ব্যাপারে আপনার বিবেক পরিষ্কার।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

বন্ধুটি বলেছিলেন, 'তা হলে আর কি। এত ভাবনার কিছু নেই। আপনি নিজের কাজ করে যান। কাগজের রিপোর্টগুলো বেরুবার পর থেকে আপনাকে ভীষণ কাহিল

দেখাচ্ছে। শরীরের যত্ন নিন। আর একটা কথা —'

উৎসুক সুরে নিখিলেশ জিজ্ঞেস করেছেন, 'কী কথা?'

'বাবার কাছে ছেলেমেয়েদের এক্সপেক্টেশন তো থাকেই। তারা যদি কিছু করেই ফেলে তা নিয়ে অত মাথা ঘামাতে নেই। মানসিক শান্তি নষ্ট করে কী লাভ?'

নবগোপাল সরকার ছিলেন নিখিলেশের আর একজন সহকর্মী। তিনিও দু'বার মন্ত্রী হয়েছিলেন। প্রথম বার মন্ত্রী হবার পর থেকেই স্ক্যান্ডালটা তাঁর নামের সঙ্গে স্থায়ীভাবে জুড়ে গিয়েছিল।

নবগোপাল নিঃসন্তান কিন্তু তাঁর একটি বাপ-মা মরা ভাইপো ছিল যাকে ছেলেবেলা থেকে তিনি মানুষ করেছেন। সে একজন কনট্রাক্টর। জনরব, এই ভাইপোটিকে তিনি বৈধ এবং অবৈধ সব পদ্ধতিতেই সরকারি অনুগ্রহ পাইয়ে দিয়েছেন। শুধু সরকারিই না, শোনা যায়, বড় বড় প্রাইভেট আর মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিকে গোপনে নির্দেশ দিয়ে কোটি কোটি টাকার কনট্রাক্ট পেতে সাহায্য করেছেন।

নিখিলেশকে মুষড়ে পড়তে দেখে সেই ছদ্মবেশী বন্ধুটির মতো নবগোপাল বলেছিলেন, 'নিখিলেশদা, খবরের কাগজে কে কী লিখল, না লিখল, সে সব ভেবে বিচলিত হবার মানে হয় না। এই দেখুন না, ক'বছর ধরে আমার নামে কত কী বেরুচ্ছে। সে জন্য কখনও আমাকে ঘাবড়াতে দেখেছেন?'

অস্বীকার করার উপায় নেই, নবগোপালের স্নায়ুমণ্ডলী স্টিল দিয়ে তৈরি। তিনি বরাবরই বেপরোয়া ধরনের। কুৎসা বা স্তুতি কোনওটাই বড় একটা তোয়াক্কা করেন না।

নিখিলেশ ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে জানিয়েছেন — নবগোপালকে ঘাবড়াতে দেখেন নি।

নবগোপাল এবার বলেছেন, 'শুনুন দাদা, সেক্স আর পলিটিক্যাল কেচ্ছা ছাড়া খবরের কাগজ চলে না। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই পাঠক চায় চটচটে কেলেঙ্কারির সব গপ্পো। সার্ভে করে দেখবেন ভ্যাদভেদে খবর ফাইভ পারসেন্ট রিডারও পড়ে না।' একটু থেমে ষড়যন্ত্রকারীর মতো ফিস ফিস করে বলেছেন, 'আপনি যে ফেমাস, পপুলার, তার প্রমাণ হল স্ক্যান্ডাল। মানুষ বিখ্যাত লোকেদের স্ক্যান্ডাল সম্বন্ধেই বেশি আগ্রহী। হারু মণ্ডল কি রহিম শেখ কী করল, সে সম্বন্ধে কারও ইন্টারেস্ট নেই।'

নিখিলেশ উত্তর দেন নি।

নবগোপাল এবার বলেছেন, 'পোকা গায়ে বসলে যেমন টোকা দিয়ে ফেলে দেন, খবরের কাগজের কেচ্ছাগুলো তেমনি মাথা থেকে বার করে দিন।'

ছদ্মবেশী সেই বন্ধু বা নবগোপাল যে পরামর্শই দিন, কাগজের রিপোর্টগুলোর ধাক্কাটা শেষ পর্যন্ত সামলে ওঠা সম্ভব হয়নি। প্রচণ্ড রকমের হার্ট অ্যাটাকে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন নিখিলেশ। নার্সিংহোম এবং বাড়ি, তারপর আবার নার্সিংহোম—এইভাবে বছর দেড়েক কেটে গিয়েছিল। খানিকটা সামলে ওঠার পর যখন নতুন করে কাজকর্ম শুরু করবেন, তখন আবার হার্ট অ্যাটাক। তবে এটা আগের মতো অতটা মারাত্মক নয়। দ্বিতীয় অ্যাটাকটা হবার পর ডাক্তাররা সতর্ক করে দিয়েছিলেন, শারীরিক, মানসিক এবং

মস্তিষ্কের পরিশ্রম কমিয়ে ফেলতে হবে। বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকা বন্ধ। বাধানিষেধ আরও বহুরকম। ঘি-মাখন এবং অতিরিক্ত তেলমশলা বাদ। হালকা খাবার খেতে হবে। কাজ যতই জরুরি হোক, অন্তত বছরখানেক বেশি ছোটাছুটি করা চলবে না। তাছাড়া হার্টকে সতেজ রাখার জন্য নিয়মিত প্রতিদিন ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। সেই সঙ্গে সামান্য হাঁটাহাঁটি এবং হালকা কিছু ব্যায়াম।

ডাক্তাররা নিখিলেশের জীবনটাকে নানাদিক থেকে কাটছাঁট করে প্রায় বাড়ির ভেতর আটকে ফেলেছিলেন। ওঁরা আরও বলেছিলেন, অনিয়ম করলে হার্টের ওপর চাপ পড়ে। আবার যদি একটা অ্যাটাক হয় তাঁকে বাঁচানো যাবে না। অতএব দ্বিতীয় বার মন্ত্রিত্বের প্রথম আড়াই তিনটে বছর কিছুই করতে পারেননি নিখিলেশ। মোটামুটি সুস্থ হবার পর নিজের দপ্তরে রোজ কয়েক ঘন্টার জন্য একবার করে যাওয়া ছাড়া একরকম হাত-পা গুটিয়েই বসে থাকতে হয়েছে। তেমন কোনও আর্জেন্ট কাজ থাকলে ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি বা অন্যান্য অফিসাররা বাড়িতে এসে তাঁর মতামত জেনে যেতেন।

এই আড়াই বছরে তালবনিতে একবারও যেতে পারেননি নিখিলেশ। যে প্রোজেক্টগুলো নিয়ে তোড়জোড় শুরু করেছিলেন সেগুলো উদ্যোগের অভাবে ফাইলের ভেতর চাপা পড়ে গেছে।

তাঁর নির্বাচন কেন্দ্র, যেখানে জীবনের সেরা বছরগুলো কাটিয়ে এসেছেন ক্রমশ নিখিলেশের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। তালবনি থেকে প্রায়ই খবর আসছিল, তারক পল্টা, গাল-কাটা সেলিম ইত্যাদি যে ক্রিমিনালরা নির্বাচনে তাঁকে জেতাবার জন্য জান দিয়ে খেটেছিল তারা নাকি এখন সেখানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। অপরাধের সংখ্যা ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী। আগে ওয়াগন ভাঙা, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, ছেনতাই, বোমাবাজি, দু-চারটে খুন, এ জাতীয় ঘটনা প্রায়ই ঘটত। কিন্তু মেয়েরা ছিল নিরাপদ। এখন ক্রিমিনালরা তাদের দিকেও হাত বাড়িয়েছে। পুলিশ ধরতে গেলে তারকরা নাকি জানায়, তারা মন্ত্রীর লোক। পুলিশের পক্ষে তাদের শায়েস্তা করতে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। তালবনির মানুষ এই কারণে নিখিলেশের ওপর খেপে গেছে।

বিচলিত নিখিলেশ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। স্থির করেছিলেন, তালবনি যাবেন এবং সেখানকার থানাকে নির্দেশ দেবেন, অবিলম্বে তারকদের যেন লক-আপে পুরে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু অনুপমা আর ডাক্তাররা তাঁকে যেতে দেননি। উত্তেজনা তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক রকমের ক্ষতিকর।

তালবনিতে যেতে না পারলেও পরিমল এবং সত্যজিৎকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন নিখিলেশ। বলেছিলেন, তারকদের বাড়াবাড়ি বন্ধ করতেই হবে। পুলিশকে জানানো হোক, তাদের ভয় বা দ্বিধার কারণ নেই। নিখিলেশ কোনওভাবেই এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না।

সত্যজিৎ বলেছিলেন, এখনই এতটা কঠোর হওয়া ঠিক হবে না। আর দু-আড়াই বছরের মধ্যে পরের নির্বাচন আসছে। ইলেকশানের স্টাইলটা আর আগের মতো নেই। আগাগোড়া পালটে গেছে। তারকদের মতো ছেলেরা হাতে না থাকলে অসুবিধা হবে।

নিখিলেশদা যেন দুশ্চিন্তা না করেন, ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে, দোষত্রুটি শুধরে, সচেতন রাজনৈতিক কর্মী করে তোলা হবে।

মনে আছে, প্রথম বার হার্ট অ্যাটাকের খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন যোগেন মাস্টার। স্ত্রীকে সঙ্গে এনেছিলেন। এর আগে আরতি আর কখনও তাঁদের বাড়ি আসেননি।

নিখিলেশ তখন সবে নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরেছেন। কারও হাত ধরে বাথরুমে যাওয়া ছাড়া বিছানাতেই সারাদিন শুয়ে থাকতে হ'ত। অনুপমা যোগেন মাস্টার আর আরতিকে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আরতিকে দেখে খুশি হয়েছিলেন নিখিলেশ। একটু মজা করে বলেছেন, 'বৌদি, ভাগ্যিস অসুখটা হয়েছিল, তাই আপনার পায়ের ধুলো এখানে পড়ল।'

বিব্রতভাবে আরতি বলেছেন, 'না না, এভাবে বলবেন না। অনেক বার আসতে চেয়েছি, নানা কারণে বাধা পড়েছে। ভগবান আপনাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তুলুন।'

আরতি ছিলেন গভীরভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী। কিন্তু ভগবান, দেবদেবী, এদের সম্পর্কে নিখিলেশের আগ্রহ ছিল না। তিনি বলেছেন, 'আপনাদের মতো সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষীদের শুভেচ্ছায় নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠব।'

নিখিলেশের ঘরে কিছুক্ষণ গল্পটল্প করার পর অনুপমা আরতিকে বলেছিলেন, 'আসুন, আমাদের বাড়িটা আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাই।'

ওঁরা চলে যাবার পর ঘরে তখন শুধু নিখিলেশ আর যোগেন মাস্টার। নিখিলেশ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তালবনির খবর বলুন—'

যোগেন মাস্টার বলেছেন, 'ওসব এখন থাক। আগে পুরোপুরি সেরে উঠুন। তারপর সব —'

নিখিলেশ তাঁর কথা শোনেননি। তালবনি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য জানার জন্য একরকম জেদই ধরেছিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শেষ পর্যন্ত দ্বিধান্বিতভাবে যোগেন মাস্টার বলেছেন, 'আপনি কি কিছুই শোনেননি?'

'শুনেছি। তবু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই।'

'আপনার শরীরের এই অবস্থায় কোনওভাবেই এক্সাইটেড হওয়া উচিত নয়। তবু আপনি যখন জোর করছেন, বলছি।'

নিখিলেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন।

তারক, পল্টা, গাল-কাটা সেলিম, লেলো এবং নিবারণ হালদারদের ছাতার তলায় অন্য যেসব অ্যান্টি-সোসালরা আশ্রয় নিয়েছে — এদের সবার নানা কুকীর্তির বিবরণ দেবার পর যোগেন মাস্টার বলেছিলেন, 'আপনাকে আগেই বলেছিলাম রাজনীতিতে ক্রিমিনালদের ঢোকালে তার পরিণাম কী হতে পারে। যে ভয়টা আমার ছিল ঠিক সেটাই এখন তালবনিতে ঘটে চলেছে।' একটু থেমে অসংলগ্নভাবে বলেছিলেন, 'ক্ষমতা দখলটা একমাত্র লক্ষ্য হলে বোধহয় এরকমই হয়ে থাকে।'

নিখিলেশ উত্তর দেননি। মুখ নামিয়ে বিষণ্ণভাবে শুধু মাথা নেড়েছিলেন।

দ্বিতীয় বার হার্ট অ্যাটাকের খবর পাওয়ার পর একাই এসেছিলেন যোগেন মাস্টার। ততদিনে তালবনি অপরাধীদের অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছে।

যোগেন মাসাটরের আপত্তি কানে না তুলে জোর করে তাঁর কাছ থেকে এবারও তালবনির খবরাখবর নিয়েছেন। শোনার পর দু হাতে মুখ ঢেকে বসে থেকেছেন। তারপর ক্লান্ত সুরে বলেছেন, 'এবার ভাল হয়ে উঠলে একটা কড়া স্টেপ আমি নেবই।'

কিন্তু কিছুই করা সম্ভব হয়নি। দেখতে দেখতে আরও একটা নির্বাচন এসে গেল। এবারও কোনও পরিবর্তন নেই। প্রচারের ব্যবস্থা সেই একইরকম। নির্বাচনী রুটিন অনুযায়ী সেই মিটিং, মিছিল, পদযাত্রা, পোস্টারিং, তারকদের মতো লোকেদের বোমাবাজি, ইত্যাদি।

এবার নিখিলেশকে ডাক্তাররা নির্বাচনে নামতে বারণ করেছিল। তাঁর দল, দলীয় কর্মী এবং নিজের ছেলেমেয়েদের প্রচণ্ড আগ্রহে নামতেই হল। তা ছাড়া অন্য কোনও প্রার্থীকে এখানে নামাতে পার্টির সাহস হয় নি।

আগের বারের মতো এবারও তালবনির উন্নয়নের ওপর জোর দিলেন নিখিলেশ। জনসভায় বিনীতভাবে জানালেন, গুরুতর অসুস্থতার কারণে ঘোষিত প্রোজেক্টগুলোর বাস্তব রূপ দিতে পারেননি। এবার নির্বাচিত হলে দেড় দু'বছরের ভেতর সেগুলো শেষ করে ফেলবেন।

তাছাড়া যে সব কল-কারখানা ক'বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে সেগুলো অবশ্যই খুলে দেবেন।

কিন্তু এত বিরাট বিরাট প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও নিখিলেশের চোখে পড়েছে, এতটুকু সাড়া পাওয়া গেল না। তাঁর সম্বন্ধে এখানকার মানুষ সবরকম উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। তালবনির জনগণ তাঁকে আর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না। তাঁর ওপর কারও আস্থা নেই।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন নিখিলেশ। আগের নির্বাচনের সময়ও প্রচুর লোক এসেছিল তাঁর সভায়। এবার তার দশভাগের একভাগও হয়নি। প্রায় ফাঁকা সভাগুলোর দিকে তাকিয়ে টের পাচ্ছিলেন, হাতের মুঠো একেবারেই আলগা হয়ে গেছে এবং তার ফাঁক দিয়ে জনসমর্থন নামক ম্যাজিকটা বেরিয়ে গেছে। মনে মনে স্বীকার করেছেন, তালবনির জন্য কিছুই তো করা হয়নি। তবু তিন তিনবার এখানকার মানুষ নানা প্রত্যাশায় তাঁকে জিতিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কতবার তারা তাঁর ওপর ভরসা রাখবে?

নির্বাচন হয়ে গেল। যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, রেজাল্ট বেরুবার পর প্রমাণিত হল সেটা ষোল আনা ঠিক। একদিন বিপুল ভোটে জিতে রেকর্ড করেছিলেন। এবারও করলেন, আশি হাজারেরও বেশি ভোটে হেরে। তাঁর জনপ্রিয়তা একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকল। কয়েক বছর ধরে নিজেকে একটু একটু করে শেষ করেছেন নিখিলেশ। তিনি যেন সচল, সজীব মানুষ নন—এটা ধ্বংসস্তূপ। তাঁর পক্ষে পুনরুত্থান আর কি সম্ভব?

ভোটের রেজাল্ট বেরুবার পর বিপর্যস্ত নিখিলেশ আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবে হার্ট অ্যাটাক হয়নি। এই অসুস্থতার কারণ হতাশা আর ক্লান্তি। পরাজয়ের লক্ষণগুলি প্রচারের সময়ই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবু মনেপ্রাণে কে আর হার মানতে চায়, বিশেষ করে যেখানে একক প্রচেষ্টায় একদিন জনপ্রিয়তার আকাশ-ছোঁয়া মিনার তিনি গড়ে তুলেছিলেন?

এবারের নির্বাচনে শুধু তিনিই নন, পার্টির আরও অনেকেই হেরে গেছেন। সাধারণ মানুষ তাঁদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে, এটা তারই লক্ষণ। বিধানসভার ভোটে যতগুলো সিটে জিতলে মন্ত্রিসভা গড়া সম্ভব, এবার সংখ্যাটা তার চেয়ে কিছু কমে গেছে। খুব অল্পের জন্য নিখিলেশদের হাত থেকে ক্ষমতা বেরিয়ে গেল। আর সেটা দখল করলেন নিবারণ হালদাররা।

এই নিয়ে পার্টি তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব জরুরি মিটিং ডেকে পরাজয়ের পোস্টমর্টেম শুরু করেছিলেন। কার কনস্টিটিউয়েন্সিতে কী ধরনের ভুলত্রুটি ঘটেছে, কয়েকদিন ধরে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। ময়না তদন্তের পর সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হল, হারানো জমি পুনরুদ্ধারের জন্য এখন থেকে গ্র্যাসরুটে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। যে সাময়িক ধাক্কাটা লেগেছে সেটা সামলে ওঠা এমন কিছু কঠিন নয়। হাতে পুরো পাঁচটা বছর আছে। নিবারণ হালদারদের গভর্নমেন্টের দোষত্রুটি পাওয়ামাত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জনমতকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে হবে। অর্থাৎ পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি এখন থেকেই। একটা মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না। হারানো ক্ষমতা ফিরে পেতেই হবে।

পার্টি শুধু কর্মসূচিরই পরিকল্পনা করেনি, সারা রাজ্য জুড়ে কাজও শুরু করে দিয়েছিল। তবে নিখিলেশ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর ওপর কোনওরকম চাপ দেওয়া হয়নি। তিনি দায়িত্বশীল জননেতা। সুস্থ হবার পর হাত-পা গুটিয়ে যে বসে থাকবেন না, সেটা পার্টি নেতৃত্বের ভাল করেই জানা ছিল।

মনে আছে, প্রথম বার নির্বাচনের পর তাঁর সঙ্গে দেখা করে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন যোগেন মাস্টার। তারপরের দু'বার দেখা হয়নি, তবে চিঠি লিখেছেন। তাতে অভিনন্দনের সঙ্গে তীক্ষ্ণ সমালোচনাও ছিল। কিন্তু এবারের নির্বাচনের পর তাঁর প্রতিক্রিয়া কিছুই জানা যায়নি।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন নিখিলেশ, হারের খবর পেয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে অনুপমা এই প্রথম বার বলেছিলেন, 'সব কাজেরই রিটায়ারমেন্ট থাকে। অনেকদিন রাজনীতি করেছ। এবার ওসব বাদ দাও। তোমার এই বয়েসে, শরীরের এই অবস্থায় নতুন করে কোনওরকম টেনসন নেওয়া ঠিক হবে না। এখন তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

নিখিলেশ খুব অবাক হয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্মে কখনও অনুপমা বাধা দেননি, বরং উৎসাহ যুগিয়ে এসেছেন। তাঁর জন্যই একদিন বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলেন। তাঁর জন্য কম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি অনুপমাকে। এই মহিলাটি

নিখিলেশের জীবনে একটা বিরাট শক্তির উৎস।

নিখিলেশ বলেছিলেন, 'বললেই কি এক কথায় সব ছেড়ে দেওয়া যায়?'

অনুপমা জিজ্ঞেস করেছেন, 'কেন যায় না?'

নিখিলেশ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, রাজনীতিটা কেরানিগিরি বা কল-কারখানার চাকরির মতো ধরাবাঁধা কাজ নয় যে নির্দিষ্ট সময়ের পর অবসর নেওয়া চলবে। একজন সৎ, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ কর্মীকে আমৃত্যু এটা চালিয়ে যেতে হয়। কোনওভাবেই তার পক্ষে থামা চলবে না। একটু হালকাভাবে বলেছেন, রাজনীতি করা আর বাঘের পিঠে ওঠা একই ব্যাপার। একবার চড়লে আর নামা যায় না। যতদিন না শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হচ্ছে, বাঘের সওয়ার হয়েই থাকতে হবে।

ছেলেমেয়েরা কিন্তু মায়ের মতো নিখিলেশের অবসরের কথা চিন্তাও করতে পারেনি। তারা সর্বক্ষণ বলে গেছে সুস্থ হয়েই নিখিলেশ যেন কাজ আরম্ভ করে দেন। তিনি হেরে যাওয়ায় ওরা ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছিল।

সুস্থ হবার পর নিখিলেশ যোগেন মাস্টারকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, আজ তালবনিতে আসবেন। প্রায় চল্লিশ বছর আগে যখন এসেছিলেন তখন তিনি একজন আনকোরা রাজনৈতিক কর্মী। অনভিজ্ঞ হলেও জনসেবার আদর্শ সামনে রেখে সতেজ উৎসাহে টগবগ করে ফুটছেন। এতগুলো বছরে নিখিলেশ আর সেদিনের সেই যুবকটি নেই। জীবনে বিপুল সাফল্য যেমন দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন চরম ব্যর্থতা। জনপ্রিয়তার শিখরে তিনি পৌঁছেছিলেন, সেখান থেকে তাঁর যে পতন হয়েছে তা অভাবনীয়। তিনি দেখতে চান, সময়ের এবং পরিবেশের দুস্তর ব্যবধান পেরিয়ে আবার নতুন করে শুরু করা যায় কিনা।

স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা তাঁকে একা আসতে দিতে চায়নি। তিনি জোর করে চলে এসেছেন। এ যেন অনেকটা পূর্বজন্মে ফিরে যাওয়ার মতো। কাজটা খুবই দুরূহ কিন্তু একেবারেই কি অসম্ভব? আপাত শান্ত নিখিলেশের মধ্যে অনমনীয় এক দৃঢ়তা রয়েছে। রয়েছে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়াবার অদম্য জেদ। এই বয়সে দু দু'বার হার্ট অ্যাটাকে জীবনীশক্তি অনেকটা ক্ষয়ে এলেও একাগ্রতা, দুঃসাহস বা অসীম মনোবল এখনও প্রায় অক্ষতও থেকে গেছে।

*   *   *

কতক্ষণ শুয়ে ছিলেন খেয়াল নেই নিখিলেশের। হঠাৎ দরজার কাছ থেকে যোগেন মাস্টারের গলা ভেসে এল, 'কী নিখিলেশবাবু, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?'

চমকে উঠলেন নিখিলেশ। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে বললেন, 'না না, এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসে নাকি?'

শোবার সময় আলো জ্বালেননি নিখিলেশ। ঘরটা অন্ধকার। ভেতরে ঢুকে যোগেন মাস্টার সুইচ টিপতেই উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে গেল। খাটের একধারে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'খুব টায়ার্ড লাগছে?'

নিখিলেশ অল্প হাসলেন, 'অনেকদিন পর ট্রেনে এসেছি তো। তাই —' একটু থেমে বললেন, 'ও কিছু না।'

'আপনি হার্ট পেশেন্ট। সেদিক থেকে কোনওরকম কষ্ট টষ্ট হচ্ছে না তো?'

'না। তবে—'

'কী?'

'রোজ রাত্তিরে হার্টের জন্যে দুটো করে ট্যাবলেট খেতে হয়। ওষুধগুলো আনতে ভুলে গেছি।'

যোগেন মাস্টার বললেন, 'কাল ওষুধের নাম লিখে দেবেন। স্কুল থেকে ফেরার সময় কিনে আনব।'

নিখিলেশ বললেন, 'আচ্ছা।'

একটু ভেবে যোগেন মাস্টার কিছুটা উদ্বেগের সুরে বললেন, 'বুকে যদি অস্বস্তি ফিল করেন বলুন। গোল বাজারে 'মিনতি ফার্মেসি' রাত বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে। ওষুধটা এখনই গিয়ে নিয়ে আসতে পারি।'

নিখিলেশ বললেন, 'না না, তার দরকার হবে না। কাল এনে দিলেই চলবে।'

'আবার আমাকে বেরুতে হবে বলে কি সঙ্কোচ হচ্ছে?'

'আরে না না। আপনার কাছে কিসের সঙ্কোচ?'

আর কোনও প্রশ্ন করলেন না যোগেন মাস্টার।

একটু চুপচাপ।

তারপর যোগেন মাস্টার বললেন, 'আরতি বলছিল রান্না হয়ে গেছে। আমি এখন উঠছি। গায়ে দু-বালতি জল ঢেলে নিই। তারপর খেতে বসব।'

নিখিলেশ বললেন, 'ঠিক আছে।'

মিনিট পনেরো বাদে রান্নাঘরের সামনে চওড়া বারান্দায় সুতোর ফুল-তোলা আসনে পাশাপাশি খেতে বসেছিলেন নিখিলেশ আর যোগেন মাস্টার। আরতি জানেন যাঁর দুটো হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, তাঁর খাদ্যতালিকায় কী থাকা উচিত। দু'রকম মাছের হালকা ঝোল, আলুভাতে, নানারকম আনাজ দিয়ে তরকারি, পটল আর ছোট বড়ি ভাজা, সরতোলা এক বাটি দুধ এবং দুটো মাঝারি সাইজের কড়া পাকের সন্দেশ।

তরকারি দিয়ে মেখে ভাতের গ্রাস মুখে পুরতে পুরতে যোগেন মাস্টার বললেন, 'এভাবে মাটিতে বসে খাওয়ার অভ্যেস অনেক কাল আপনার নেই। নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হচ্ছে।'

নিখিলেশ বললেন, 'অসুবিধে? কী বলছেন আপনি! কতদিন পর আমরা একসঙ্গে বসে খাচ্ছি। কী ভাল যে লাগছে!'

কিছুক্ষণ পুরনো দিনের এলোমেলো গল্প করার পর যোগেন মাস্টার বললেন, 'এবার বলুন সেকেন্ড ক্লাস ট্রেনে চড়ে হঠাৎ তালবনিতে আসার উদ্দেশ্যটা কী?'

খেতে খেতে সেটা জানিয়ে দিলেন নিখিলেশ। শোনার পর যোগেন মাস্টারের কপালে ভাঁজ পড়ল। খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'ঝুঁকিটা নেওয়া কি ঠিক হবে?'

নিখিলেশ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের ঝুঁকি?'

যোগেন মাস্টার বললেন, 'জনমত আপনার ফেভারে নেই সেটা তো ইলেকশানের রেজাল্ট দেখে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। সামনাসামনি আপনাকে পেলে তালবনির মানুষ বিশ্রীভাবে অপমান করতে পারে।'

নিখিলেশ বললেন, 'সেটা স্টেশনে নেমেই টের পেয়েছি।' একটু থেমে বললেন, 'যা করে করুক। আমাকে ওদের ফেস করতেই হবে।'

যোগেন মাস্টার বললেন, 'আপনার সৎ সাহসের প্রশংসা করছি। কিন্তু —'

নিখিলেশ বললেন, 'কিন্তু কী?'

'লোকজন খারাপ কথা বললে উত্তেজিত হবেন না। সেটা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়।'

'ওরা যদি গালাগালও করে ভাবব ঠিক কাজই করছে। শুধু প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া এ ক'বছরে তালবনির মানুষের জন্যে কী এমন করেছি যে আমাকে তারা মাথায় তুলে রাখবে? মাথা গরম করার কথা বলছেন? ওটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনি তো জানেন, আমার সহ্যশক্তিটা অন্যের তুলনায় একটু বেশি মাত্রাতেই রয়েছে। স্টেশন থেকে আসার সময় বিকেলে তো দেখেছেন, কত লোক আমার সম্বন্ধে কত কমেন্ট করছিল, আমি কি রি-অ্যাক্ট করেছি?'

যোগেন মাস্টার উত্তর না দিয়ে সামান্য হাসলেন।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর কী চিন্তা করতে করতে যোগেন মাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, 'জনগণের কাছে কবে থেকে যেতে চাইছেন?'

নিখিলেশ বললেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ধরুন কাল সকাল থেকেই।'

'নিশ্চয়ই আপনাকে প্রচুর ঘোরাঘুরি করতে হবে।'

'তা তো হবেই।'

'এখানে নতুন একটা গ্যারাজ হয়েছে। ওরা গাড়ি ভাড়া দেয়। আপনার জন্যে ওদের কি একটা গাড়ির কথা বলব?'

'না না, তার দরকার নেই।'

'আপনি কি একাই ঘুরবেন?'

'হ্যাঁ। একেবারে একা। চল্লিশ বছর আগে যখন পার্টির কাজ করতে এসেছিলাম তখন সঙ্গে কেউ ছিল না। আমার কোনও অসুবিধে হয়নি। ধরুন ফের শূন্য থেকে শুরু করতে যাচ্ছি।'

নিখিলেশ গাড়ি ছাড়া একা একা কিভাবে ঘুরবেন কে জানে। যোগেন মাস্টারকে বেশ চিন্তিত দেখাল। তবে এ নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করলেন না।

কলকাতা থেকে একেবারে খালি হাতে চলে এসেছিলেন। মানসিক অবস্থাটা তখন তাঁর এমন যে জামাকাপড় এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসপত্র যে নিয়ে আসবেন, খেয়াল ছিল না। অনুপমাও মনে করিয়ে দেন নি। তাঁর তালবনিতে আসা নিয়ে ওঁরা ভীষণ টেনসনে ছিলেন। পরদিন সকালে তাই আর ব্রাশ করা হল না। আরতির কাছ থেকে পেস্ট নিয়ে আঙুল দিয়ে দাঁতে ঘষে মুখ ধুয়ে নিলেন। তারপর কলকাতায় অনুপমাকে ফোন করে বললেন, কাউকে দিয়ে যেন আজই তাঁর ক'টা ধুতি-পাঞ্জাবি, ব্রাশ-পেস্ট, তোয়ালে, শেভিং বক্স, ওষুধের শিশি এবং ক্যাপসিউলের স্ট্র্যাপগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অনুপমা বললেন, 'ঠিক আছে। বিকেলেই পেয়ে যাবে।'

নিখিলেশ বললেন, 'তুমি একা বাড়িতে আছ। মিলিকে ক'দিন তোমার কাছে থেকে যেতে ব'লো।'

'একা কোথায়? সুধাই তো রয়েছে। আমাদের জন্যে চিন্তা ক'রো না। তেমন বুঝলে মিলিকে খবর দেব।'

'আচ্ছা, এখন রাখছি।'

ব্যস্তভাবে ওধার থেকে অনুপমা বললেন, 'শোন শোন, লাইন কেটে দিও না।'

নিখিলেশ বললেন, 'যা বলার তাড়াতাড়ি বল। আমাকে একটু বেরুতে হবে।'

'বেশি স্ট্রেন ক'রো না কিন্তু—'

'ঠিক আছে।'

'অনিয়ম করবে না।'

'আচ্ছা আচ্ছা—' বলে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন নিখিলেশ। তাঁর শরীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সারাক্ষণ উদ্বেগে থাকেন অনুপমা। লাইন কেটে না দিলে আরও দশ পনেরো মিনিট অনর্গল গণ্ডা গণ্ডা নিষেধাজ্ঞা শুনতে হবে।

ব্রেকফাস্ট তৈরিই ছিল। দুধ, কলা এবং চিড়ে। সঙ্গে একটা মিষ্টি। যোগেন মাস্টার এবং নিখিলেশ একসঙ্গে বসে খাওয়া শেষ করলেন। তারপর এক টুকরো কাগজে তাঁর ওষুধের নাম লিখে দিয়ে বললেন, 'বেশি আনবেন না। দুটো করে আনলেই চলবে। বাড়িতে অনেক কেনা আছে। বিকেলে অনুপমা পাঠিয়ে দেবে।'

যোগেন মাস্টার কাগজটা নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে।'

নিখিলেশ এবার আরতিকে বললেন, 'বৌদি, যোগেনবাবুর এক সেট ধুতি-পাঞ্জাবি দিন। একবার বেরুতে হবে।'

আরতি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। 'দিচ্ছি —' বলে চলে গেলেন।

যোগেন মাস্টার নিখিলেশকে লক্ষ করছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন দিকে যাবেন?'

নিখিলেশ অল্প হাসলেন, 'নির্দিষ্ট কোনও দিক ঠিক করে রাখি নি। আগে তো বাড়ি থেকে বেরুই। তারপর দেখা যাবে।' একটু থেমে বললেন, 'ক'দিন সারা তালবনি আর চারপাশের গ্রামগুলো ঘুরব। কোনও লোকালিটি, কোনও রাস্তা বাদ দেব না। শুরুটা

যেখান থেকে হোক করলেই চলবে।'

'একটা কথা বলব?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন না—'

'আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই।'

একটু অবাক হয়ে নিখিলেশ বললেন, 'আপনার স্কুল আছে না?'

যোগেন মাস্টার বললেন, 'আজকের দিনটা ছুটি নিয়ে নেব।'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন নিখিলেশ। তারপর বললেন, 'আপনি তো অকারণে কখনও ছুটি টুটি নেন না।' হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার জন্যে খুব দুর্ভাবনা হচ্ছে বুঝি?'

যোগেন মাস্টার উত্তর দিলেন না।

নিখিলেশ হেসে হেসে বললেন, 'আপনিই বলেছিলেন না, পলিটিক্যাল ওয়ার্কারদের জন্যে কখনও ইটের টুকরো, আবার কখনও ফুলের তোড়া অপেক্ষা করে থাকে। ফুলের তোড়া অনেক পেয়েছি। দেখা যাক ইটের টুকরোগুলো কেমন লাগে। আপনাকে কষ্ট করে সঙ্গে যেতে হবে না। ডোন্ট ওরি।'

আরতি ইস্তিরি-করা ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি আর ধুতি এনে নিখিলেশকে দিলেন। সেগুলো নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বাসি পোশাক বদলে পরে ফেললেন তিনি। তারপর বাইরে এসে দেখলেন সামনের টানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন যোগেন মাস্টার আর আরতি।

'চলি—' বলে উঠোনে নামলেন নিখিলেশ।

যোগেন মাস্টাররা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত এলেন। দু'জনকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

আরতি বললেন, 'খুব বেশি দেরি করবেন না।'

নিখিলেশ বললেন, 'না না, বারোটা, সাড়ে বারোটার মধ্যে ফিরে আসব।'

রাস্তায় নেমে তিনি ঠিক করলেন কাল যেদিক থেকে এসেছিলেন, আপাতত সেদিকেই যাবেন। মূল শহর, কল-কারখানা, সব ওধারেই। মানুষজনও অন্য এলাকার তুলনায় ওখানে অনেক বেশি। ওই অঞ্চলটায় গেলে তাঁর সম্বন্ধে তালবনির বাসিন্দাদের মনোভাব ভালভাবেই টের পাওয়া যাবে।

এখন সবে আটটা। এই নতুন পল্লী জায়গাটা মোটামুটি নিরিবিলি হলেও রাস্তায় এর মধ্যে বেশ কিছু লোকজন বেরিয়ে পড়েছে। নিখিলেশকে সকালবেলায় রাস্তার খোয়া মাড়িয়ে হাঁটতে দেখে সবাই হতবাক। নিজেদের চোখগুলোকে যেন তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না। কাল তালবনি স্টেশনে নামার পর থেকে এখানকার বাসিন্দাদের ঠিক এই ধরনের প্রতিক্রিয়াই নিখিলেশ লক্ষ করছেন।

প্রাথমিক বিস্ময়টা খানিক থিতিয়ে এলে কারও কারও চোখে মুখে চাপা অসন্তোষ ফুটে উঠছিল। বোঝা যাচ্ছিল, নিখিলেশ তাদের কাছে অবাঞ্ছিত।

নিখিলেশ প্রত্যেককেই হাতজোড় করে হাসিমুখে বলছিলেন, 'নমস্কার। ভাল আছেন

তো?'

অনেকেই প্রতি-নমস্কার জানাচ্ছিল, কিন্তু মুখে কিছু বলছিল না।

দু-একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কবে তালবনিতে এসেছেন?'

নিখিলেশ বললেন, 'কাল।'

'কাগজে পড়েছিলাম, আপনি ভীষণ অসুস্থ—'

'হ্যাঁ। এখন মোটামুটি ভাল আছি। না হলে এতদূর এলাম কী করে?' বলে একটু হেসেছেন নিখিলেশ।

প্রশ্নকর্তা এবার জিজ্ঞেস করেছে, 'কোথায় উঠেছেন? গেস্ট হাউসে?'

'না। যোগেনবাবুর বাড়িতে।'

'ক'দিন থাকছেন?'

'আছি কয়েকদিন।'

একজন এগিয়ে এসে বলেছে, 'সেই ইলেকশানের আগে এসেছিলেন। তখন যা দেখে গিয়েছিলেন, তালবনির হাল এখন তার চেয়েও অনেক খারাপ।'

খারাপ যে তার সংকেত আগেই পেয়েছিলেন নিখিলেশ। তিনি সতর্ক চোখে লোকটিকে লক্ষ করতে লাগলেন। কোনও উত্তর দিলেন না।

এখানকার অবস্থার কতটা অবনতি ঘটেছে, লোকটা বিশদভাবে নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে তা জানালো না। শুধু বলল, 'কয়েকদিন যখন থাকবেন, নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন।'

কথোপকথন এখানেই শেষ। নির্বাচনের পর তালবনির সামাজিক এবং রাজনৈতিক আবহাওয়া এখন কেমন, বা আগের তুলনায় কতটা পরিবর্তন হয়েছে, সে সম্বন্ধে লোকগুলোর কাছে খোঁজখবর নেবার ইচ্ছা হল নিখিলেশের। যদিও তিনি মোটামুটি শুনেছেন, তবুও সোজাসুজি জনগণের মুখ থেকে শোনাটা অনেক জরুরি। সেটা দিক-নির্ণয় যন্ত্রের মতো আসল লক্ষণগুলোকে চিনিয়ে দেয়।

লোকটা নিজের থেকে যখন বলতে চাইল না তখন কোনও প্রশ্ন করলেন না নিখিলেশ। তিনি তো এখানে ক'দিন থাকছেনই। এরা না বলুক, তালবনিতে হাজার হাজার মানুষ আছে। তারা কেউ না কেউ নিশ্চয়ই সব জানাবে। তাড়ার কিছু নেই।

একটা ফাঁকা রিকশা উলটো দিক থেকে আসছিল। হাত তুলে সেটা থামিয়ে নিখিলেশ বললেন, 'গাড়ি ঘুরিয়ে নাও। স্টেশনের দিকে যাব—'

অন্য সবার মতো রিকশাওলাও অবাক বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। তারপর অনেকখানি ঝুঁকে নমস্কার করে সিধে হয়ে দাঁড়ায়। রিকশার মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি!'

গাড়িতে উঠে হেসে হেসে নিখিলেশ বললেন, 'অনেকদিন তালবনিতে আসা হয়নি। ভাবলাম, একবার ঘুরে দেখি!'

রিকশাওলার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। রোগা, ক্ষয়াটে চেহারা। সে সামনের দিকে ঝুঁকে প্যাডল করতে করতে জিজ্ঞেস করল, 'রাস্তাঘাট ভাল না, ভাঙাচোরা। রিকশায়

কিন্তু ভীষণ ঝাঁকুনি লাগবে। আপনার কষ্ট হবে।'

নিখিলেশ বিব্রত বোধ করলেন। একটা রিকশাওলাও জেনে গেছে, অঢেল আরামে দীর্ঘকাল কাটানোর পর রিকশার মতো একটা নিকৃষ্ট যানে চলাফেরা করতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন না। অর্থাৎ তিনি এখন আর সাধারণ মানুষের ক্লাসে পড়েন না। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর ক্লাস আলাদা হয়ে গেছে। নিচু গলায় বললেন, 'না, কোনও কষ্ট হবে না।'

রিকশাওলা কী জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই আচমকা পেছন দিক থেকে অনেকগুলো গলা ভেসে এল, 'নিখিলেশদা—নিখিলেশদা—'

মাথার ওপর রিকশার ঢাকনাটা তুলে দেওয়া হয়নি। মুখ ফেরাতেই নিখিলেশ দেখতে পেলেন, সত্যজিৎ, পরিমল এবং পার্টির স্থানীয় দু-তিনটি কর্মী জোরে জোরে পা ফেলে প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছে। তিনি রিকশাওলাকে থামতে বললেন।

সত্যজিৎরা কাছে এসে দাঁড়ালেন। সবাই হাঁপাচ্ছেন।

সত্যজিৎ বললেন, 'আপনি যে তালবনিতে আসবেন, আমাদের তো আগে জানান নি!' তাঁর গলায় ক্ষোভ ফুটে বেরুল।

রিকশা থেকে নেমে পড়েছিলেন নিখিলেশ। বললেন, 'হঠাৎ চলে এলাম। তাই—' কথাটা ঠিক বলেননি তিনি। তালবনিতে আসার জন্য মনে মনে বেশ কয়েকদিন ধরে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, যোগেন মাস্টারকে এ ব্যাপারে চিঠিও লিখেছেন। এসব বললে সত্যজিৎদের ক্ষোভ আরও বেড়ে যাবে, তাই এই সামান্য মিথ্যাচারটুকু করতে হল।

পরিমল বললেন, 'কাল অনেক রাতে আপনার আসার খবর পেলাম। শুনলাম, যোগেনবাবুর বাড়িতে উঠেছেন। অত রাতে আর ওখানে যাইনি। আজ খানিক আগে গিয়ে জানা গেল, আপনি বেরিয়ে পড়েছেন। দূর থেকে রিকশায় আপনাকে দেখতে পেয়ে দৌড়তে লাগলাম।'

নিখিলেশ সামান্য হাসলেন।

পরিমল জিজ্ঞেস করলেন, 'এই সকালবেলায় কোথায় চলেছেন একা একা?'

নিখিলেশ বললেন, 'শহরটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখি।'

যোগেন মাস্টার যে ভঙ্গিতে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন প্রায় সেই সুরেই পরিমল বললেন, 'এভাবে আপনার বেরিয়ে পড়াটা ঠিক হয়নি নিখিলেশদা। যে কোনও কারণেই হোক, জনমত আপাতত আমাদের পক্ষে নেই। কে কী করে বসবে—'

সত্যজিৎ বললেন, 'আপনি যোগেনবাবুর বাড়ি ফিরে যান। বিকেলে গাড়ির ব্যবস্থা করে আপনাকে তুলে নেব। আমাদের কর্মীরাও সঙ্গে থাকবে। এত লোক দেখলে কেউ চট করে কিছু বলতে সাহস করবে না।'

যোগেন মাস্টারও গাড়ির কথা বলেছিলেন। নিখিলেশ রাজি হননি, এখনও হলেন না। বললেন, 'চল্লিশ বছর আগে যখন প্রথম তালবনিতে আসি তখন একজন সঙ্গীও ছিল না। একা ঘুরেই আমাকে পার্টির কাজ করতে হয়েছে।' একটু থেমে বললেন, 'তখন মোটর গাড়িতে করে ঘোরার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। এমন কি সাইকেল

রিকশায় চড়ার মতো পয়সাও ছিল না। আমার কিন্তু এতটুকু অসুবিধা হয় নি।'

সত্যজিৎ বললেন, 'সময় অনেক বদলে গেছে নিখিলেশদা। সেদিনের তালবনি এখন আর নেই।'

পরিমল বললেন, 'সেদিন আপনার বয়েস ছিল অনেক কম। শারীরিক শক্তি ছিল, ছিল কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা। এর মধ্যে আপনার স্টেটাস পালটে গেছে। একবার এম এল এ হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন দু'বার। দু দু'টো স্ট্রোক হবার পর স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। এখন বড় রকমের ধকল নেওয়া কি ঠিক?'

নিখিলেশ বললেন, 'পরিমল, মনে রেখো, শরীর খানিকটা ভাঙলেও আমার মনের জোর কিন্তু আগের মতোই আছে।'

সত্যজিৎ বললেন, 'মনের জোরটাই কিন্তু সব নয় নিখিলেশদা। তার সঙ্গে ফিজিক্যাল স্টেন্‌থটাও দরকার। নইলে কোনও কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। আপনার যা স্বাস্থ্যের কণ্ডিশন আর বয়েস তাতে কমফোর্ট দরকার। এটা কোনও বিলাসিতা নয়।'

পরিমল বললেন, 'তা হলে রিকশাওলাকে ওর গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিতে বলি?'

বুঝতে না পেরে নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে?'

পরিমল বললেন, 'যোগেনবাবুর বাড়ি গিয়ে দুপুরে খেয়ে দেয়ে রেস্ট নিন। আমরা পরে—'

কিন্তু কারও অনুরোধ বা বাধা কানে তুললেন না নিখিলেশ। হাত তুলে পরিমলকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি যা স্থির করেছি তাই করব। অকারণে সময় নষ্ট হচ্ছে।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন এক অনমনীয়তা ছিল যাতে সত্যজিৎরা কী উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না।

নিখিলেশ এবার বললেন, 'তোমার যাও। আমি পরে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।' রিকশায় উঠে তার চালককে বললেন, 'চল—'

সত্যজিৎরা নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খানিকটা যাবার পর রিকশাওলা বলল, 'ওই বাবুরা ঠিক কথাই বলছিলেন। জায়গাটা সত্যিই পালটে গেছে।'

বোঝা গেল, সত্যজিৎদের কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছে রিকশাওলা। অন্যমনস্কর মতো নিখিলেশ বললেন, 'হুঁ—'

রিকশাওলা বলল, 'আপনি যখন এখানে থাকতেন কত শান্তি ছিল।'

নিখিলেশ বুঝতে পারলেন, লোকটা অনেকদিন আগের কথা বলছে। তিনি উত্তর দিলেন না।

রিকশাওলা থামেনি, 'যেদিন থেকে ওই বন্দুকওলা গুণ্ডা-মস্তানগুলো ভোটের ভেতর ঢুকে পড়ল, তালবনির শান্তিও শেষ। সবসময় এখানকার লোক ভয়ে ভয়ে থাকে।'

নিখিলেশ চমকে উঠলেন। নিবারণ হালদারের মতো তাঁর হয়েও ভোটের সময় খেটেছিল তারক, পল্টা, গাল-কাটা সেলিমের মতো অ্যান্টি-সোসালরা। রিকশাওলা কি সেই ইঙ্গিতই দিল? কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন নিখিলেশ। তারপর জিজ্ঞেস করেন, 'ভয়ে

ভয়ে থাকে কেন?'

'কখন কার ওপর ওরা জুলুম চালাবে তার তো ঠিক নেই।'

এধারের রাস্তায় পিচ ফেলা হয়েছে। ফলে মোটামুটি মসৃণভাবেই সাইকেল রিকশাটা এগিয়ে যাচ্ছে।

এখন প্রচুর লোকজন চোখে পড়ছে। কাল তালবনি স্টেশনে নামার পর যারাই তাঁকে দেখেছে তাদের সবার দৃষ্টিতে প্রথমত বিস্ময়, তারপর অসন্তোষ, ক্ষোভ এবং বিতৃষ্ণা ফুটে উঠেছে। আজও তার খুব একটা ব্যতিক্রম নজরে পড়ল না। এখন, এই সকালবেলায় দু-একজন ছাড়া কেউ কাছে এগিয়ে আসছে না, কথাও বলছে না। নিখিলেশ অবশ্য হাসিমুখে হাতজোড় করেই আছেন। পেছন থেকে কালকের মতো কেউ কেউ গালাগাল দিয়ে চেঁচিয়ে উঠছে, 'মহা ধান্দাবাজ, পরের বারের ভোটের জন্যে এখনই নেমে পড়েছে।' বা 'এখানে টুপি পরিয়ে আর ভোট হাতানো চলবে না।'

নিখিলেশের কান লাল হয়ে উঠছিল, মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছে। কিন্তু কিছুই বলার নেই। এক হিসেবে দেখতে গেলে এসব তাঁর প্রাপ্য। সত্যজিৎদের মুখ মনে পড়ছিল তাঁর। ওঁরা এ জাতীয় মন্তব্য শুনলে চুপ করে থাকতেন না। ফলে অত্যন্ত উত্তেজক একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'ত। যে উদ্দেশ্যে তাঁর এখানে আসা সেটা ভেস্তে যেত। কলকাতা থেকে বেরুবার সময় যা তিনি ভেবে এসেছিলেন সেই জায়গাতেই তাঁকে স্থির থাকতে হবে। একচুল এদিক ওদিক হওয়া চলবে না। আসল কথা হল হাসিমুখে সমস্ত সহ্য করা। অপার সহনশীলতা ছাড়া তালবনির মানুষদের নতুন করে বুঝে ওঠা সম্ভব হবে না। নিখিলেশ ভাবলেন, সত্যজিৎরা যে জোর করে তার সঙ্গে আসেননি, তাতে ভালই হয়েছে।

মানুষজন, উলটো দিক থেকে মাঝে মাঝে ছুটে আসা সাইকেল রিকশা, ভ্যান-রিকশা, ক্বচিৎ দু-একটা মোটর — এ সবের ফাঁকে ফাঁকে দু পাশের বাড়িঘর, কিছু কিছু ফাঁকা জমি চোখে পড়ছিল। কাল ভাল করে লক্ষ করেননি কিংবা যোগেন মাস্টারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক ছিলেন বলে সেভাবে মনোযোগ দিতে পারেননি। আজ দেখতে পেলেন, মেঘাই নদীর ওপারে সেই নতুন কংক্রিটের ব্রিজের ভিত্তিপ্রস্তরের মতো এপারের ফাঁকা জায়গায় আরও অনেকগুলো পাথরের ফলক দাঁড়িয়ে আছে। মনে পড়ল, মেয়েদের কলেজ, হাসপাতাল, হাইস্কুল, প্রাইমারি স্কুল, বুনিয়াদি শিক্ষাকেন্দ্র, ইত্যাদি গড়ে দেবার জন্যও শিলান্যাস করেছিলেন।

রিকশাওলাকে থামতে বলে, নেমে গিয়ে দু-চারটে দেখেও এলেন নিখিলেশ। পাথরের ফলকগুলোতে শ্যাওলা জমেছে, সেগুলো ঘিরে কাঁটা ঝোপ আর আগাছার জঙ্গল। তাঁর অসার প্রতিশ্রুতির এই সব স্মৃতিচিহ্ন দেখতে দেখেতে নিখিলেশের মধ্যে তীব্র এক অপবাধবোধ নতুন করে চারিয়ে যাচ্ছিল। একবার এম এল এ এবং দু দু'বার মন্ত্রী হয়েও তালবনির জন্য যে কিছুই করা হয়নি, তাঁর কাজে যে প্রচুর ত্রুটি থেকে গেছে, ভিত্তিপ্রস্তরগুলো বার বার চোখে আঙুল দিয়ে তা বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

আরও কিছুটা যাবার পর কালকের মতোই অনেকগুলো মোটর বাইকের গর্জন কানে ভেসে এল নিখিলেশের। চমকে চারপাশে তাকাতে লাগলেন তিনি। দেখা গেল, সামনের

দিক থেকে কালকের সেই মোটর বাইকগুলোই রাস্তায় একই রকম ঝড় তুলে ছুটে আসছে। অর্থাৎ তারক, পল্টাদের সেই ঝটিকা বাহিনী। মুহূর্তে শিরদাঁড়া টানটান হয়ে যায় তাঁর। আজই যে আবার একই জায়গায় এদের দেখতে পাবেন, ভাবা যায়নি।

রাস্তার লোকজন এবং গাড়িটাড়ি সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে দু'ধারে সরে গিয়ে মোটর বাইকগুলোকে জায়গা করে দিচ্ছিল। তারকরা তালবনিকে যে তটস্থ করে রেখেছে সেটা বোঝা যাচ্ছিল।

তালবনি এখন আর ছোটখাট শহর নয়। চারিদিকের গ্রামাঞ্চল ধরলে এখানকার বাসিন্দার সংখ্যা চার লাখেরও বেশি। এত মানুষ এই শহরে, তা ছাড়া রয়েছে পুলিশ, প্রশাসন, তবু মাত্র হাতে-গোনা ক'টা অ্যান্টি-সোসাল 'রেইন অফ টেরর' বা ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। ভাবা যায়! সঙ্গে সঙ্গে নিখিলেশের মনে পড়ল, তারক আর পল্টাদের কথা চিন্তা করলে আঙুলটা কিন্তু তাঁর দিকেই ঘুরে যাবে। কেননা, তাঁর সায় পেয়েই এখানে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সূত্রপাত। সম্মতিটা অনিচ্ছাসত্ত্বে দিলেও প্রবলভাবে বাধা তো তিনি দেন নি। বরং নির্বাচনের সময় চোখ কান বুজে তারকদের সাহায্য নিয়েছিলেন। হঠাৎ অত্যন্ত বিমর্ষ বোধ করতে থাকেন তিনি।

এদিকে নিখিলেশের রিকশাওলা ভয়ে ভয়ে তাঁর গাড়িটাকে একপাশে নয়ানজুলির গা ঘেঁষে দাঁড় করাতে যাচ্ছিল। হঠাৎ বিমর্ষতা ঝেড়ে ফেলে শিরদাঁড়া টান টান করে বসলেন তিনি। কর্তৃত্বের সুরে বললেন, 'রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে চল। ধারে যেতে হবে না।'

মোটর বাইকগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে ভীত গলায় রিকশাওলা বলল, 'কিন্তু ওরা?'

'তোমার চিন্তা নেই। আমি তো আছি।'

'কিন্তু—'

'আবার কী হল?'

ঢোক গিলে কাঁপা গলায় রিকশাওলা বলল, 'আমি গরিব মানুষ। অন্যায় হলে দয়া করে ক্ষমা করবেন। আপনি তো সব্বোক্ষণ তালবনিতে থাকবেন না, ক'দিন বাদে কলকাতায় ফিরে যাবেন। তারপর—'

রিকশাওলার ইঙ্গিতটা অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি যখন এখানে থাকবেন না তখন পল্টাদের হাত থেকে কে তাকে রক্ষা করবে? নিখিলেশ বললেন, 'ওদের অত ভয় পেতে হবে না।'

রিকশাওলাকে বিপন্ন দেখাল। নিখিলেশের নির্দেশ অমান্য করার সাহস তার নেই। আবার তারকদের সম্বন্ধে তার প্রচণ্ড আতঙ্ক। দুইয়ের মাঝখানে পড়ে লোকটার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

রিকশাওলার মনোভাব আন্দাজ করে নিয়ে নিখিলেশ বললেন, 'আমার ওপর ভরসা রাখো। আমি কলকাতায় চলে যাবার আগে ওরা ভবিষ্যতে তোমার কোনওরকম ক্ষতি যাতে করতে না পারে তার ব্যবস্থা করব। কী নাম তোমার?'

রিকশাওলা নাম বলল, 'জলধর পাড়ুই।'

. জলধর ধীরে ধীরে রিকশা চালাতে চালাতে পেছন ফিরে কথা বলছিল। নিখিলেশ লক্ষ করলেন, ওর দ্বিধাটা এখনও কাটছে না। জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কিছু বলবে?'

কাঁপা গলায় জলধর বলল, 'ওরা আজকাল নিবারণ হালদারের কাছে ভিড়েছে।'

'যার কাছেই ভিড়ুক, আমি যখন কথা দিয়েছি তোমার চিন্তা নেই।'

রাস্তা এত চওড়া নয় যে সাইকেল রিকশা মাঝখান দিয়ে গেলে সেটার পাশ কাটিয়ে পাঁচ-পাঁচটা মোটর বাইক একসঙ্গে যেতে পারবে। অগত্যা কাছাকাছি এসে জোরে ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে দিতে হয় তারকদের। পিচের রাস্তায় মোটর বাইকের দশটা চাকার ঘষটানির আওয়াজ ওঠে—ঘস্-স্-স্, ঘস্-স্-স্ —

মাঝখানের বাইকটায় বসে ছিল তারক। দাঁতে দাঁত ঘষে ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে রিকশাওলাকে কুৎসিত খিস্তি দিতে গিয়ে হঠাৎ নিখিলেশকে দেখতে পেয়ে থেমে যায়। তারপর মোটর বাইকটা দাঁড় করিয়ে রেখে নেমে আসে। তার দেখাদেখি ওর চার সঙ্গ ী — পল্টা, লেলো, বুটাই আর গাল-কাটা সেলিমও নামে।

তারকের চোখে কালকের মতোই সানগ্লাস ছিল। সেটা খুলে স্যালুট করার ভঙ্গিতে কপালে হাত ঠেকিয়ে বিনীত সুরেই বলে, 'নমস্কার স্যার।'

গাল-কাটা সেলিমরাও কপালে হাত ঠেকায়, 'নমস্কার।'

নিখিলেশ একটা হাত সামান্য একটু তোলেন। মুখে কিছু বলেন না।

তারক বলে, 'স্যার, কালকেই খবর পেয়েছিলাম, আপনি তালবনিতে এসেছেন।'

নিখিলেশ উত্তর দিলেন না।

তারক এবার বলল, 'ভোটের রেজাল্ট বেরুবার পর এই প্রথম এখানে এলেন। শুনেছিলাম, আপনার শরীর খুব খারাপ হয়েছিল।'

নিখিলেশ আস্তে মাথা নাড়লেন। তারকদের নাড়িনক্ষত্রের সব খবর তাঁর কাছে অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। তবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আজকাল কী করছ?'

তারক বলল, 'কী আর করব স্যার। আপনি তো ডাহা ফেল করলেন। জিতলে আপনার গায়ে জোঁকের মতো সেঁটে থাকতাম। ব্যাড লাক।' একটু থেমে বলল, 'তাই নিবারণবাবুর টেন্টে ভিড়ে গেছি।'

নিখিলেশ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

তারক থামেনি, 'আপনি স্যার আমাদের নিমকহারাম বলতে পারেন কিন্তু উপায় নেই। ঝামেলায় পড়লে পুলিশের ঝঞ্ঝাট থেকে আমাদের কে বাঁচাবে?'

নিখিলেশ এবারও চুপ।

তারক তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রতিক্রিয়াটা বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর বলতে লাগল, ফল মারা পার্টিকে পুলিশ পাত্তা দেয় না।'

তারকের কথায় কোনও মারপ্যাঁচ নেই। যা সে ভাবে সেটা স্পষ্টাস্পষ্টি মুখের ওপর বলে দেয়। এতে কে কী মনে করল তার এতটুকু তোয়াক্কা করে না।

নিখিলেশ নিঃশব্দে তারককে লক্ষ করতে লাগলেন।

তারক এবার বলল, 'আমি স্যার স্ট্রেট কথার লোক। যদ্দিন আপনার নুন খেয়েছি,

আপনার জন্যে জান লড়িয়ে দিয়েছি। এখন নিবারণ হালদারের নুন স্টমাকে যাচ্ছে। তাঁর হয়ে লড়ব। যদি এমন হয়, পরের বারের ভোটে নিবারণবাবু হড়কে গেছেন, জার্সি পালটাতে একদিনও লাগবে না।'

তারক বুঝিয়ে দিয়েছে, আগামী নির্বাচনের ফল বেরুবার পর তেমন বুঝলে নিবারণ হালদারকে ছেড়ে তাঁর শিবিরে চলে আসতে দু'বার চিন্তা করবে না। অর্থাৎ দু'দিকের রাস্তাই সে খোলা রাখছে। নিজেদের মাথা বাঁচাতে একবার এদিকে, একবার ওদিকে — এই যাওয়া-আসার খেলাটা ওরা চালিয়ে যাবে। রাজনীতির এই দুর্বৃত্তায়নের যুগে এখন এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিখিলেশ বললেন, 'তোমরা যেখানে যাচ্ছিলে যাও—'

নিজেদের মোটর বাইকগুলোর দিকে যেতে যেতে তারক জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কদ্দিন থাকছেন স্যার?'

'দেখি—'

'নিবারণ হালদারের ক্যাম্পে 'ইন' করেছি। এখন আপনার সঙ্গে আলাদা করে লুকিয়ে দেখা করতে পারব না। বুঝতেই পারছেন, খবরটা নিবারণ স্যারের কানে গেলে গড়বড় হয়ে যাবে।'

'একথা উঠছে কেন? আমি কি তোমাকে দেখা করতে বলেছি?'

'তা করেন নি। তবে অনেকদিন আপনার ভালবাসা টাসা পেয়েছি। আপনার নাম করে কত সময় পুলিশের হাত থেকে চামড়া বাঁচিয়েছি। অন্য ক্যাম্পে ভিড়লেও একসময় আপনার কেনা গোলাম হয়ে ছিলাম। আপনি এসেছেন, দেখা করতে ইচ্ছে হবে না? কিন্তু হাত-পা বিলকুল বাঁধা। সবই বুঝতে পারছেন স্যার। তবে —'

'তবে কী?'

'যে ক'দিন আছেন রাস্তা ফাস্তায় দেখা নিশ্চয়ই হবে।'

তারকের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না নিখিলেশের। নীরস সুরে বললেন, 'আমার একটা জরুরি কাজ আছে। এবার যেতে হবে—'

'ঠিক আছে স্যার—'

আবার স্যালুট ঠুকে তারকরা মোটর বাইকগুলো একধারে ঠেলে সরিয়ে পথ করে দিয়ে রিকশাওলাকে বলল, 'যাও—'

এক কালে নিখিলেশের নুন খেয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও খাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই তাঁকে এই খাতিরটুকু করল তারকরা। নইলে রিকশাওলার কপালে আজ চূড়ান্ত দুর্ভোগ ছিল।

ফের চলা শুরু হল।

একসময় বাঁ ধারের সেই রাস্তাটার কাছে চলে এল সাইকেল রিকশা। নিখিলেশের মনে পড়ে গেল, কাল এটার ভেতর থেকেই মোটর বাইক হাঁকিয়ে বেরিয়ে এসেছিল তারকরা আর তাদের পেছন পেছন কাতর সুরে কিছু বলতে বলতে ক'টা লোক উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটছিল। তারকরা কী ধরনের দুষ্কর্ম করতে পারে তা জানার জন্য কাল

খুবই কৌতূহল হচ্ছিল কিন্তু তখন শরীর এত ক্লান্ত যে খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। তা ছাড়া সঙ্গে যোগেন মাস্টার ছিলেন, তিনি তাঁকে সাইকেল রিকশা থেকে কিছুতেই নামতে দিতেন না।

এই মুহূর্তে নিখিলেশ স্থির করে ফেললেন, কালকের ঘটনাটা তাঁকে জানতেই হবে। রিকশাওলাকে বললেন, 'বাঁ দিকের রাস্তায় যাও—'

সাইকেল রিকশার মুখ ঘুরে গেল। যথারীতি নিখিলেশ হাতজোড় করে বসে আছেন।

এই রাস্তাতেও বেশ লোকজন দেখা যাচ্ছে। তারা থোকায় থোকায় এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় কথা বলছিল। সবার চোখেমুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। হঠাৎ নিখিলেশকে দেখে তারা অবাক। কাল ট্রেন থেকে নামার পর যারাই তাঁকে দেখেছে তাদের চোখেমুখে এই বিস্ময়টা লক্ষ করেছেন নিখিলেশ।

এই রাস্তার লোকগুলো হয়তো তাঁর তালবনিতে আসার খবর আগে পায়নি, কিংবা পেলেও তিনি যে এই সকালবেলায় এখানে আসবেন, ভাবতে পারেনি।

নিখিলেশ একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে খানিকক্ষণ আগে মোটর বাইকে করে ক'টা ছেলে এসেছিল?'

লোকটা সাইকেল রিকশার কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'হ্যাঁ স্যার। তারক আর তার গ্যাং; আপনার হয়ে যারা দু'বার ভোটের কাজ করেছে।'

গায়ে একবার নোংরা পাঁক লাগলে সহজে তার দুর্গন্ধ মুছে ফেলা যায় না। সারা জীবন হয়তো তাঁর নামের সঙ্গে তারকরা জুড়ে থাকবে। এই অ্যান্টি-সোসালগুলোকে একদিন তিনি যে নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করেছিলেন সেটা তালবনির মানুষ আদৌ ভুলে যাবে বলে মনে হয় না।

নিখিলেশ খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। লোকটা আবার বলে উঠল, 'তারকরা কালও এসে ভৌমিকদের শাসিয়ে গেছে।'

তালবনিতে ভৌমিক পদবিওলা মানুষ কম নেই। লোকটা কোন ভৌমিকদের কথা বলছে, নিখিলেশ বুঝতে পারলেন না। চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'শাসিয়ে গেছে কেন?'

লোকটার হঠাৎ যেন হুঁশ হল, নিখিলেশকে যতটা বলা উচিত তার চেয়ে বেশিই বলে ফেলেছে। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তা জানি না।'

লোকটা যে খুব ভাল করেই জানে সেটা ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'ভৌমিকদের বাড়ি কোনটা?'

লোকটা সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'ওদিকে —' বলেই লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল।

ভৌমিকদের বাড়ি খুঁজে বার করতে অসুবিধা হল না। রাস্তা ধরে খানিকটা এগুলে ডান দিকে মোড়ের মাথায় বিরাট কমপাউন্ডওলা হলুদ রঙের দোতলাটাই হল সেই বাড়ি।

নিখিলেশের মনে পড়ে গেল, নির্বাচনী প্রচারের সময় ছাড়াও অনেক আগে কয়েক

বার এখানে এসেছেন। যতদূর মনে আছে এঁদের একান্নবর্তী পরিবার। তালবনি টাউনে প্রচুর জমিজমাও ছিল। বাড়ির সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটির নাম খুব সম্ভব নীলকমলবাবু। তিনি বেঁচে আছেন কিনা, কে জানে।

ভৌমিকবাড়ির সামনেও বেশ বড় একটা জটলা। প্রতিবেশীরা ভিড় করে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছে। উত্তেজনার সঙ্গে অবশ্য মেখানো রয়েছে ভয় ভয় ভাব।

রিকশাওলাকে অপেক্ষা করতে বলে নেমে পড়লেন নিখিলেশ। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ যাট জোড়া চোখ তাঁর ওপর এসে পড়ল। লোকগুলোর দৃষ্টিতে যথারীতি বিস্ময়। সবার উদ্দেশে হাতজোড় করে ভৌমিক বাড়ির বড় লোহার গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন নিখিলেশ।

গেটটা খোলা ছিল। ভেতরেও অনেককে দেখা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে এ বাড়ির লোকজনও রয়েছে। নিখিলেশকে দেখে তারা এগিয়ে এল।

নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'নীলকমলবাবু আছেন?'

মধ্যবয়সী একটি লোক এগিয়ে এসে বলল, 'আছেন। আসুন—আসুন—'

'আপনি?'

'আমি ওঁর ছোট ভাই। আমার নাম লালকমল ভৌমিক।'

একতলার বড় বৈঠকখানায় একটা সেকেলে ভারী সোফায় আধশোয়ার মতো করে রয়েছেন নীলকমল। তাঁকে ঘিরে বাড়ির মহিলা, পুরুষ এবং বাচ্চা-কাচ্চা ছাড়াও আশেপাশের বাড়ির লোকজন রয়েছে।

নীলকমলকে দেখামাত্র চিনতে পারলেন নিখিলেশ। পঁচাত্তর ছিয়াত্তরের মতো বয়স। তবে স্বাস্থ্য ভেঙেচুরে গেছে। তাঁকে খুব বিধ্বস্ত এবং অবসন্ন দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছে, তাঁর ওপর দিয়ে তুমুল ঝড় বয়ে গেছে।

নীলকমলও নিখিলেশকে চিনতে পেরেছিলেন। ধড়মড় করে উঠে বসতে গেলেন তিনি, কিন্তু পারলেন না। বললেন, 'কী সৌভাগ্য! বসুন — বসুন —'

নিখিলেশ বললেন, 'আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। যেমন ছিলেন তেমনি শুয়ে থাকুন।'

নীলকমল বললেন, 'হঠাৎ আমাদের বাড়ি! চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না।' লালকমলকে বললেন, 'শীগ্‌গির চায়ের ব্যবস্থা কর!'

কাল তালবনিতে পা দেবার পর যাদের সঙ্গেই দেখা হয়েছে তাদের সবার চোখেই অসন্তোষ আর ক্ষোভ লক্ষ করেছেন নিখিলেশ। মনে হয়েছে তিনি এ অঞ্চলে অবাঞ্ছিত। কিন্তু ভৌমিক বাড়িতে অভিজ্ঞতাটা অন্য রকম হল। এঁরা অবাক হলেও বহুকালের পরিচিত, বিখ্যাত মানুষটিকে দেখে অখুশি হননি।

মুখোমুখি একটা সোফায় বসতে বসতে নিখিলেশ বললেন, 'আপনি খবর পেয়েছেন কিনা, জানি না। আমার দু'বার স্ট্রোক হয়ে গেছে। তারপরও আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমার খাওয়া-দাওয়ার ভীষণ রেস্ট্রিকশন। এ সময় আমি কিছু খাই না।' লালকমলকে বললেন, 'দয়া করে বাড়ির মেয়েদের ব্যতিব্যস্ত করবেন না।'

নীলকমল বললেন, 'খাওয়া-দাওয়া যখন এত ধরা-বাঁধা, থাক তা হলে—' একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, 'তালবনিতে কবে এলেন?'

'কাল।'

'কোথায় উঠেছেন— গেস্ট হাউসে?'

নিখিলেশ জানালেন, কোথায় আছেন।

নীলকমল বললেন, 'এত কষ্ট করে আমাদের বাড়ি এলেন। কোনও দরকার থাকলে কাউকে দিয়ে খবর দিলে আমিই গিয়ে দেখা করতাম, কি ভাইদের পাঠিয়ে দিতাম।'

নিখিলেশ বললেন, 'মিনিট দশ পনেরো আগেও জানতাম না আপনাদের এখানে আসতে হবে। বড় রাস্তা দিয়ে রিকশায় করে যেতে যেতে এমন একটা কারণ ঘটল যে সঙ্গে সঙ্গে চলে এলাম।'

ব্যাপারটা বোধগম্য হচ্ছিল না নীলকমলের। জিজ্ঞেস করলেন, 'কারণটা কী?'

ভৌমিকবাড়ির সামনের রাস্তায় যারা জটলা করছিল সেই উৎসুক জনতা এখন বৈঠকখানার দরজা আর জানালার কাছে ভিড় করে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। একজন প্রাক্তন মন্ত্রী এবং এ অঞ্চলের জননেতা, বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে কেন এখানে হাজির হলেন সে সম্বন্ধে তাদের অপার কৌতূহল। দ্রুত একবার তাদের দেখে নিয়ে নিখিলেশ বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে চাই। ভাইরা অবশ্য থাকতে পারে। অন্যেরা থাকলে —'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে দুই ভাই লালকমল আর সুকমল ছাড়া বাকি সবাইকে চলে যেতে বললেন নীলকমল।

বৈঠকখানা এবং তার চারপাশ ফাঁকা হয়ে গেলে নিখিলেশ তারকদের কথা বললেন। কাল বিকেলে যখন তিনি যোগেন মাস্টারের সঙ্গে সাইকেল রিকশায় করে ওঁদের বাড়ি যাচ্ছেন তখন ওই অ্যান্টি-সোসালগুলোকে ভৌমিকদের বাড়ির রাস্তা থেকে মোটর বাইক হাঁকিয়ে বেরুতে দেখেছেন। তারকদের পেছনে কারা যেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছিল। আজও যখন নিখিলেশ এই রাস্তাটার কাছাকাছি এসে পড়েছেন, তারকদের দেখতে পান। তাঁর মনে হয়েছে, এখানে ওরা কিছু একটা হাঙ্গামা বাধিয়েছে। লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন তারকরা ভৌমিকদের বাড়িতে চড়াও হয়েছিল।

নিখিলেশ আরও বললেন, 'আমার মনে হয়েছে ওই অ্যান্টি-সোসালগুলো আপনাদের ওপর দু'দিনই জুলুম করতে এসেছিল।'

নীলকমল বললেন, 'এই দু'দিনই না, মাসখানেক ধরে ওরা উৎপাত চালাচ্ছে। আমাদের জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।'

নিখিলেশকে উদ্বিগ্ন দেখাল। জিজ্ঞেস করলেন, 'এর কারণটা কী?'

হাতে ভর দিয়ে বেশ কষ্ট করেই ধীরে ধীরে উঠে বসলেন নীলকমল, 'রাস্তায় তো প্রচুর লোক জমে আছে। কারও কাছে কিছু শোনেন নি?'

নিখিলেশ বললেন, 'না। জিজ্ঞেস করেছিলাম, সবাই এড়িয়ে গেল। কেউ মুখ খুলতে চাইছে না।'

'বুঝতে পারছি, ওই তারকদের ভয়ে। যদি টের পায় ওদের নামে লাগানো হয়েছে, হামলা করবে।'

'এবার বলুন আপনাদের ওপর উৎপাতের উদ্দেশ্যটা কী?'

একটু চুপ করে রইলেন নীলকমল। তারপর শুরু করলেন, 'স্টেশনের গায়ে আমাদের সতেরো কাঠার মতো জমি আছে। এক প্রোমোটার ওখানে একটা চারতলা সুপার মার্কেট করতে চায়। বারকয়েক আমদের বাড়ি এসে জমিটা ওদের কাছে বেচে দিতে বলল। আমরা রাজি হইনি। তখন ওরা তারকদের লেলিয়ে দিলে। কাল এসে অ্যান্টি-সোসালগুলো শাসিয়ে গেল, জমি ওই প্রোমোটারকে না দিলে তার ফল খুব খারাপ হবে। কাল আপনি যাদের তারকদের পেছনে দৌড়ুতে দেখেছিলেন তারা হল সুকমল, নীলকমল আর আমার দুই ভাইপো। ওরা তারকদের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করেছে কিন্তু কাজ হয়নি। আজ খানিক আগে এসে হুমকি দিয়েছে, তিনদিনের ভেতর জমি না বেচলে আমাদের লাশ ফেলে দেবে। শুনে আমার শরীর এত খারাপ লাগছিল, মনে হল স্ট্রোক হয়ে যাবে। এই সোফায় শুয়ে পড়েছিলাম। তারপর তো আপনি এলেন।'

নিখিলেশ চমকে উঠলেন, 'বলেন কী!'

'ঠিকই বলছি। জায়গাটা একেবারে নরক হয়ে উঠেছে।' নীলকমল বলতে লাগলেন, 'প্রেমোটারদের যে জমি পছন্দ সেটা না পেলে তারকদের লাগিয়ে দেয়। ওরা বন্দুক দেখিয়ে মালিকদের বিক্রি করতে বাধ্য করে। শুধু প্রোমোটারদের হয়েই ওরা কাজ করে না, তাদের কমিশন না দিয়ে তালবনিতে কোনও জমি কেনাবেচা অসম্ভব। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'এখানে বাড়িটাড়ি করতে হলেও ওরা ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে বিল্ডিং মেটিরিয়াল কেনা যাবে না। ওরাই সব সাপ্লাই করবে। যত বাজে মালই হোক, আপনাকে তা মুখ বুজে নিতে হবে। প্রতিবাদ করার উপায় নেই।'

'পুলিশকে কেউ জানায় না?'

'লাভ নেই। ওরা এখন নিবারণ হালদারের ছাতার তলায় শেলটার নিয়েছে। ওদের গায়ে একটা আঙুল ঠেকানোর সাহস পুলিশের নেই।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর নীলকমল ফের বললেন, 'ল্যান্ড ডিলের ব্যাপারেই না, তালবনিতে যত অ্যান্টি-সোসাল অ্যাক্টিভিটি হয় সেগুলোর বেশির ভাগের সঙ্গেই ওরা যুক্ত। আপনি তো এখানে থাকেন না। থাকলে জানতেন, সমস্ত এলাকাটা তারকরা টেরোরাইজ করে রেখেছে। অপরাধ যদি না নেন, একটা কথা বলি—'

নিখিলেশ কিছু না বলে নীলকমলের মুখের দিকে তাকালেন।

নীলকমল বলতে লাগলেন, 'এর জন্যে আপনিও অনেকটা দায়ী। এই বন্দুকবাজগুলো আপনার জন্যেই প্রথম পলিটিকসে আসতে পেরেছে। রাজনৈতিক প্রোটেকশন না পেলে খুনে-গুণ্ডারা কতটা সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠতে পারে? আমরা যারা তালবনিতে থাকি তারা

খুবই বিপন্ন নিখিলেশবাবু।'

প্রায় এই কথাগুলোই অনেকদিন আগে যোগেন মাস্টারও বলেছিলেন। নিখিলেশ নিজেও জানতেন, অ্যান্টি-সোসালদের রাজনীতিতে টেনে আনা ঠিক নয়। চোখ নামিয়ে বিষণ্নভাবে আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন তিনি।

হঠাৎ নীলকমলের মনে হল, এমন চাঁছাছোলা ভাষায় অপ্রিয় কথাগুলো না শোনালেই ভাল হ'ত। হাতজোড় করে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'ক্ষমা করবেন। আপনি বহুকাল পর আমাদের বাড়ি এসেছেন। মাননীয় অতিথিকে এভাবে বলা ঠিক হয়নি। আসলে আমার মাথার ঠিক নেই।'

একথার উত্তর না দিয়ে নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের ওই স্টেশনের কাছের জমিটা নিয়ে কী করবেন ঠিক করেছেন?'

'কিছুই ভাবতে পারছি না।' অসহায়ভাবে নীলকমল বললেন, 'যেভাবে তারকরা শাসিয়ে যাচ্ছে তাতে হয়তো শেষ পর্যন্ত —' বলতে বলতে চুপ করে গেলেন।

নিখিলেশ বললেন, 'তারকদের প্রেসারে বা হুমকিতে আপনারা কিছুতেই জমি বেচবেন না।'

নীলকমলকে কেমন যেন দিশেহারার মতো দেখাল। তিনি বললেন, 'কিন্তু—'

'আপনাদের কোনও ভয় নেই। আমি তো আছি।' দৃঢ় স্বরে নিখিলেশ বলতে লাগলেন, 'কয়েক বছরে তালবনির মানুষের অনেক ক্ষতি হয়েছে। এখানে জঙ্গলের রাজত্ব আর চালাতে দেওয়া হবে না।'

নীলকমল বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন। তাঁর সামনে বসে থাকা প্রাক্তন মন্ত্রীটি ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, তারকদের মতো মারাত্মক অ্যান্টি-সোসালদের নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করেছিলেন। তখন এঁদের প্রশ্রয়ই দিয়েছেন। তাঁর আশ্রয়ে থাকার সময় এরা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের শান্তশিষ্ট সুসভ্য নাগরিক হয়ে গিয়েছিল, এমন ভাবার কারণ নেই। এরা দুষ্কর্ম করলেও তিনি চোখ বুজে থাকতেন। একদা যারা ছিল তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী, নির্বাচনে যাদের ওপর তাঁকে নির্ভর করে থাকতে হয়েছে, আজ তাদের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন নিখিলেশ। ভৌমিকরা এর হেতুটা বুঝে উঠতে পারছিল না।

বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগল নীলকমলের। তারপর দ্বিধান্বিতভাবে বললেন, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনি তো কলকাতায় ফিরে যাবেন। ওরা হামলা করলে তখন আপনাকে পাচ্ছি কোথায়?'

ঠিক এই আশঙ্কার কথাগুলোই খানিক আগে রিকশাওলাটা তাঁকে বলেছিল। কলকাতা থেকে তালবনিতে আসার সময় নিখিলেশ ভেবেছিলেন, খুব বেশি হলে তিন চার দিন এখানে কাটিয়ে যাবেন। এই মুহূর্তে মনে মনে নতুন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হল তাঁকে। বললেন, 'আপাতত বেশ কিছুদিন আমি থাকছি। ফের যদি তারকরা আপনাদের শাসাতে আসে, আমাকে খবর দেবেন।'

একজন পরাজিত জননেতা, যাঁদের দল শাসন ক্ষমতায় আর নেই, তাঁর পক্ষে কতটা সাহায্য করা সম্ভব, তাঁর ওপর কতখানি নির্ভর করা উচিত, সে সম্পর্কে সংশয় থাকেই। তাছাড়া তারকরা এখন ক্ষমতাসীন পার্টির খাতায় নাম লিখিয়েছে। যদিও নিখিলেশ একদা এ অঞ্চলের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় জননায়ক ছিলেন, পুরো দশটি বছর মন্ত্রিত্বও করেছেন, তবু তাঁর পক্ষে আদৌ কিছু করা সম্ভব হবে কিনা, কে জানে। যতদিন কেউ ক্ষমতায় থাকেন, তিনি একটা আঙুল তুললে চারপাশের পৃথিবী তোলপাড় হয়ে যায়। তাঁর হুকুম তামিল করার জন্য হাজার মানুষ হাতের কাছে মজুদ থাকে। ক্ষমতাটি যেই মুঠোর ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল, তখন তাঁর দাম কানাকড়িও না। পুলিশ-প্রশাসন, তখন কেউ তাঁকে সেরকম গুরুত্ব দেয় না। এটাই জাগতিক নিয়ম।

এই নির্মম কথাগুলো মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল, কোনও রকমে সামলে নিলেন নীলকমল।

নিখিলেশ বললেন, 'আজ উঠছি। পরে আবার দেখা হবে।'

নীলকমলরা রাস্তা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলেন। নিখিলেশ সাইকেল রিকশায় উঠে বললেন, 'দুশ্চিন্তা করবেন না। যা বলেছি সেটা মনে রাখবেন। জমিটা কিছুতেই প্রোমোটারের হাতে যেন না যায়।' একটু থেমে বললেন, 'ওই সব অ্যান্টি-সোসাল জীবগুলো বেসিক্যালি ভীরু। যদি সবাই মিলে রুখে দাঁড়ান পালাতে পথ পাবে না।'

সাত

চৈত্র মাসের সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছিল। এর মধ্যে রোদের ঝাঁঝ ভীষণ বেড়ে গেছে। উলটো পালটা তপ্ত বাতাস তালবনির ওপর দিয়ে আগুন ছড়াতে ছড়াতে বয়ে যাচ্ছে।

কাল তবু আকাশে এলোমেলো কিছু মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল। আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। গোটা আকাশ অসহ্য তাপে যেন গনগন করছে। সেদিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়।

ভৌমিক বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর কোথাও গেলেন না নিখিলেশ। সোজা নতুন পল্লীতে যোগেন মাস্টারের বাড়ি ফিরে এলেন।

যোগেন মাস্টার ছিলেন না, অনেক আগেই স্কুলে চলে গেছেন। আরতি উদ্বিগ্ন মুখে অপেক্ষা করছিলেন।

হাঁটাহাঁটি প্রায় কিছুই হয়নি। সাইকেল রিকশায় গেছেন, এসেছেন। তবু মারাত্মক গরমে নিখিলেশ এতই ঘেমেছেন যে জামাটামা ভিজে গেছে। তিনি ঘরে গিয়ে বসতেই ছুটে এসে আরতি ফুল স্পিডে ফ্যান চালিয়ে দিলেন। বললেন, 'আপনার শরীর ভাল না। চৈত্র মাসের রোদে এত ঘোরাঘুরি ঠিক নয়।'

নিখিলেশ হাসলেন। আরতির উৎকণ্ঠাটুকু ভাল লাগল। এঁদের কথাবার্তা আচরণ একান্ত আপনজনের মতো — যেমন আন্তরিক তেমনি সহৃদয়। বললেন, 'ধকল তেমন কিছু হয়নি। চড়া রোদ বলে ঘেমে গেছি।'

আরতি বললেন, 'বিশ্রাম করুন। তারপর স্নান টান করে খেয়ে ঘুমোন। আপনার বন্ধু ওবেলা আপনাকে বেরুতে বারণ করে গেছে।'

হেসে হেসে নিখিলেশ বললেন, 'ঠিক আছে, বেরুব না। আচ্ছা, কেউ কি আমার খোঁজ টোজ করেছে?'

'হ্যাঁ। আপনাদের পার্টির সত্যজিৎবাবুরা সকালে আপনি বেরিয়ে যাবার পর এসেছিলেন।'

'ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।'

'অনেকে ফোনও করেছিল। তারা জানতে চেয়েছে, আপনি কখন বাড়িতে থাকবেন? আমি ওদের বিকেলে ফোন করতে বলেছি।'

'ওরা কারা?'

'নাম বলেনি।'

'ঠিক আছে।'

'আমি এখন যাচ্ছি।' আরতি দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ কী ভেবে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আসল কথাটা বলতেই ভুলে গেছি।'

'কী?' উৎসুক চোখে তাকালেন নিখিলেশ।

'অনুপমাদি ফোন করেছিলেন।'

'সে কী! সকালেই তো ওর সঙ্গে কথা বলেছি। এর ভেতর আবার কী হল?'

আরতি বললেন, 'তা জানি না। বললেন, উনি নিজেই আপনার ওষুধ, জামাকাপড় টাপড় নিয়ে বিকেলে আসছেন।'

নিখিলেশ বললেন, 'ওর শরীর তেমন ভাল যাচ্ছে না। কাঁধে আর ডান পায়ের হাঁটুতে আর্থারাইটিসের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। শুধু শুধু কষ্ট করে আসার কী দরকার ছিল? কাউকে দিয়ে কাপড়চোপড় পাঠিয়ে দিলেই তো হ'ত।'

আরতি বললেন, 'আমিও তাই বলেছিলাম। অনুপমাদি বললেন, শুধু ওষুধ টোষুধ দিতেই আসছেন না। আপনার সঙ্গে তাঁর কী সব আর্জেন্ট কথাবার্তা আছে।'

নিখিলেশ ভেবে দেখলেন, সাড়ে সাতটা কি আটটায় ফোন করেছিলেন তিনি। এখন বাজে পৌনে একটা। মাঝখানের ঘন্টা পাঁচেক সময়ের ভেতর নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছে যা অনুপমার পক্ষে আরতিকে ফোনে জানানো সম্ভব হয়নি।

আরতি আবার বললেন, 'অনুপমাদি অবশ্য জানতে চাইছিলেন আপনি কখন ফিরবেন। আমি বলেছি, তার ঠিক নেই। তবে দুপুরে এসে খাওয়ার কথা আছে। উনি বললেন, আমি এখনই বেরিয়ে পড়ছি।'

'ও—'

আরতির হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেল। বললেন, 'আর একজনের কথা বলতে একদম ভুলে গেছি।'

নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কার কথা?'

'ওই যে 'তালবনি সমাচার'-এর এডিটর—কী যেন নামটা—'

'অরিজিৎ —অরিজিৎ মাইতি।'

'হ্যাঁ। উনিও ফোন করেছিলেন। কাল, না হলে পরশু আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

'ঠিক আছে।'

আরতি আর দাঁড়ালেন না, রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

নিখিলেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। নিশ্চয়ই গুরুতর এমন কিছু ঘটেছে যাতে তাঁর ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেননি অনুপমা; তালবনিতে আসার জন্য বেরিয়ে পড়েছেন। কী এমন ঘটতে পারে? চিন্তাটাকে নানাদিকে ছড়িয়ে দিয়েও কিছুই আঁচ করা যাচ্ছে না। গভীর এক উৎকণ্ঠা চারপাশ থেকে তাঁকে ঘিরে ধরতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর আরতি এসে তাড়া দিতে স্নান করে, খেয়ে, নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন নিখিলেশ।

আরতিও নিখিলেশের সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন। তিনি জানালাগুলো বন্ধ করে পর্দা টেনে দিলেন। তারপর বাইরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

বাইরের তপ্ত বাতাস এখন আর ঘরে ঢুকতে পারছে না। ভেতরে স্নিগ্ধ অন্ধকারের সৃষ্টি হয়েছে। গরমটা আগের মতো আর অসহ্য লাগছে না।

যদিও দৈহিক পরিশ্রম তেমন কিছু হয়নি, তবু ভৌমিকদের বাড়ি গিয়ে তারকদের জুলুমবাজির কথা শোনার পর থেকে স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর ভীষণ চাপ পড়ছিল। ভেতরে ভেতরে তিনি অনেকখানি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল শরীরের ওপর। সর্বগ্রাসী এক অবসাদ তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চারিয়ে যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে নিখিলেশের দু'চোখের পাতা জুড়ে আসতে লাগল।

ঘুম ভাঙল আরতির ডাকে, 'উঠুন নিখিলেশদা, দেখুন কে এসেছেন—'

ধড়মড় করে উঠে বসলেন নিখিলেশ। চোখে পড়ল, ভেজানো দরজাটা খুলে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন আরতি এবং তাঁর পাশে অনুপমা।

ব্যস্তভাবে বিছানা থেকে নামতে নামতে নিখিলেশ বললেন, 'আসুন বৌদি, এস অনুপমা। তোমরা একটু ব'সো। আমি চট করে চোখে মুখে জল দিয়ে আসি।' বলে বেরিয়ে গেলেন।

আরতি আর অনুপমা ভেতরে ঢুকলেন। আরতি জানালাগুলো খুলে দিতে ঘর আলোয় ভরে গেল। চৈত্রের দিন শেষ হয়ে আসছে। রোদের রং এখন বাসি হলুদের মতো। চারপাশের বাড়ি এবং গাছের ছায়া অনেক দীর্ঘ হয়েছে। দুপুরের উত্তাপ আর নেই।

নিখিলেশ বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখলেন অনুপমা খাটের একধারে বসে আছেন। একটু দূরে একটা বড় সুটকেশ দাঁড় করানো। বোঝা গেল, কলকাতা থেকে তিনি ওটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

আরতি অনুপমাকে কিছু বলছিলেন। নিখিলেশকে দেখে বললেন, 'আপনারা কথা বলুন, আমি চা করে আনি।'

আরতি চলে যেতে বিছানার আর এক প্রান্তে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসে এলে?'

অনুপমা বললেন, 'গাড়িতে। পল্টু ড্রাইভার সুদ্ধু একটা মারুতি পাঠিয়ে দিয়েছিল।'

নিখিলেশের নিজস্ব গাড়ি নেই। মন্ত্রী থাকার সময় সরকারি গাড়িতে চলাফেরা করতেন। তবে মাঝে মাঝেই পল্টুরা দামি গাড়ি পাঠিয়ে দিত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক সময় সেগুলোতে চড়তে হ'ত নিখিলেশকে। নির্বাচনের সময় ওদের গাড়িতে করেই তাঁর ভোটকর্মীরা তালবনিতে প্রচার করে বেড়াত। নিখিলেশের আপত্তি ওরা কানে তুলত না।

এবার ইলেকশানের পর সরকারি ক্ষমতা যখন হাতছাড়া হয়ে গেল, পল্টুরা চব্বিশ ঘন্টার জন্য তার একটা মারুতি-জিপসি বা অ্যামবেসেডর সল্ট লেকের বাড়িতে রাখতে চেয়েছিল। নিখিলেশ রাজি হননি। অবশ্য অসুস্থ হয়ে পড়লে পল্টুদের গাড়িতে করে বারকয়েক নানা রকম পরীক্ষার জন্য নার্সিং হোমে গিয়েছিলেন। ছেলেদের গাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এটুকুই। গাড়ি কেন, ওদের কাছে তিনি কখনও কিছু চান নি।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিখিলেশ বললেন, 'পল্টুর কাছে তুমি গাড়ি চেয়েছিলে?'

অনুপমা বললেন, 'না। ও নিজে এসে দিয়ে গেছে। বলেছে, আজই যেন আমি তোমার সঙ্গে তালবনিতে এসে দেখা করি। একরকম জোরই করতে লাগল। নইলে —'

'নইলে কী?'

'অন্য কাউকে দিয়ে তোমার কাপড় আর ওষুধ টোষুধ পাঠিয়ে দিতাম। কিন্তু ওর তাড়ায় আসতেই হল।'

নিখিলেশকে চিন্তিত দেখাল। তাঁর কাছে অনুপমাকে জোর করে পাঠানোর মধ্যে নিশ্চয়ই ছেলের কোনও উদ্দেশ্য আছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'হঠাৎ পল্টু তোমাকে আমার কাছে পাঠাল কেন?'

অনুপমা বললেন, 'ওরা ভীষণ বিপদে পড়েছে।'

নিখিলেশ চকিত হয়ে উঠলেন। তাকিয়েই ছিলেন, এবার স্ত্রীকে ভাল করে লক্ষ করলেন। অনুপমা কেমন যেন বিচলিত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ভেতরে ভেতরে একটা চাপা অস্থিরতা চলছে। আর সেটা তাঁর মুখে চোখে ফুটে বেরিয়েছে।

স্ত্রীর উদ্বেগ নিখিলেশের মধ্যেও খানিকটা চারিয়ে গিয়েছিল। বললেন, 'কিসের বিপদ?'

'তুমি আজকের কাগজ পড় নি?'

'না। সকালে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। এখানে কলকাতার কাগজ দুপুরে আসে। আমার ফিরতে ফিরতে প্রায় একটা বেজে গিয়েছিল। খুব ক্লান্তি লাগছিল। তাই খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, বিকেলে উঠে পড়ব। তার আগেই তুমি এলে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কাগজ পড়ার কথা বললে কেন? খারাপ কোনও খবর বেরিয়েছে?'

অনুপমা বললেন, 'সেটা পড়লেই বুঝতে পারবে।'

'তুমি ব'সো। আমি আরতি বৌদির কাছ থেকে আজকের কাগজটা নিয়ে আসি।'

'দরকার নেই।'

'মানে—'

'কলকাতা থেকে যত ইংরেজি আর বাংলা কাগজ বেরোয়, পন্টু তার একটা করে কপি তোমাকে দেখানোর জন্যে আমার সঙ্গে দিয়েছে। সেগুলো বার করছি।'

অনুপমা সুটকেশ খুলে এক গোছা কাগজ বার করে এনে নিখিলেশকে দিলেন।

প্রতিটি কাগজের প্রথম বা তৃতীয় পাতায় পন্টুদের নানা কোম্পানির মারাত্মক ধরনের এমন সব আর্থিক গোলমালের খবর বেরিয়েছে যার সঙ্গে জনস্বার্থ জড়িত। ব্যাঙ্ক, এল আই সি, বা সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শিল্প এবং ব্যবসার জন্য যে ঋণ ওরা নিয়েছিল তার একটি পয়সাও এখন পর্যন্ত ফেরত দেয় নি। বিদেশি মুদ্রা সংক্রান্ত আইনও ওরা ভেঙেছে। পন্টুদের বিরুদ্ধে ইত্যাকার বহু অভিযোগ।

এর আগেও পন্টুদের সম্বন্ধে এ জাতীয় প্রতিবেদন দু-একবার বেরিয়েছে। তখন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, নিখিলেশের নাম ভাঙিয়ে ছেলেমেয়েরা নানা সুযোগ সুবিধা আদায় করছে। এদের সঙ্গে তাকেও কিছুটা জড়ানো হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তাঁর সততা, জনগণের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা এ সব নিয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন তোলে নি।

কিন্তু নিখিলেশের দিকে প্রতিটি পত্রিকা এবার স্পষ্ট আঙুল তুলেছে। তারা চাঁছা-ছোলা, শাণিত ভাষায় লিখেছে তাঁর সায় এবং সক্রিয় সহযোগিতা না থাকলে কোনওভাবেই ছেলেমেয়েরা রাতারাতি ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে কোটি কোটি টাকা তুলতে পারত না। পারত না কয়েক একর দামি সরকারি জমি দখল করতে।

শুধু ছেলেদেরই নয়, কাগজগুলো লিখেছে, মোহনদাস পারেখ এবং প্রভুদয়াল মোদির মতো বড় বড় ব্যবসায়ী তার শিল্পপতিদেরও তিনি প্রচুর টাকা আর জমি পাইয়ে দিয়েছেন।

কোনও দিন যে দোষারোপ কেউ করতে পারে নি, প্রতিটি কাগজ বিন্দুমাত্র রাখঢাক না করে তাই করেছে। তারা লিখেছে, ছেলেমেয়েদের জন্য নিখিলেশ এতকালের আদর্শ বিসর্জন দিয়েছেন। অন্ধ সন্তানস্নেহ একটি মানুষকে কতটা দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলে, কতখানি নিচে নামিয়ে আনতে পারে, নিখিলেশ মজুমদার তার জ্বলন্ত উদাহরণ। একটা কাগজ লিখেছে, ডক্টর জেকিল এবং মিস্টার হাইডের মতো তাঁর দুটো মুখ। বাইরে তিনি আদর্শবাদী, নিষ্ঠাবান একজন জননেতা। এই চেহারায় বছরের পর বছর দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে এসেছেন। কিন্তু মুখোশের আড়ালে তিনি অসৎ, ধান্দাবাজ এবং স্বার্থান্বেষী। সরকারি ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার করে ছেলেমেয়েদের কোটি কোটি টাকা কামানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু চিরকাল শাক দিয়ে মাছ ঢেকে রাখা যায় না। শেষ পর্যন্ত নিখিলেশ মজুমদারের আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছে। অবিলম্বে এই লোকটির দুর্নীতি সম্পর্কে ব্যাপক ইনভেস্টিগেশন শুরু করা উচিত।

শুধুমাত্র কাগজগুলোই নয়, গত নির্বাচনে জিতে যাঁরা এবার সরকারে এসেছেন,

তাঁরা নিখিলেশ এবং তাঁর ছেলেমেয়ের বিরুদ্ধে সি বি আই তদন্তের কথা নাকি ভাবছেন। তাঁদের বক্তব্য, জনসাধারণের টাকা লুটপাট করার অধিকার নিখিলেশবাবুকে কেউ দেয় নি। কৃতকর্মের জন্য তাঁর উপযুক্ত ফলভোগ করা দরকার। রাজনীতিতে এ জাতীয় অসৎ, ভ্রষ্ট লোকেরা থাকলে দেশের সমূহ সর্বনাশ হয়ে যাবে।

পড়া শেষ হলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন নিখিলেশ। টের পান নি, কখন সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। ভীষণ অসুস্থ বোধ করছিলেন তিনি। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, তাঁর রাজনৈতিক জীবন ধ্বংস করার জন্য গভীর চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে। এটা ঠিক, পন্টুদের সম্বন্ধে তিনি কখনও সেভাবে কঠোর হন নি। এই দুর্বলতার জন্য অনুপমা অনেকটাই দায়ী। যতবার পন্টুদের কাজকর্ম সম্বন্ধে আপত্তি জানাতে চেয়েছেন, তাঁকে বাধা দেওয়া হয়েছে। ছেলেমেয়েদের জন্য চারপাশ থেকে সংকট যে এমনভাবে ঘনিয়ে আসবে, ভাবতে পারেন নি নিখিলেশ।

একদিকে পায়ের তলা থেকে তালবনির জমি সরে গেছে, আরেক দিকে ছেলেমেয়েদের জন্য তাঁর নিষ্কলঙ্ক ইমেজের ওপর কালির বালতি উপুড় করে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। শেষ বয়সে জীবনের চরম বিপর্যয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন নিখিলেশ। মনে হচ্ছিল, মাথার ভেতর আগুনের চাকার মতো কী যেন ঘুরে যাচ্ছে।

অনুপমা পলকহীন স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, 'দেখলে?'

বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল নিখিলেশের। শরীরটা এলিয়ে দিয়ে অবসন্ন গলায় বললেন, 'হুঁ।'

অনুপমা বললেন, 'পন্টুরা বলছিল, ইনভেস্টিগেশন হলে বা সি বি আই এনকোয়ারি বসালে ওদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

অনুপমার কণ্ঠস্বরে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে বেরুচ্ছিল। বিচলিত, অস্থির, চিন্তাগ্রস্ত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নিখিলেশ বললেন, 'আমার পলিটিক্যাল লাইফ যে রুইনড হতে বসেছে সেটা লক্ষ করেছ? শুরু থেকেই পন্টুদের ব্যবসা বা ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে আমার আপত্তি ছিল। অনেকবার তা বলেছিও কিন্তু তুমি সবসময় ওদের আগলে রেখেছ। অন্ধ মাতৃস্নেহের পরিণতি কী দাঁড়িয়েছে, এবার দেখ। আমাদের হোল ফ্যামিলি এবার শেষ হয়ে যাবে।'

অনুপমা মুখ নিচু করে বসে রইলেন।

নিখিলেশ বলতে লাগলেন, 'সারা জীবন জ্ঞানত নিজের জন্যে কোনও অন্যায় সুযোগ নিই নি, যতদিন মন্ত্রী ছিলাম ক্ষমতার এতটুকু অপব্যবহার করি নি। এই শেষ বয়সে রোগে স্বাস্থ্য যখন ভেঙে গেছে, বিনা অপরাধে মানুষের কাছে আমার যখন কোনও ক্রেডিবিলিটি নেই, সেই সময় ছেলেমেয়েদের জন্যে এরকম একটা দুর্নাম মাথার ওপর চাপল। এর চেয়ে মৃত্যুও ভাল।'

নিখিলেশ যেন চোখের সামনে থেকে দেখতে পাচ্ছিলেন, যৌবনের শুরু থেকে তিল তিল করে জনগণের সামনে নিজের যে পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন, তার দীপ্তি অনেক আগেই প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে পন্টু বাকিটুকু এখন ধ্বংস করতে চলেছে।

অনুপমা মুখ না তুলে জানালেন, নিখিলেশ যে আদ্যোপান্ত সৎ তাঁর চেয়ে কেউ ভাল জানে না। যাদের মাথায় অভিসন্ধি বা কুমতলব নেই, তারাও একথা স্বীকার করবে। যদি সত্যিই সি বি আই এনকোয়ারি বসানো হয়, নিখিলেশের চামড়ায় কেউ একটা আঁচড় পর্যন্ত কাটতে পারবে না। চক্রান্তকারীদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। নিখিলেশ আবার নিজের মহিমায় ফিরে আসতে পারবেন।

নিখিলেশ উত্তর দিলেন না, একদৃষ্টে স্ত্রীকে লক্ষ করতে লাগলেন।

অনুপমা কিছু বলতে গিয়েও এবার বললেন না। ভেতরে ভেতরে নিজের সঙ্গে খানিকক্ষণ বোঝাপড়া করে নিলেন যেন। তারপর দ্বিধান্বিতবাবে আরম্ভ করলেন, 'আমার একটা কথা শুনবে?'

অনুপমা কী বলতে চান, মোটামুটি তা আঁচ করতে পারছিলেন নিখিলেশ। তবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কথা?'

'পল্টুদের জন্যে কিছু কি করা যায়?'

'কী করতে বলছ?'

'মানে — মানে —' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন অনুপমা।

স্ত্রীর দিকে অনেকটা ঝুঁকে নিখিলেশ বললেন, 'নিজের ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে আমি ওদের বাঁচাই, এটাই বোধহয় তুমি চাইছ — '

অনুপমা চুপ।

আরতি একটা ট্রেতে চা, বাদাম আর নারকেলের কুচি মেশানো, বালিতে বাজা চিড়ে এবং মিষ্টি নিয়ে এলেন।

সূর্য ডুবে গিয়েছিল। সন্ধে নামতে শুরু করেছে। ঘরের ভেতরে আবছা অন্ধকার। দু হাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

হাতের ট্রেটা নামিয়ে আরতি বললেন, 'এ কী, অন্ধকারে বসে আছেন!' সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে বললেন, 'চা খান। আমি কিন্তু এখন আর আপনাদের সঙ্গ দিতে পারছি না।' তিনি চলে গেলেন। আসলে বাড়িতে আজ বাড়তি একজন অতিথি। তা ছাড়া অনুপমার সঙ্গে একজন ড্রাইভারও এসেছে। এদের জন্য রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করতে হবে। বসে গল্প করার সময় নেই তাঁর।

আরতি চলে যাবার পর দু-এক পলক অনুপমাকে লক্ষ করলেন নিখিলেশ। একদিন এই মহিলাটি তাঁর জন্য কত স্বার্থত্যাগ করেছেন। তাঁর সততা এবং আদর্শের প্রতি অনুপমার কী শ্রদ্ধাই না ছিল! আর আজ তিনি কিনা অসুস্থ শরীরে আর্থিক আইনভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত সন্তানদের বাঁচাবার আর্জি নিয়ে তাঁর কাছে ছুটে এসেছেন! অবশ্য তাঁর জন্যও অনুপমার উৎকণ্ঠা কম নয়। কিন্তু এখনও স্বামীর প্রতি অনুপমার অটুট শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস। তিনি নিশ্চিতভাবেই জানেন যে পর্যায়ের তদন্তই হোক, নিখিলেশের বিরুদ্ধে বে-আইনি বা আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যাবে না। তাঁর ভয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে।

কাগজ পড়ার পরের সেই প্রাথমিক ধাক্কাটা এর মধ্যে অনেকটাই সামলে উঠেছেন নিখিলেশ। ভেতরে ভেতরে নিজেকে শক্ত করে নিয়েছেন তিনি। বললেন, 'আমার মন্ত্রিত্ব

গেছে। এখন আমি ক্ষমতাহীন, কনডেমনড একটি মানুষ। ইনফ্লুয়েন্স করব কিভাবে? রাতকে দিন করার শক্তি থাকলেও কিছু করতে পারতাম না। কেন পারতাম না, সেটা নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে।'

আবছা গলায় অনুপমা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার পক্ষে ছেলেদের এই দুঃসময়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো কি কোনওভাবেই সম্ভব নয়?'

'বললাম তো—না।'

বিপর্যস্ত অনুপমা ম্লান মুখে বসে রইলেন। পন্টুরা জোর করে তাঁকে তালবনিতে পাঠালেও, তাঁর নিজের আসার গরজও কম ছিল না। সন্তান বিপন্ন হলে কোনও মা-ই অবিচলিত থাকতে পারে না। ক্ষোভের সুরে বললেন, 'ছেলেমেয়েদের বাড়িতে রেইড হবে, পুলিশ তাদের টানা-হ্যাঁচড়া করে লক আপে ঢোকাবে, আর হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে বসে তুমি দেখবে?'

নিখিলেশ উত্তর দিলেন না।

অনুপমা থামেন নি। স্বামীর প্রতি ক্ষোভটা এতক্ষণে উত্তেজনার চেহারা নিয়েছে। বলতে লাগলেন, 'নিজের সন্তানদের চূড়ান্ত হেনস্থা হলে আমাদের মুখ কি উজ্জ্বল হবে?'

নিখিলেশ এবার বললেন, 'আমাদের মুখ উজ্জ্বল করার মতো কাজ কি তারা করেছে?'

অনুপমা কোনও কথাই শুনতে চাইলেন না। সমানে বলতে লাগলেন, 'আসলে নিজের পলিটিক্যাল কেরিয়ার, নিজের ইমেজ — এ সব ছাড়া আর কিছুই তুমি ভাবতে পার না।'

নিখিলেশ ধীরে ধীরে বললেন, 'সংসার, সন্তান, সবই আমার অত্যন্ত প্রিয়, জীবনের খুবই মূল্যবান অ্যাসেট। কিন্তু তুমি তো জানো আমি একজন কমিটেড পলিটিক্যাল ওয়ার্কার। মানুষের কাছে আমার দায়বদ্ধতা আছে। এমন কিছু করতে পারি না যা পিপলের বিরুদ্ধে যায় বা পিপলের ঘৃণা এবং সন্দেহের পাত্র হয়ে উঠি। ছেলেমেয়েদের মতো এই ব্যাপারটা আমার কাছে কম ইমপর্টান্ট নয় অনুপমা।'

এই সময় হাতে চায়ের কাপ নিয়ে যোগেন মাস্টার ঘরে ঢুকলেন। তাঁর পরনে লুঙ্গি আর হাফ-হাতা ফতুয়া ধরনের জামা। কখন তিনি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছেন, হাতমুখ ধুয়ে বাইরের পোশাক পালটেছেন, টের পাওয়া যায় নি।

যোগেন মাস্টার ঘরের কোণ থেকে চেয়ার টেনে এনে নিখিলেশের খাটের পাশে বসতে বসতে বললেন, 'স্কুল ছুটির পর টিচারদের একটা মিটিং ছিল। এজন্যে বাড়ি ফিরতে দেরি হল।' অনুপমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাল আছেন তো বৌদি?'

অনুপমা যে আসবেন তা যোগেন মাস্টারের জানা ছিল। সকালে নিখিলেশ বেরিয়ে যাবার পর কলকাতা থেকে তিনি যে ফোন করেছিলেন সেটা যোগেন ধরেছিলেন। তখনই অনুপমা তালবনি আসার কথাটা বলেছেন।

অনুপমা যোগেন মাস্টারের দিকে তাকিয়ে নির্জীব স্বরে বললেন, 'ওই একরকম।'

'আর্থারাইটিসের পেইনটা?'

'মাঝে মাঝে খুব বাড়ে। কখনও একটু ভাল থাকি। এইভাবেই বাকি জীবনটা কেটে যাবে।'

যোগেন মাস্টার বললেন, 'শুনেছি এ ধরনের অসুখে শুধু ওষুধে কাজ হয় না। আসন টাসন করলে ভাল ফল দেয়।'

অনুপমা বললেন, 'করি তো। আমাদের বাড়ির কাছে যোগাসন শেখাবার সেন্টার আছে। সেখান থেকে একজন মহিলা ইনস্ট্রাক্টর এসে আসন করিয়ে যায়। যা-ই করি না, পুরোপুরি সারবে বলে মনে হয় না।'

কিছুক্ষণ এলোমেলো কথা বলার পর যোগেন মাস্টার নিখিলেশকে বললেন, 'আজকের কলকাতার কাগজ পড়েছেন কি?' পরক্ষণে খাটের ওপর তাঁর নজর পড়ল, 'আরে, ওই তো কাগজের ডাঁই। এত কাগজ এল কোত্থেকে? বৌদি নিয়ে এসেছেন বোধ হয়।'

অনুপমা মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ।'

যোগেন মাস্টার বললেন, 'কাগজে বিশ্রী সব খবর বেরিয়েছে।'

নিখিলেশ বললেন, 'সেই জন্যেই অনুপমা ছুটে এসেছে।'

যোগেন মাস্টারকে বিষণ্ণ দেখাল। বললেন, 'আপনার সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে নিখিলেশবাবু। ঘরে বাইরে, সব দিকেই সমস্যা।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর নিখিলেশ বললেন, 'আপনার বৌদির ইচ্ছা, আমি যেন ছেলেদের বাঁচানোর চেষ্টা করি। আমি কী বলেছি জানেন?'

যোগেন মাস্টার বিব্রত বোধ করছিলেন। বললেন, 'কী?'

'সোজা না বলে দিয়েছি।' নিখিলেশ বললেন।

যোগেন মাস্টারের অস্বস্তি বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি অস্পষ্ট গলায় কিছু বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার একটা শব্দও বোঝা গেল না।

নিখিলেশ বলতে লাগলেন, 'আপনি আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু। আপনার মতো শুভাকাঙ্ক্ষী আর একজনও নেই। আপনিই বলুন অনুপমাকে যা বলেছি সেটা ঠিক না? ছেলেরা অন্যায় করবে, আর আমি তাদের প্রোটেক্ট করব, মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না।' একটু থেমে বললেন, 'তা ছাড়া ওদের প্রোটেক্ট করার ক্ষমতাও আমার নেই।'

যোগেন মাস্টার বললেন, 'ব্যাপারটা এত ডেলিকেট যে কী বলব ভেবে উঠতে পারছি না।'

নিখিলেশ যে অত্যন্ত জটিল সংকটে পড়েছেন তার একটা দিক পারিবারিক, অন্যদিকে রয়েছে তাঁর রাজনৈতিক সততার প্রশ্ন। ছেলেদের রক্ষা করতে চেষ্টা করলে তার পরিণাম কী মারাত্মক হতে পারে চোখের সামনে তার স্পষ্ট ছবিটা ফুটে উঠতে লাগল যোগেন মাস্টারের। খবরের কাগজের লোকেরা কালির বদলে কলমে বিষ পুরে ঘৃণা উগরে দিতে থাকবে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একেবারে রে রে করে রাস্তায় নেমে পড়বে। তাঁর পার্টিতেও ঈর্ষাকাতর, গুপ্ত শত্রুর অভাব নেই। সবাই মিলে নানা

দিক থেকে প্রকাশ্যে এবং গোপনে কত দিকে কত ফ্রন্ট খুলে যে আক্রমণ হানবে, কে জানে।

নিখিলেশ বললেন, 'ছেলেদের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। কিভাবে, কোত্থেকে ক্যাপিটাল জোগাড় করে ব্যবসাতে লাগিয়েছে তা আমাকে কখনও জানায়নি। যদি কিছু গোলমাল করে থাকে আর তাদের বিরুদ্ধে কোনও অ্যাকশন নেওয়ার কথা ভাবা হয় সেটা ওদেরই ফেস করতে হবে। যদি মনে করে নিজেরা খুব ক্লিন, সেলফ ডিফেন্সের জন্যে সোজা কোর্টে যেতে পারে। দেশে বড় বড় ল'ইয়ারের অভাব নেই।'

যোগেন মাস্টার আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন অনুপমা। নিখিলেশকে বললেন, 'সুটকেশে তোমার জামাকাপড়, সেভিং সেট টেট রইল। আমি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।'

নিখিলেশ হকচকিয়ে গেলেন, 'সন্ধে হয়ে গেছে। বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে তো মাঝরাত হয়ে যাবে। এতটা রাস্তা এসেছ, আবার ফিরে যাবে। শরীরে ভীষণ স্ট্রেন পড়বে।'

যোগেন মাস্টার হইচই বাধিয়ে দিলেন, 'না না, আপনার কিছুতেই যাওয়া হবে না।' গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগলেন, 'আরতি — আরতি, শীগ্‌গির এদিকে এস। বৌদি কী বলছেন শোন—'

আরতি প্রায় ছুটেই এলেন। সব শুনে বললেন, 'অসম্ভব। কত বছর পর এসেছেন। আপনাকে যেতে দিচ্ছে কে? কয়েকদিন থাকুন, তারপর ফেরার কথা ভাবা যাবে।'

কিন্তু অনুপমা জেদ ধরেছেন, আজই চলে যাবেন। আরতি আর য়োগেন মাস্টারও ছাড়বেন না। অনেক টানা হেঁচড়ার পর শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, রাতটা তালবনিতে কাটিয়ে কাল অনুপমা কলকাতায় ফিরবেন।

আট

রাতে বেশি কথা টথা বলেননি অনুপমা। সর্বক্ষণই তাঁকে গম্ভীর, অন্যমনস্ক আর ক্ষুব্ধ মনে হয়েছে। বিপন্ন ছেলেদের বাঁচাবার জন্য নিখিলেশ একটা আঙুল তুলতেও রাজি নন — এটাই তাঁর ক্ষোভের কারণ।

স্ত্রীর মনোভাব নিখিলেশকে শুধু বিষণ্ণই করে তুলেছে। সারারাত তিনি ভাল করে ঘুমোতে পারেননি।

পরদিন সূর্যোদয়ের পর অনুপমাকে আর আটকানো গেল না। চা খেয়েই চলে গেলেন।

যোগেন মাস্টার বা আরতি কেউ আজ আর অনুপমাকে থেকে যাবার অনুরোধ করলেন না। তিনি থাকলে তাঁর এবং নিখিলেশের মধ্যে অশান্তি আর তিক্ততা বাড়বে। সেটা বাঞ্ছনীয় নয়।

যোগেন মাস্টাররা চিরকাল দেখে এসেছেন নিখিলেশ আর অনুপমার মধ্যে আশ্চর্য মিল। কখনও কোনও কারণে তাঁদের মনোমালিন্য ঘটেছে বলে শোনেন নি। সুখী,

পরিতৃপ্ত দাম্পত্য সম্পর্ক বলতে কী বোঝায় সেটা ওঁদের দেখলে টের পাওয়া যেত। নিখুঁত যুগলবন্দির মতো অবিচ্ছিন্ন এক সুরে জীবনের দীর্ঘ অনেকগুলো বছর কাটিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। আদর্শ স্বামী-স্ত্রীর রোল মডেল কী হওয়া উচিত, তা চোখে আঙুল দিয়ে যেন নিখিলেশরা বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে দু'জনের মাঝখানের এতকালের সেই মাধুর্যের সুরটা কেটে যেতে শুরু করেছে ছেলেমেয়েদের জন্য। এখানে যোগেন মাস্টারদের কিছু বলার বা করার নেই। তাঁরা শুধু বিমর্ষই বোধ করতে পারেন।

আরতি চলে যাবার পর কালকের মতোই বেরিয়ে পড়লেন নিখিলেশ। কাল বড় রাস্তা ধরে মেঘাই নদীর এধারে ভৌমিকদের পাড়ায় গিয়েছিলেন। আজ রিকশা নিয়ে নতুন পল্লী থেকে পুবদিকে খানিকটা এগিয়ে ডানপাশের রাস্তায় গেলেন। এ দিকটা তালবনির পুরনো অঞ্চল। দারুণ ঘিঞ্জি। ফাঁকা জায়গা বলতে কিছু নেই। বাড়িঘর দোকানপাটে এমনই ঠাসা যে দম বন্ধ হয়ে আসে। তাছাড়া দু-পা হাঁটতে না হাঁটতেই শিব, শনি কি কালীমন্দির।

নিখিলেশকে দেখার পর কাল বা পরশু তালবনির অন্য এলাকার লোকজনের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। সবার চোখে মুখে অসন্তোষ, ক্ষোভ এবং চাপা উত্তেজনা লক্ষ করা গেল। এধার ওধার থেকে বিরূপ মন্তব্য কানে আসতে লাগল। এমনকি, কাল কলকাতার কাগজগুলোতে তাঁর নামে যে রিপোর্টগুলো বেরিয়েছিল, সে সব নিয়েও অনেকে বিশ্রী, উত্তেজক টিপ্পনী কাটছিল।

নিখিলেশ হাতজোড় করে বসে আছেন। এদিকের অনেকেই তাঁর বহুকালের চেনা, তাদের নামও জানেন। চেনা-অচেনা সকলকেই বিনীত সুরে জিজ্ঞেস করছেন, 'ভাল আছেন তো?'

এই এলাকাটার নাম শিবতলা। প্রচুর শিবমন্দির থাকার জন্য হয়তো এমন নামকরণ করা হয়েছিল।

শিবতলার মাঝামাঝি একটা গোল চত্বরের মতো জায়গায় আসতেই হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে একটা মধ্যবয়সী, ক্ষয়াটে চেহারার লোক নিখিলেশের সামনে এসে দু হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কাঁচাপাকা, জট-পাকানো চুল হাওয়ায় উড়ছে। এক ইঞ্চি গর্তে ঢোকানো চোখদুটো ধকধক করছে। ভাঙা গালে পাঁচ সাতদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কণ্ঠার হাড় চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। ট্যারাবাঁকা কালচে দাঁত। হাতের আঙুলগুলো গাঁট পাকানো। পরনে ময়লা পাজামার ওপর হাফশার্ট।

হিংস্র ভঙ্গিতে লোকটা বলছিল, 'অনেকদিন ধরে আপনাকে খুঁজছি। ভেবেছি, আসছে বারের ভোটের আগে এখানে হাজিরা দেবেন। কিন্তু তার ঢের আগেই এসে পড়েছেন। আপনাকে আজ ছাড়ছি না।'

লোকটাকে আগে কখনও দেখেছেন কিনা মনে করতে পারলেন না নিখিলেশ। ভেতরে ভেতরে তিনি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, এবং সেই সঙ্গে ভয়ও। লোকটার

মতলব যে ভাল নয়, সেটা তার মারমুখী চেহারা আর কথা বলার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

ভেতরের প্রতিক্রিয়াটা বাইরে বেরিয়ে আসতে দিলেন না নিখিলেশে। শান্ত, সংযত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে খুঁজছেন কেন?'

'আপনাকে একটা সিনেমা দেখাতে চাই—'

'সিনেমা!'

'রিকশা থেকে নেমে আমার সঙ্গে চলুন—'

অস্বস্তিটা ক্রমশ বাড়ছে। এমন একটা খ্যাপাটে, বদমেজাজী লোকের সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে কিনা, নিখিলেশ বুঝতে পারছেন না। তিনি রিকশা থেকে নামলেন না। দ্বিধান্বিতভাবে বললেন, 'আপনার সঙ্গে কোথায় যাব?'

লোকটা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। নিখিলেশের দ্বিধার কারণটা আঁচ করে বলল, 'আপনাকে আমি অনেক বছর ধরে চিনি নিখিলেশবাবু। আগে কেউ ডাকলে তক্ষুনি তার সঙ্গে চলে যেতেন। কখনও না বলতেন না। মনে পড়ে?'

নিশিলেশ উত্তর দিলেন না। লোকটা যা বলল তার শতকরা একশ' ভাগ ঠিক। সুখে দুঃখে আপদে বিপদে এখানকার মানুষজনের কাছে তিনি ছুটে যেতেন। এইভাবেই তাদের সঙ্গে তাঁর চমৎকার একটা যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। তালবনিবাসীদের আস্থা, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা যে তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন, তার একটা বড় কারণ ছিল এটাই। লোকটার কথার উত্তর না দিয়ে নিখিলেশ তার মতিগতি বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন।

লোকটা এবার বলল, 'চিন্তা নেই নিখিলেশবাবু, আপনাকে অপমান করব না। আপনার জন্যে দারুণ একটা দৃশ্য সাজিয়ে রেখেছি। সেটা দেখিয়েই ছেড়ে দেব। আসুন, আসুন—'

রিকশাটাকে ঘিরে লোকজন জমতে শুরু করেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে উৎকণ্ঠিত নিখিলেশ নেমেই পড়লেন। অজানা আশঙ্কা থাকলেও একটা চাপা কৌতূহলও হচ্ছিল তাঁর।

'ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। এই যে এধারে —' লোকটা বাঁ পাশের একটা গলির দিকে পা বাড়াল।

রিকশাওলাকে দাঁড়াতে বলে নিখিলেশ এগিয়ে চললেন। তাঁর মনে হল, লোকটা অমোঘ নিয়তির মতো আগে আগে যাচ্ছে আর অন্ধের মতো তিনি তাকে অনুসরণ করছেন। বেশ কিছু রাস্তার লোক তাঁদের পিছু নিয়েছে। লোকটা অভয় দিয়েছে, তাঁর এতটুকু অসম্মান করা হবে না। তবু তিনি কিছুতেই অস্বাচ্ছন্দ্য কাটিয়ে উঠতে পারছেন না।

খানিকটা যেতেই শেওলা-ধরা, পলেস্তারা-খসা, বহু পুরনো, একটা একতলা বাড়ির ভেতর নিখিলেশকে নিয়ে এল লোকটা। বাইরের ভিড়টা অবশ্য রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে রইল।

ইট পাতা উঠোন পেরিয়ে লোকটার সঙ্গে একটা ঘুপচি, অন্ধকার ঘরে এসে দেখা গেল, তক্তাপোষের ওপর ময়লা বিছানায় একটি কুড়ি একুশ বছরের যুবক শুয়ে আছে।

কোমর পর্যন্ত তার চাদরে ঢাকা। লম্বা লম্বা চুল উষ্কখুষ্ক, অনেকদিন সেগুলো কাটা হয় নি। গালে খাপচা খাপচা পাতলা দাড়ি। ঘোলাটে, নির্জীব চোখের তলায় কালির ছোপ। মনে হয় বহুকাল সে ঘুমোয় না। নিখিলেশ ঘরে ঢুকতেই তার দৃষ্টি হঠাৎ প্রখর হয়ে উঠল। চোখেমুখে কেমন একটা আক্রোশ যেন ফুটে ওঠে। চোয়াল শক্ত করে সে পলকহীন তাকিয়ে থাকে।

নিখিলেশ খুবই সাহসী জননেতা। একদিন, তাঁর সেই যৌবনে সম্পূর্ণ এককভাবে এই অঞ্চলের সব জমিমালিকের বন্দুকবাজদের সঙ্গে লড়াই করে কৃষক সংগঠন করেছিলেন; তাদের নায়সঙ্গত দাবির অনেকখানিই আদায় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিছানায় শুয়ে থাকা যুবকটির নিষ্পলক চোখের দিকে তাকিয়ে তাঁর রীতিমত ভয় করতে লাগল।

জানালায় জানালায় ক'টি বাচ্চাকাচ্চা, একটি কিশোর, একটি তরুণী আর বয়স্ক একটি মহিলার কৌতূহলী মুখ নিখিলেশের চোখে পড়ল। আন্দাজ করলেন এরা লোকটার ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রী।

লোকটা তক্তাপোষের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'এ আমার বড় ছেলে ভানু। শিউলাল মারোয়াড়ির চাল-কলে কাজ করত। আমিও সেখানে চাকরি করি। কিন্তু দু'মাস হল ভানুর কাজটা গেছে।'

ছেলের চাকরি খোয়ানোর খবর দেবার জন্যই কি লোকটা তাঁকে বাড়িতে টেনে এনেছে? বিমূঢ়ের মতো নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কাজটা গেল কেন?'

লোকটা আচমকা ভানুর গা থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে বলল, 'এই কারণে —'

ভানুর দুই হাঁটুর তলা থেকে নিচের অংশ নেই। হাঁটুর ওপরের দিকে পুরু করে ব্যান্ডেজ বাঁধা। নিখিলেশ শিউরে উঠলেন।

লোকটা বলতে লাগল, 'আমার অমন জোয়ান ছেলেটা! বাকি জীবন ওকে বিছানায় শুয়ে শুয়েই কাটাতে হবে।'

নিখিলেশের স্নায়ুমণ্ডলীতে যে ধাক্কাটা লেগেছিল তা সামলে উঠতে খানিকটা সময় লাগল। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিভাবে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা ঘটল?'

লোকটা জ্বলন্ত চোখে নিখিলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এর জন্যে আপনিও বেশ কিছুটা দায়ী।'

নিখিলেশ হতচকিত। বললেন, 'তার মানে?'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি —'

লোকটা একনাগাড়ে এবার যা বলে গেল তা এইরকম। ভানু মাসখানেক আগে চাল-কলে তার ডিউটি সেরে সন্ধে নাগাদ মেঘাই নদীর ওধার থেকে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ কোনও মেয়ের আর্ত চিৎকার শুনতে পায় 'বাঁচাও—বাঁচাও —' ভানু ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেল, বাঁ ধারের একটা গলি থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি তরুণী। আতঙ্কে তার চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। মেয়েটির আতঙ্কের কারণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল। তারক আর তার বাহিনী মোটর বাইকে চড়ে ওকে তাড়া করে আসছে।

রাস্তায় তখন প্রচুর লোকজন। কিন্তু মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্য কেউ এগিয়ে এল না। তারকদের দেখে যে যেদিকে পারল উধাও হয়ে গেল।

ভানু পালায়নি। শিরদাঁড়া টান টান করে দাঁড়িয়ে রইল। ওদিক থেকে মেয়েটি দৌড়ে এসে তার বুকের ওপর প্রায় আছড়ে পড়ল। তার চোখের তারা দুটো ভয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন। আতঙ্কগ্রস্তের মতো বলল, 'ভাই আমাকে রক্ষা কর। নইলে ওই মাস্তানগুলো আমার সর্বনাশ করে দেবে।'

ভানু অত্যন্ত জেদি, প্রচণ্ড সাহস তার। জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোথায় থাকেন আপনি?'

'কলু পাড়ায়।'

'যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে যান। আমি ওদের রুখছি।'

মেয়েটি পা বাড়াতে গিয়েও থেমে যায়। বলে, 'ওরা সাঙ্ঘাতিক। ওদের সঙ্গে বোমা বন্দুক আছে। যদি তোমার কোনও—'

ভানু বলেছিল, 'আমার কথা ভাবতে হবে না। যান—'

মেয়েটি ফের ছুটতে শুরু করেছে। এদিকে তারকরা ভানুর কাছাকাছি চলে এসেছিল। সে ততক্ষণে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারকরা বাপ-মা তুলে কুৎসিত খিস্তি করতে করতে বলেছে, 'হট শালা—'

ভানু বলেছে, 'এটা কি তোমাদের বাবার রাস্তা?'

তারকদের চোখে হত্যা যেন ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। 'শুয়ারের বাচ্চা, তোকে দুনিয়া থেকে কেমন করে ফুটিয়ে দিতে হয়, দেখাচ্ছি।' চিৎকার করতে করতে জোরে ব্রেক কষে কষে মোটর বাইকগুলো থামিয়ে দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়েছিল তারক এবং তার দেখাদেখি তার সারাক্ষণের সঙ্গীরাও।

ভানু সরে যায় নি। সে ঠিক করে ফেলেছিল ওরা হাত চালাবার আগে তার এমন কিছু করা দরকার যাতে এই মস্তানরা যেন অন্তত কিছুক্ষণের জন্য থমকে যায়। তার চোয়াল পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠেছিল। তারকরা কিছু আন্দাজ করার আগেই সে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু একজনের পক্ষে পাঁচজনের সঙ্গে কতক্ষণ আর লড়া সম্ভব? মিনিট পাঁচেক যোঝার পর যখন সে বুঝতে পারল মেয়েটি নিরাপদ দূরত্বে চলে গেছে, তখন বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করেছিল। কিন্তু তারকরা তাকে ছাড়েনি। বাধা দেওয়ার কারণে তাদের সব আক্রোশ এসে পড়েছিল ওর ওপর। কিন্তু ভানু এত জোরে দৌড়চ্ছিল যে ক্রমশই তারকদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ওরা পেছন থেকে বোমা ছোঁড়ে। আর তাতেই পা দুটো উড়ে যায় তার।

কথা শেষ করে লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'আপনি যদি ওই মস্তানগুলোকে ভোটের কাজে না লাগাতেন, ওরা এত বাড়তে পারত না।'

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন নিখিলেশ। নির্বাচনের জন্য যে বিষবৃক্ষের বীজ একদিন বোনা হয়েছিল, তার ডালপালা যে তালবনির ওপর এভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, ভাবতে পারেননি। যোগেন মাস্টার অবশ্য তাঁকে অনেক বার সতর্ক করে দিয়েছিলেন কিন্তু তা কানেই শুনেছেন। শোনা ছাড়া কিছু করার ছিল না তাঁর। পার্টির নির্দেশ,

নির্বাচনে জেতার জটিল ছক, সহকর্মীদের চাপ ইত্যাদি নানা কারণে তারকদের মেনে নিতে হয়েছিল। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ওদের সারভিস নাকি অত্যন্ত জরুরি। তালবনিতে আসার পর কাল আর আজ, দু'দিন নিজের চোখে যে দু'টি নমুনা দেখলেন তাতে অসীম উৎকণ্ঠায় শ্বাস আটকে আসছে।

দিকনির্ণয় যন্ত্রের কাঁটার মতো এবার লোকটার আঙুল ঘরের তিনটে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সেই বাচ্চাগুলো, সেই কিশোর, তরুণী আর মধ্যবয়সিনীর দিকে ঘুরতে লাগল। ধারাবিবরণী দেবার ভঙ্গিতে সে বলে যাচ্ছে, 'এরা আমার ছেলেমেয়ে আর স্ত্রী। সব মিলিয়ে আটটা পেট। মাইনে পাই দু হাজার চারশ' টাকা। ভানুটা হাজার দেড়েক পাচ্ছিল। সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। চব্বিশ শ' টাকায় এ বাজারে কী করে চালাব! আমার সংসারটা একেবারে ধসে গেল।'

নিখিলেশ এরকম একটা পরিবেশে ভীষণ অসুস্থ বোধ করছিলেন। বললেন, 'ভানু কদ্দূর পড়াশোনা করেছে?'

লোকটা বলল, 'মাধ্যমিকটা কোনও রকমে পাশ করেছে। কিন্তু—'

নিখিলেশ বললেন, 'কিন্তু কী?'

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'ভানুর পড়াশোনার কথা জানতে চাইছেন কেন?'

নিখিলেশ বললেন, 'স্কুল বোর্ডের সার্টিফিকেট বা ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি টিগ্রি থাকলে চাকরি পেতে সুবিধা হয়।'

লোকাটা খুব নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি ভানুর চাকরির কথা ভাবছেন নাকি?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়েন নিখিলেশ।

'কত আচ্ছা আচ্ছা বি. এ., এম. এ রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভানু তো মোটে ঘেতিয়ে ঘেতিয়ে মাধ্যমিক পাশ। তার ওপর সমাজসেবা করতে গিয়ে দুটো পা খুইয়েছে। কে ওকে চাকরি দেবে?' লোকটার গলায় এবার হতাশা ফুটে বেরোয়।

নিখিলেশ বললেন, 'প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্যে সরকারি চাকরিতে কোটা আছে। আপনি নাম, ঠিকানা, কোন বছরে ভানু মাধ্যমিক পাশ করেছে — সব লিখে একটা দরখাস্ত আমাকে দেবেন। ওর কিছু একটা কাজ যাতে হয়, সেজন্যে আমি খুব চেষ্টা করব।'

'কিন্তু —'

'কিসের কিন্তু?'

লোকটাকে এই প্রথম একটু বিব্রত দেখাল। সে বলল, 'এখন তো আপনি আর মন্ত্রী নেই নিখিলেশবাবু।'

তার ইঙ্গিতটা খুব স্পষ্ট। সরকারি ক্ষমতায় না থাকলে নিখিলেশ কিভাবে চাকরির ব্যবস্থা করবেন?

নিখিলেশ বললেন, 'মন্ত্রী না থাকলেও মানবিক কারণে এখনকার গভর্নমেন্ট আমার অনুরোধ রাখবেন বলেই মনে করি। যতদিন না ভানুর কিছু হচ্ছে, মাসে মাসে সাধ্যমতো আপনাদের সাহায্য করতে চাই। আপত্তি নেই তো?'

লোকটা বোধহয় এতটা আশা করেনি। নিখিলেশের প্রতি তার ক্রোধ বা আক্রোশ অনেকটাই কেটে যায়। হাতজোড় করে সে বলল, 'তা হলে তো আমি বেঁচে যাই।'

'আমি তালবনিতে কোথায় উঠেছি জানেন?'

'এখানকার সবাই জানে। যোগেন মাস্টারের বাড়িতে।'

'যদি পারেন কাল রাতের দিকে একবার ওখানে আসবেন।'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনার নামটা কিন্তু জানা হয়নি।'

'পঞ্চানন মাইতি।'

'ঠিক আছে। এখন তাহলে চলি—'

পঞ্চাননের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর কোথাও গেলেন না নিখিলেশ। ভীষণ অবসন্ন বোধ করছিলেন তিনি। সোজা যোগেন মাস্টারের বাড়িতে ফিরে গেলেন।

নয়

রিকশাওলার ভাড়া মিটিয়ে, পরদিন সকালে তাকে আসতে বলে ভেতরে চলে এলেন নিখিলেশ। যতদিন তালবনিতে আছেন এই লোকটির রিকশাতেই ঘোরাঘুরি করবেন।

রান্নাঘর থেকে আরতি নিখিলেশকে দেখতে পেয়েছিলেন। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বাইরে এসে বেশ অবাক হয়ে বললেন, 'এখনও এগারোটা বাজেনি। আজ বুঝি খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে গেল?'

নিখিলেশ ভাসা ভাসা জবাব দিলেন, 'বলতে পারেন।'

'কোন দিকে গিয়েছিলেন?'

'শিবতলায়।'

'ঘরে যান। আপনার দু'জন গেস্ট এসেছেন। ওঁদের বলেছিলাম, আপনার ফিরতে ফিরতে দুপুর হয়ে যাবে। ওঁরা জানালেন, যতক্ষণ না আপনি ফিরছেন এখানেই অপেক্ষা করতে চান। খুব জরুরি ব্যাপারে আপনার সঙ্গে নাকি দেখা করতেই হবে। তাই ওঁদের বসাতে হল।'

উঠোন থেকে সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে এলেন নিখিলেশ। কারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, কে জানে। তাদের জরুরি কাজটাই বা কী? কৌতূহলও যেমন হচ্ছিল, সেই সঙ্গে কিছুটা উদ্বেগও। এখানে যাদের সঙ্গেই দেখা হচ্ছে তাদের কাছ থেকে গণ্ডা গণ্ডা অভিযোগ, ক্ষোভ আর ধিক্কার শুনতে হচ্ছে। উৎকণ্ঠার মধ্যেও নিখিলেশ মনে মনে আরও কিছু অভিযোগ শোনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন।

বারান্দার ও প্রান্ত থেকে আরতি বলল, 'এখন চা খাবেন?'

'অসুবিধে না হলে করুন।'

ঘরে এসে নিখিলেশ দেখলেন, নীলকমল ভৌমিকের দুই ভাই লালকমল আর সুকমল দুটো চেয়ারে বসে আছে। ওরা দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করল। লালকমল বলল, 'নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে ছুটে আসতে হল।'

ভৌমিকবাড়ি থেকে কেউ যে এ সময় আসতে পারে, একটু আগেও ভাবেননি নিখিলেশ। তিনি অবাক হলেও বাইরে থেকে তা বোঝা গেল না। খাটের একধারে বসতে বসতে বললেন, 'আপনারা বসুন—' লালকমলরা বসার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনও রকম সমস্যা হয়েছে?' তাঁর চোখের সামনে হঠাৎ তারকদের মুখগুলো ফুটে উঠতে লাগল।

লালকমল নিচু গলায় বলল, 'হ্যাঁ। আজ ভোরে তারকরা আবার এসে হাজির।'

'ওরা আপনাদের ক'দিন সময় দিয়েছিল না?'

'হ্যাঁ।'

'তবে আজই কেন এল?'

'খুব সম্ভব আমাদের নার্ভের ওপর প্রেসারটা রেখে দিতে চাইছে। হয়তো ভাবছে, বার বার এলে আমাদের মনের জোর ভেঙে যাবে, ওদের ইচ্ছামতো জমি বেচতে রাজি হব।'

'তাই হবে। আজ ওরা কী বলল?'

'নতুন কিছু নয়, সেই একই কথা। তবে দাদা কড়া গলায় আপনার নাম করে ওদের বলেছেন, জমি বিক্রি করা হবে না, আপনি বারণ করে দিয়েছেন। জোর জুলুম করা হলে আপনাকে জানানো হবে।'

মেরুদণ্ড টান টান হয়ে গেল নিখিলেশের। কাল থেকেই মনে হচ্ছিল, তারকদের সঙ্গে হয়তো তাঁর একটা সংঘাত বাধবে। সেটা ক্রমশ অনিবার্য হয়ে উঠছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার নাম করায় ওরা কী বললে?'

লালকমল বলল, 'প্রথমটা হকচকিয়ে গেল। তারপর বলল, যে-ই বারণ করুক, জমি আমাদের চাই। বলে আর এক মিনিটও বসল না, মোটর বাইকে উঠে চলে গেল।'

নিখিলেশ চুপ করে রইলেন।

লালকমল বলতে লাগল, 'দাদা আপনাকে এই খবরটা দেবার জন্যে আমাদের পাঠিয়েছে। সব শুনে কী মনে হচ্ছে?'

নিখিলেশ বললেন, 'তারকরা বোধ হয় একটু ঘাবড়ে গেছে। আবার আপনাদের বাড়ি আসবে ঠিকই, তবে খুব একটা বাড়াবাড়ি করবে বলে মনে হয় না। তারপর দেখা যাক।'

কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে যায় লালকমল। তাকে লক্ষ করছিলেন নিখিলেশ। বললেন, 'যা বলতে চাইছেন বলুন না—'

লালকমল দ্বিধান্বিতভাবে বলল, 'দাদা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে বলেছে।'

'কী কথা?'

লালকমল বলল, 'এতদিন তারকদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে পুলিশ পাত্তা দিত না। আপনার নাম করে এবার কি থানায় গিয়ে ওদের নামে একটা রিপোর্ট লিখিয়ে আসব? আপনার কথা বললে পুলিশ আমাদের হাঁকিয়ে দিতে সাহস করবে না।' একটু

থেমে বলল, 'মানে ওরা সত্যিই যদি গোলমাল করে, প্রিকশনারি স্টেপ হিসেবে একটা রেকর্ড রেখে দেওয়া — এই আর কি —'

নিখিলেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাঁর আত্মমর্যাদায় কোথায় যেন একটু ধাক্কা লাগল। দৃঢ় স্বরে একসময় বললেন, 'থানায় যাবার প্রয়োজন নেই। আপনার দাদাকে বলবেন, ইলেকশানে হেরে গেলেও আমি এখনও মরে যাই নি। সেদিনও বলে এসেছি, আজও বলছি, আমি থাকতে ওই অ্যান্টি-সোসালগুলোব সাধ্য নেই আপনাদের কোনও ক্ষতি করতে পারে।'

আরতি চা দিয়ে গেলেন।

লালকমল একটা কাপ তুলে নিয়ে বলল, 'আপনাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। আপনার ওপর আমাদের গভীর আস্থা আছে। তবে তারকরা খুব নোংরা টাইপের ক্রিমিনাল কিনা। তাই—' একটু ভেবে বলল, 'সে যাক গে, আপনি যা বললেন তাই হবে।'

নিখিলেশ সামান্য হাসলেন, কিছু বললেন না।

লালকমল জিজ্ঞেস করল, 'ফের ওরা এলে আপনাকে জানিয়ে যাব?'

নিখিলেশ বললেন, 'যত বার আসবে তত বার আমাকে খবরটা দিয়ে যাবেন।'

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। লালকমল বলল, 'আপনি রেস্ট নিন। আমরা এখন যাচ্ছি।

দশ

লালকমলরা চলে যাবার পর স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিলেন নিখিলেশ। কোনও দিনই দিবানিদ্রার অভ্যাস নেই তাঁর। কম বয়সে পার্টির একজন অক্লান্ত সংগঠক হিসেবে তালবনির চারপাশের গ্রামগুলোতে সারাদিন তাঁকে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকতে হ'ত। কয়েক বছর কেটে যাবার পর এ অঞ্চলে যখন কল-কারখানা বসতে লাগল, কৃষক সংগঠনের পাশাপাশি শ্রমিকদের নিয়ে তিনি ইউনিয়ন গড়ে তুলতে লাগলেন। এই সময়টা দিনের বেলায় তো প্রশ্নই নেই, রাতেও দু-তিন ঘন্টার বেশি তিনি ঘুমোতে পারতেন না। এম. এল. এ বা মন্ত্রী হবার পর ব্যস্ততা তাঁর এতটুকু কমে নি। তখনও দুপুরবেলায় ঘুমোবার কথা ভাবা যেত না।

আজকাল, এই তেষট্টি চৌষট্টি বছর বয়সে স্বাস্থ্য আর আগের মতো অটুট নেই। বয়স তো বেড়েছেই, দু দুটো স্ট্রোকের পর থেকে অসুস্থতা লেগেই আছে। শরীর এখন বিশ্রাম চায়। তালবনিতে এসে যে ধরনের ছোটাছুটি চলছে তাতে দুপুরের দিকটায় ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। জিরিয়ে নেবার জন্য বিছানায় গা ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গেই দু চোখ আপনা থেকে জুড়ে আসে। নাছোড়বান্দা ঘুমটাকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

কাল এবং পরশুর মতো আজও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নিখিলেশ। যখন জেগে উঠলেন, বেলা আর বেশি বাকি নেই। দিনের আলো ম্যাড়মেড়ে হয়ে এসেছে। গাছপালা আর বাড়িঘরের মাথায় এখনও ফিকে একটু রোদ লেগে আছে।

নিখিলেশ লক্ষ করলেন, মাথার দিকটায় খাটের পাশে একটা ছোট টিপয় টেবলে কলকাতা থেকে বাংলা ইংরেজি যত দৈনিক কাগজ বেরোয় তার প্রতিটার একটি করে

কপি পর পর সাজানো রয়েছে। এ বাড়িতে যে লোকটা কাগজ দেয় তাকে তিনি বলে দিয়েছেন, যতদিন তালবনিতে থাকবেন কলকাতার সব কাগজ যেন দিয়ে যায়।

কলকাতার কাগজ এখানে পৌঁছায় দুটো আড়াইটেয়। তখন নিখিলেশ তালবনির নানা অঞ্চল ঘুরে এসে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। আরতি তাঁর টিপয় টেবলটায় কাগজগুলো গুছিয়ে রাখেন। বিকেলে ঘুম ভাঙলে চা খেতে খেতে ওগুলো পড়েন নিখিলেশ। আসলে পরশু থেকেই কলকাতার কাগজে তাঁর বিরুদ্ধে লেখালিখি শুরু হয়েছে। অনুপমা সেগুলোর কপি নিয়ে এসেছিলেন। কালকেও দেখা গেছে পরশু দিনের জের চলছে। নিখিলেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন। তিনি দেখতে চান আর কতদিন ধরে তাঁর সম্বন্ধে কাগজগুলো বিষ উগরে যাবে।

বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে গিয়ে মুখটুখ ধুয়ে এসে কলকাতার কাগজগুলো নিয়ে বসলেন নিখিলেশ। আগের দু'দিনের মতো আজও তাঁকে এবং পল্টুদের নিয়ে লেখা হয়েছে। তবে কাগজের প্রথম পাতায় নয়, ভেতর দিকে ছয় বা সাতের পৃষ্ঠায়। দু তিন কলম জুড়ে এই দু'দিন লেখা হচ্ছিল; আজ অবশ্য এক কলমের বেশি কেউ জায়গা দেয় নি। তবে ঝাঁঝটা আগের মতোই আছে। নতুন গভর্নমেন্টের মতিগতি এখনও স্পষ্ট নয়। তাঁর সম্বন্ধে সি. বি. আই এনকোয়ারি বসাবে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে উদ্দেশ্যটা সেই রকমই। তবে এটা পরিষ্কার পল্টুদের বিরুদ্ধে একটা কিছু কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবেই।

আরতি চা আর সূর্যমুখী তেলে ভাজা লুচি-তরকারি দিয়ে গেলেন। তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মহিলার সারাক্ষণ তীক্ষ্ণ নজর।

চা খেতে খেতে কাগজের মধ্যে নিখিলেশ যখন ডুবে আছেন সেই সময় সত্যজিৎ আর পরিমল এলেন। ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে দুটো চেয়ার রয়েছে। নিখিলেশের খাটের কাছে সে দুটো টেনে এনে ওঁরা বসে পড়লেন।

সত্যজিৎ কাগজগুলোর দিকে এক পলক তাকিয়ে বললেন, 'ও, কলকাতার ডেইলি। আপনি ওগুলো রাখছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ—' আস্তে মাথা নাড়লেন নিখিলেশ।

'কাগজের স্যাংটিটি বলতে আর কিছু নেই। স্কাউন্ড্রেলরা যা খুশি লিখে যায়।' সত্যজিতের কণ্ঠস্বরে ক্রোধ ফুটে বেরোয়, 'আপনার মতো মানুষের সারা জীবনের ডেডিকেশন, অনেস্টি আর পরিশ্রমের মূল্য এরা দিচ্ছে না।'

নিখিলেশ উত্তর দিলেন না। কাগজগুলো তাঁর এবং পল্টুদের সম্বন্ধে যে তির্যক প্রশ্নগুলো তুলেছে তার সবটা না হলেও অনেকটাই তো সত্যি। সে কথা বলতে গেলে তর্কাতর্কি বেধে যাবে; উত্তেজনা বাড়বে। তিনি শুধু জিজ্ঞেস করলেন, 'কাগজের রিপোর্টগুলো পড়ে এখানকার লোকজনের রি-অ্যাকশন কিরকম হচ্ছে?'

পরিমল এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার বললেন, 'প্রতিক্রিয়া ভেরি ব্যাড নিখিলেশদা। কালির অক্ষর যতটা ভাল, ঠিক ততটাই খারাপ। কাগজে যা ছাপা হয় 'মাস' অর্থাৎ জনগণের বেশির ভাগই বেদবাক্যের মতো তা চোখ বুজে বিশ্বাস করে।'

তালবনির বাসিন্দাদের মনোভাব তাঁর বিরুদ্ধে যে চলে গেছে, তা এখানে পা দিয়েই

সেদিন বোঝা গিয়েছিল। কলকাতার কাগজে ওই রিপোর্টগুলো বেরুবার পর মানুষ তাঁর ওপর আরও বিরূপ হয়েছে, সেটা কাল আর আজ রাস্তায় বেরিয়ে টের পেয়েছেন নিখিলেশ।

পরিমল ফের বললেন, 'ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। কাগজের কালি ছেটানো দু'দিন পর আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে। এবার আপনাকে একটা সুখবর দিই।'

নিখিলেশ খুব একটা ঔৎসুক্য দেখালেন না। নিচু গলায় বললেন, 'কী?'

'আপনি হেরে যাবার পর পার্টির ছেলেরা ভীষণ মুষড়ে পড়েছিল। এই যে তালবনিতে এসে নতুন করে কাজ শুরু করেছেন, এতে তারা খুব খুশি। উৎসাহে চনমন করছে।'

নিখিলেশ মৃদু হাসলেন। অন্যমনস্কর মতো বললেন, 'তাই বুঝি?'

সত্যজিৎ বললেন, 'আমাদের সবার ভীষণ ইচ্ছে, আপনার সঙ্গে রাস্তায় নেমে পড়ি। পায়ের তলা থেকে যে জমিটা সরে গেছে সেটা ফিরে পেতেই হবে। আপনার লিডারশিপেই সেটা সম্ভব।' একটু থেমে, কিছুক্ষণ কী ভেবে ফের শুরু করলেন, 'ইলেকশানের রেজাল্ট বেরুবার পর আমরা এত হতাশ হয়ে পড়েছিলাম যে মাস-কনট্যাক্টটা সেভাবে করতে পারি নি। অথচ জনসংযোগটাই হল আসল ব্যাপার।'

নিখিলেশ বললেন, 'ঠিকই বলেছ। কিন্তু এখন আমার সঙ্গে তোমরা বেরুতে চেয়ো না। আরও ক'টা দিন আমি একাই তালবনির সবগুলো এলাকা ঘুরে দেখি। এখানকার পরিস্থিতি ভাল করে জানা দরকার। মানুষের মতিগতি আমাকে বুঝে নিতে দাও। তারপর না হয় তোমাদের সঙ্গে নেওয়া যাবে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সত্যজিৎ বললেন, 'ঠিক আছে। আপনি যা বললেন তাই হোক।'

নিখিলেশ বললেন, 'তোমরা জানো, আমার সম্বন্ধে এখানকার মানুষের মনে প্রচুর ক্ষোভ জমে আছে। আগে তা মেটানোর চেষ্টা করি। কতটা পারব জানি না। তবে সবাইকে বোঝাব, আমি তাদের সঙ্গেই আছি।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ সত্যজিতের কী মনে পড়ে গেল। ব্যগ্রভাবে তিনি বললেন, 'নিবারণ হালদারের কথা কিছু শুনেছেন?'

কিছুটা অবাক হয়ে নিখিলেশ বললেন, 'কই না তো। কী হয়েছে নিবারণবাবুদের?'

'কিছু হয় নি। তবে—'

'তবে কী?'

'খবর পেলাম ওঁরা আপনার মুভমেন্টের ওপর নজর রাখছেন।'

'তা তো রাখতেই পারেন। সব পলিটিক্যাল পার্টিরই রাইভাল পার্টির লোকেদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে হয়। রাজনীতিতে এটা নতুন কোনও ব্যাপার যে নয়, সেটা তোমরা ভাল করেই জানো।'

পরিমল বলে উঠলেন, 'তা জানি। তবে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে —'

নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

‘ওঁরা বোধহয় ঘাবড়ে গেছেন।’

‘ঘাবড়াবার কারণ নেই। নেক্সট পাঁচ বছরের জন্যে তো নিবারণবাবুরা নিশ্চিন্ত।’

পরিমল বললেন, ‘তার পরেও তো ইলেকশান হবে। যতদিন দেশ আর ডেমোক্রেসি আছে, নির্বাচনী সিস্টেম চালু থাকবে। কোনও রাজনৈতিক দল বা জননেতা একবার জিতেই কি সন্তুষ্ট থাকতে পারে? নিবারণ হালদাররা চাইবেন পরের বারও তালবনির সিটটা ধরে রাখতে। এর ভেতর জন সমর্থনটা যদি আমাদের দিকে নিয়ে আসতে চেষ্টা করি সেটা নিশ্চয়ই ওদের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠবে। উঠবে কেন, উঠেছে। পাঁচটা বছর খুব বেশি সময় নয় নিখিলেশদা। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।’

নিখিলেশ হাসলেন, উত্তর দিলেন না।

আরও খানিকক্ষণ কথা বলে সত্যজিৎরা চলে যাবার জন্য যখন উঠে দাঁড়িয়েছেন সেইসময় হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল নিখিলেশের। বললেন, ‘আরেকটু বসে যাও। তোমাদের সঙ্গে দরকারি কথা আছে।’

সত্যজিৎরা ফের বসে পড়েন।

নিখিলেশ বললেন, ‘এখানকার অনেকগুলো ফ্যাক্টরি তো অনেক দিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে।’

পরিমল বললেন, ‘হ্যাঁ।’

‘সব মিলিয়ে বন্ধ কারখানার সংখ্যা কত হবে?’

‘সঠিক ফিগারটা এক্ষুণি দিতে পারছি না। তবে যতদূর মনে পড়ছে তিরিশ পঁয়তিরিশটা হতে পারে।’

‘এই কারখানাগুলোতে কত ওয়ার্কার কাজ করত?’

কিছুক্ষণ চিন্তা করে পরিমল বললেন, ‘ষোল সতেরো হাজার তো হবেই। কিছু কম বেশি হতে পারে।’

নিখিলেশ বললেন, ‘এতগুলো লোকের কাজ নেই। তোমরা এখানকার ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টের দায়িত্বে রয়েছ। কারখানাগুলো খোলার কী ব্যবস্থা করেছ?’

সত্যজিৎ এবার বললেন, ‘প্রতিটি কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আমরা আলোচনায় বসেছি। ওগুলো খোলার জন্যে অনুরোধ করেছি। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট অনড়। তারা যে সব শর্তে কারখানা খুলতে চায় তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ফলে আমাদের লাগাতার আন্দোলনের পথে নামতে হয়েছে। কিন্তু তাতেও রেজাল্ট কিছু হয় নি। এ সব আপনাকে টাইম টু টাইম জানানো হয়েছে নিখিলেশদা।’

নিখিলেশের মনে পড়ল সত্যিই ওঁরা জানিয়েছেন। আস্তে মাথা নাড়লেন, ‘হ্যাঁ।’

‘আপনি তখন ভীষণ অসুস্থ। স্ট্রোক হবার পর ডাক্তাররা বাড়ি থেকে বেরুতে দিচ্ছিলেন না। আন্দোলনটা যখন ফেল করল তখন ভেবেছিলাম আপনাকে তালবনিতে নিয়ে এসে ম্যানেজমেন্টের ওপর প্রেসার দেব। কিন্তু আপনার শারীরিক অসুস্থতার কথা চিন্তা করে সাহস হয় নি। ম্যানেজমেন্ট যেখানে প্রতিজ্ঞা করেছে কারখানা খুলবে না, সেখানে আমাদের আর কী করার থাকতে পারে?’

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর নিখিলেশ বললেন, 'আমি শুনেছি এই সব কারখানার কয়েক জন শ্রমিক আত্মহত্যা করেছে।'

বিব্রতভাবে পরিমল বললেন, 'হ্যাঁ, মানে—'

স্থির দৃষ্টিতে পরিমলের দিকে তাকিয়ে নিখিলেশ বললেন, 'এক কাজ কর। বন্ধ কারখানাগুলোর মালিকদের নাম ঠিকানা আর ওয়ার্কারদের সংখ্যা আলাদা আলাদা লিস্ট করে দু-চার দিনের ভেতর আমাকে দেবে।'

সত্যজিৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'লিস্ট দিয়ে কী করবেন?'

'হাত-পা গুটিয়ে বসে তাকলে তো চলবে না। হাজার হাজার মানুষের জীবন কারখানাগুলোর ওপর নির্ভর করছে। ওগুলো খোলার চেষ্টা করতেই হবে।'

'আমরা অনেক চেষ্টা করেছি নিখিলেশদা—'

'আমিও একবার করে দেখি না। পারবই যে এমন গ্যারান্টি দিচ্ছি না। কিন্তু একদিন নিজের হাতে এখানে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিলাম। তোমরা তো আছই, আমিও যে ওদের পাশে আছি, দূরে সরে যাই নি, সেটা ওদের জানানো দরকার।'

সত্যজিৎ বললেন, 'ঠিক আছে, যে লিস্টটা চাইলেন কালই দিয়ে যাব।'

এগারো

আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল।

এর মধ্যে তালবনির অনেকগুলো এলাকা ঘোরা হয়ে গেছে। পন্টুদের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে যে সব বিস্ফোরক রিপোর্ট কলকাতার কাগজগুলোতে বেরিয়েছে সে জন্য এখানকার বাসিন্দাদের অনেকেই এমন সব মন্তব্য করেছে তা যেমন অপমানজনক তেমনি কুৎসিত। তিনি চোখকান বুজে সব সহ্য করে গেছেন।

তবে এই ঘোরাঘুরির সুফলটা কিছু কিছু যে পাওয়া যাচ্ছে সেটা টের পাচ্ছেন নিখিলেশ। বেশির ভাগই মানুষই তাঁকে কাছাকাছি পেয়ে খুশি। তাদের আগের আক্রোশের ঝাঁঝ ক্রমশ অনেকটাই কমে যাচ্ছে।

যে অঞ্চলেই তিনি যাচ্ছেন সেখানকার মানুষজন অভিযোগ করছে, তারকদের জন্য তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

প্রথম দু'দিন বাদ দিলে তার পর থেকে রোজই একটা নোট-বই আর কলম নিয়ে বেরুচ্ছেন নিখিলেশ। যার যা অভিযোগ, তারিখ দিয়ে টুকে রাখছেন।

অভিযোগ কি এক-আধটা? তারকদের কাছে খুনখারাপিটা জলভাতের মতো ব্যাপার। তাদের হাতে এ পর্যন্ত জখম হয়েছে পঞ্চাশ ষাট জন, খুন হয়েছে সাতজন। বড় বিজনেসম্যান থেকে ছোট দোকানদার, সবার কাছ থেকে জোর করে নিয়মিত তোলা আদায় করে ওরা। না দিয়ে উপায় নেই। হত্যাকারীদের বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়ে কার এমন বুকের পাটা যে টুঁ শব্দটি করে। এ ছাড়া-তারকদের জন্য মেয়েদের পক্ষে সন্ধের পর একা একা রাস্তায় বেরুনো অত্যন্ত বিপজ্জনক। ওদের কমিশন না দিয়ে বড়

কোনও জমি বা বাড়ি কেনা বেচা তালবনিতে অসম্ভব।

তারকরা তালবনিতে যে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করেছে তার জন্য নিবারণ হালদারকে প্রায় সকলেই সরাসরি দায়ী করেছে। তিনি তাঁর মস্তানবাহিনীর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই কানে তোলেন না, ওদের সম্বন্ধে একেবারে চোখ বুজে থাকেন। অবশ্য অনেকে নিখিলেশকে দোষারোপ করতেও ছাড়ে নি। তিনিই যে তারকদের রাজনীতির ছাতার তলায় টেনে নিয়ে এসেছিলেন এবং তখন থেকেই যে ওরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, সেটাও তালবনির বাসিন্দারা জানিয়ে দিয়েছে।

তাঁর প্রতি মানুষের আস্থা বা বিশ্বাস যে বাড়ছে, সেটা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলেন নিখিলেশ। তারকদের একদা প্রশ্রয় দিলেও তিনি যে এখন আর ওদের মাত্রাছাড়া সন্ত্রাস সহ্য করবেন না সবাই সেটা টের পাচ্ছিল।

চরম দুঃসময়ে মানুষ নিজেকে বাঁচাবার জন্য হাতের কাছে যা পায় তাই আঁকড়ে ধরে। এতদিন তারা ভয়ে কুঁকড়ে ছিল, নিখিলেশকে পেয়ে তাদের মনোবল হঠাৎ বেড়ে গেছে।

খবর পাচ্ছিলেন, ভৌমিকদের মতো আরও সতেরো আঠারো জনকে তাদের জমি বেচার জন্য শাসাচ্ছে তারকরা। তবে তারা কারা এখনও জানতে পারেন নি।

একদিন রাত্তিরে দল বেঁধে কয়েকজন এসে হাজির। এঁদের অনেককে ভাল করেই চেনেন নিখিলেশ। বিশেষ করে যদুনাথ কুণ্ডুকে।

যদুনাথ এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় আড়তদার। মেঘাই নদীর ধার ঘেঁষে তাঁর বেশ কয়েকটা ধানচাষের গো-ডাউন আছে। সাতষট্টি আটষট্টির মতো বয়স। গোলগাল, ভারী চেহারা। পরনে সাধারণ ধুতি আর হাফ-হাতা পাঞ্জাবি। চোখে নিকেলের গোলাকার চশমা, বুক পকেটে সাবেক কালের মতো সরু ফিতেয় বাঁধা পকেট-ঘড়ি। চালচলন খুবই সাদাসিধে। কথায়বার্তায় চালচলনে অত্যন্ত বশংবদ, বিনীত ভাব। ওঁকে দেখামাত্র তৃণাদপি সুনীচ কথাটা মনে পড়ে যায়। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, লোকটা একজন অতি ধুরন্ধর ব্যবসাদার এবং বিপুল অর্থের মালিক।

যদুনাথ তাঁর সঙ্গীদের প্রতিনিধি হিসেবে বললেন, 'আমরা ভীষণ বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি স্যার। আমাদের রক্ষা করুন। ভয়ে আমাদের চান খাওয়া, রাতের ঘুম, সব গেছে। আপনি ছাড়া আমাদের আর কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

লোকটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলে। হয়তো মনে করে বেশি করে বললে বক্তব্যের গুরুত্ব বাড়ে। সে যাই হোক, ওঁরা কী উদ্দেশ্য এসেছেন সেটা ঠিকই বুঝতে পেরেছেন নিখিলেশ। তবু জিজ্ঞেস করেছেন, 'আপনাদের সমস্যাটা কী?'

যদুনাথ বললেন, 'তারকরা আমাদের ওপর ভীষণ জুলুম শুরু করেছে স্যার।'

নিখিলেশ একটু বাজিয়ে দেখার জন্য বললেন, 'ওরা তো নিবারণ হালদারের লোক। ওঁর সঙ্গে দেখা করে সব বলুন।'

তারকরা যে একদা নিখিলেশের আশ্রয়েই ছিল সেটা আর বললেন না যদুনাথ। খুবই চতুর লোক। যা বললেন তা এইরকম, 'বহুবার গেছি কিন্তু যাওয়াই সার। নিজের পার্টির

মস্তানদের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বার করে দিলেন। এখন আপনি ছাড়া আমাদের আর গতি নেই।'

নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন আমি আপনাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারি?'

যদুনাথ বললেন, 'শুনেছি, ক'দিন আগে আপনি নীলকমল ভৌমিকদের বাড়ি গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।'

'বলে এসেছেন, তারকদের ভয়ে ওঁরা যেন জমি না বেচেন। তারকরা জোরাজুরি করলে আপনার নাম করতে বলেছেন।'

খবরটা এত দ্রুত সারা তালবনিতে চাউর হয়ে যাবে, ভাবতে পারেন নি নিখিলেশ। বললেন, 'হ্যাঁ, বলেছি।'

যদুনাথ বললেন, 'এতে খুব কাজ হয়েছে স্যার। তারকরা নীলকমল বাবুদের বাড়ি গিয়ে আগের মতো ঝামেলা করছে না। আপনার জন্যে ভৌমিকদের জমিটা হাতছাড়া হতে হতে হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই বেঁচে যাবে।'

নিখিলেশ বুঝতে পারছিলেন, যদুনাথ কুণ্ডু এতক্ষণ যা বললেন তা ভূমিকা মাত্র। এবার আসল প্রসঙ্গটা শুরু হবে। তিনি উৎসুক চোখে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

যদুনাথ গলা খাঁকরে তাঁর সঙ্গীদের দেখিয়ে বললেন, 'এঁদের আর আমার কিছু ভাল জমির ওপর শনির দৃষ্টি পড়েছে। গলায় বন্দুকের নল ঠেকিয়ে তারকরা ওগুলো বিক্রি করার জন্যে ভীষণ চাপ দিচ্ছে। ওই সব জমির এখন যা দাম তার সিকিভাগও দিতে চাইছে না। ভেবে দেখুন স্যার, আমরা এখানে কী অবস্থায় আছি।'

নিখিলেশ এবারও চুপ করে রইলেন।

যদুনাথ হাতজোড় করে কাতর স্বরে বলতে লাগলেন, 'স্যার, আপনি আমাদের সহায় না হলে জমিগুলো কিছুতেই রক্ষা করতে পারব না। দয়া করে একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।'

নিখিলেশ বললেন, 'নিশ্চয়ই আপনাদের সাহায্য করব। আপাতত একটা কাজ করুন।'

'কী করতে হবে বলুন—'

'তারকরা আবার জমির জন্যে প্রেসার দিতে এলে নীলকমল বাবুদের মতো বলবেন আমি আপনাদের জমি বেচতে নিষেধ করেছি।'

যদুনাথ কুণ্ডুর মুখচোখ কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে হল, দুর্ভাবনা কিছুটা কাটিয়ে উঠেছেন। বললেন, 'আপনার নাম করে যাতে ওদের ঠেকাতে পারি, সেই অনুমতি নিতেই এসেছিলাম। কী ভীষণ চিন্তার মধ্যে যে আছি!'

নিখিলেশ বললেন, 'অত নিশ্চিন্ত হবেন না কুণ্ডুমশাই। তারকরা খুব জঘন্য টাইপের ক্রিমিনাল। সাবধানে থাকবেন।'

'যদি হামলা করতে আসে, আপনার কাছে কিন্তু ছুটে আসব স্যার।'

'নিশ্চয়ই আসবেন।'

যদুনাথরা যেদিন এসেছিলেন তার দিন তিনেক পর তারকদের ফোন পেলেন নিখিলেশ। নিজের নামটা জানিয়ে সে বলল, 'নমস্কার স্যার—'

নিখিলেশ বললেন, 'হঠাৎ ফোন করলে! কী চাও?'

তারক বিনীত সুরে বলল, 'এটা কী হচ্ছে স্যার?'

সে কী বলতে চাইছে পরিষ্কার বুঝতে পেরেও নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনটা?'

তারক বলল, 'আমরা জমি কেনাবেচার ব্যাপারে দুই পার্টিকে হেল্প করে দুটো পয়সা পাই। আপনি কেন ঝুটমুট ঝামেলা করছেন!'

তারকের দুই পার্টি মানে জমির ক্রেতা এবং বিক্রেতা। তার মুখে ঝামেলা শব্দটা শুনে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয় নিখিলেশের। শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠে আসে। তবু নিজেকে সংযত রেখে গম্ভীর গলায় বলেন, 'করতাম না, যদি বুঝতাম জমির মালিকেরা নিজেদের ইচ্ছায় ল্যান্ড বেচতে চাইছে।'

'স্যার, একটা কথা তা হলে বলি?'

'কী?'

তারক বলতে লাগল, 'ওই নীলকমল ভৌমিক, যদুনাথ কুণ্ডু, মতিউর রহমান, এমনি আরও অনেকের প্রচুর জমি বছরের পর বছর ফালতু পড়ে আছে। নিজেরা কিছু করবে না; অন্যদেরও কিছু করতে দেবে না। আর—'

তারকের কথার মধ্যেই নিখিলেশ বলে উঠলেন, 'নিজেদের জমি যদি ওরা ফেলে রাখে, কারও কিছু বলার নেই। এই নিয়ে ওদের ওপর চাপ দেওয়া ঠিক নয়।'

তারক বলল, 'আমার কথা শেষ হয় নি স্যার। সবটা আগে শুনে নিন।'

নিখিলেশ উত্তর দিলেন না।

তারক বলতে লাগল· 'বেশ কিছু লোক আমাদের বলেছে, ওই জমিগুলো পেলে সুপার মার্কেট বানাবে, ইংলিশ মিডিয়ম স্কুল করবে, ফ্ল্যাট বাড়ি তুলবে। এতে কত লোকের উপকার হবে, আপনিই ভেবে দেখুন। তাই —'

'তাই জমি বেচার জন্যে মালিকদের ভয় দেখাচ্ছ?'

'আপনাকে ভুল খবর দেওয়া হয়েছে স্যার। আমরা চাপও দিই নি, ভয়ও দেখাই নি। শুধু রিকোয়েস্ট করেছি।'

নিখিলেশ বললেন, 'বন্দুক পিস্তল নিয়ে কেউ কারও কাছে রিকোয়েস্ট করতে যায় না।'

তারক খানিক চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'স্যার, আমি একটা ব্যাপার কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছি না —'

'কী ব্যাপার?'

'আপনি বিরাট লিডার। সারা দেশের লোক আপনাকে চেনে। আপনাকে দেখলে স্যালুট করে। আমাদের ছোটখাট কেসে আপনার মাথা ঘামানো কি ঠিক হচ্ছে?'

'আমার পক্ষে কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক — এ নিয়ে তোমার উপদেশের

প্রয়োজন নেই।'

তারক বলে, 'একটা কথা আপনি একেবারে বুলে গেলেন স্যার —' তার গলায় আগের মতোই বিনয় এবং বশংবদ ভঙ্গি।

নিখিলেশ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ভুলে গেছি?'

'কয়েক মাস আগে পর্যন্ত আমি আর আমার বন্ধুরা আপনার জন্যে জান বাজি করে খেটেছি। দুটো পয়সা যদি পাই, কেন বাগড়া দিচ্ছেন স্যার?'

অর্থাৎ একসময় তাঁর হয়ে ভোটের কাজ করেছে বলে তারকরা যা করবে চিরকাল তা মুখ বুজে মেনে নিতে হবে নিখিলেশকে। তাঁর মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। কঠোর গলায় বলেন, 'একটা কথা শুনে রাখো, তালবনির জমি কেনাবেচার ব্যাপারে তোমাদের জবরদস্তি আমি কোনওভাবেই বরদাস্ত করব না।'

'স্যা..., আপনিও শুনে রাখুন, ভৌমিকদের, কুণ্ডুদের, মতিউর রহমানদের জমি বেচতেই হবে। কেউ ওদের বাঁচাতে পারবে না।' এতক্ষণ নরম সুরে, নিখিলেশকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে কথা বলছিল তারক। এবার তার গলার স্বর উগ্র শোনাল।

একটা অ্যান্টি-সোসাল মস্তানের সীমাহীন স্পর্ধায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন নিখিলেশ। ওর এত বড় সাহস যে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে! অসহ্য রাগে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'তারক!' কিন্তু ওধার থেকে সাড়া পাওয়া গেল না। তারক লাইন কেটে দিয়েছে।

ধীরে ধীরে টেলিফোন নামিয়ে রেখে অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলেন নিখিলেশ। প্রচণ্ড উত্তেজনায় তাঁর সারা শরীর কাঁপতে লাগল। ক'দিন ধরেই মনে হচ্ছিল, তারকদের সঙ্গে একটা সংঘাত ঘটবে। সেটা অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

বারো

আজ আর বাইরে বেরোন নি নিখিলেশ। ক'দিন আগে এখানকার বন্ধ কল-কারখানার তিরিশ জন মালিককে চিঠি লিখেছিলেন, তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে যোগেন মাস্টারের বাড়ি আসেন। একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে চান।

নিখিলেশ আরও লিখেছেন, তিনি নিজেই আলাদা আলাদাভাবে সবার সঙ্গে দেখা করতেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ভীষণ ভেঙে গেছে। এদিকে তালবনিতে প্রচুর কাজ নিয়ে এসেছেন। সে সব সামলে তিরিশ জায়গায় তিরিশ জন মালিকের বাড়িতে ছোটাছুটির ধকল তাঁর ভঙ্গুর শরীর সহ্য করতে পারবে না।

এখন সাড়ে আটটার মতো বাজে।

স্নান করে এবং ব্রেকফাস্ট চুকিয়ে যোগেন মাস্টার বেরিয়ে গেছেন। শিবতলার ওদিকে তাঁর কী একটা জরুরি কাজ আছে। সেটা সেরে সোজা স্কুলে চলে যাবেন। আজ আর টুইশনি নেই। স্কুল ছুটির পর বিকেলে বাড়ি ফিরে আসবেন।

নিখিলেশেরও সকালের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। নিজের ঘরে বিছানায় আধশোওয়া

হয়ে তিনি স্থানীয় 'তালবনি সমাচার' পড়ছিলেন। কাগজওলা রোজ খুব ভোরে ওটা দিয়ে যায়।

কারখানার মালিকদের আজ এগারোটা নাগাদ আসতে লিখেছেন নিখিলেশ। তাঁর চিঠির উত্তর ওঁরা দেন নি বা ফোন টোনও কেউ করেন নি। তবু আশা করছেন, নির্দিষ্ট সময়েই ওঁরা আসবেন।

আপাতত হাতে বেশ খানিকটা সময় আছে। কাগজ পড়া হয়ে গেলে তালবনির বাসিন্দারা বিভিন্ন বিষয়ে যে সব লিখিত অভিযোগ করেছে সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে দেখবেন। এবং এ সম্বন্ধে কী করা যায় তার একটা নোট তৈরি করবেন। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কিছু কিছু প্রতিকারেরও চেষ্টা করতে হবে।

কাগজে তেমন চমকপ্রদ কোনও খবর নেই। তিনি আসার পর প্রথম প্রথম বড় বড় হরফে হেডিং দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে চাঞ্চল্যকর সব রিপোর্ট বেরুচ্ছিল। আজও ভেতর দিকের পাতায় ছোট একটা লেখা বেরিয়েছে। তবে সেটা খুবই সাদামাঠা। গতকাল তিনি তালবনির কোন কোন অঞ্চলে ঘুরে কী করেছেন তার বিবরণ দিয়ে আধ কলমের একটা প্রতিবেদন।

এখানকার লোকজনের অভিযোগগুলো একটা কভার ফাইলের ভেতর গুছিয়ে রেখেছেন নিখিলেশ। কাগজ পড়া শেষ হলে তিনি যখন সেটা খুলতে যাবেন, সেই সময় বাইরে কার গলা শোনা গেল, 'নিখিলেশদা— নিখিলেশদা—'

'কে?' নিখিলেশ সাড়া দিলেন। ফাইল খোলা আর হল না।

'আমি অরিজিৎ—' বলতে বলতে উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় উঠে সোজা দরজার সামনে চলে এল অরিজিৎ মাইতি, 'তালবনি সমাচার'-এর সম্পাদক।

হঠাৎ নিখিলেশের মনে পড়ে গেল, ক'দিন আগে অরিজিৎ ফোন করেছিল। তিনি তখন বাড়িতে ছিলেন না। আরতিকে জানিয়ে দিয়েছিল শীগ্‌গির এসে একদিন দেখা করবে। কিন্তু আসে নি। হয়তো কোনও কারণে আটকে গিয়েছিল।

নিখিলেশ বললেন, 'এস, এস—' এই ছেলেটিকে, ছেলে অবশ্য এখন আর নেই অরিজিৎ, বয়সের দিক থেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে গেছে, খুবই পছন্দ করেন তিনি। আবার যোগেন মাস্টারের মতো স্পষ্টভাষিতার জন্য তাকে যথেষ্ট সমীহও করেন। কিন্তু আজ বেশ ভয়ই লাগছে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে যে স্ক্যান্ডাল রটেছে তাতে খবরের কাগজের লোক সম্পর্কে তাঁর মনে রীতিমত আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

অরিজিৎ ঘরে এসে একটা চেয়ার টেনে এনে নিখিলেশের খাটের কাছে জাঁকিয়ে বসল। বলল, 'ক'দিন আগে ফোন করেছিলাম নিখিলেশদা—'

নিখিলেশ বললেন, 'জানি। তারপর থেকে একেবারে তটস্থ হয়ে আছি। এতদিন আসো নি কেন?'

'জয়ার শরীরটা হঠাৎ খুব খারাপ হয়েছিল। চেক-আপের জন্যে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলাম। তিন দিন ওখানে থাকতে হল। তাই—'

জয়া অরিজিতের স্ত্রী। চমৎকার মেয়ে। ওকেও খুব স্নেহ করেন নিখিলেশ। বললেন,

'কী হয়েছিল জয়ার?'

'এই গাইনি প্রবলেম—'

'এখন কেমন আছে?'

'অনেকটা ভাল। তবে কাঁড়ি কাঁড়ি ক্যাপসিউল খাচ্ছে। তা ছাড়া দু বেলা ইঞ্জেকশান চলছে। মাসখানেক এরকম চলবে।'

অরিজিতের এক ছেলে, এক মেয়ে। সোনু আর রিনি। নিখিলেশ তাদের কথা জিজ্ঞেস করলেন।

অরিজিৎ বলল, 'সোনু এবার হায়ার সেকেন্ডারি দেবে। রিনি ক্লাস টেনে পড়ছে।'

নিখিলেশ বললেন, 'আরে বাবা, অনেক বড় হয়ে গেছে। দু'জনকে কত ছোট দেখেছিলাম!'

অরিজিৎ হাসল, 'সময় নিখিলেশদা। দেখতে দেখতে কতগুলো বছর কেটে গেল।'

'রাইট।'

একটু নীরবতা।

এর মধ্যে আরতি চা দিয়ে গেছেন। ওঁকে কিছু বলতে হয় না। নিখিলেশের কাছে কাউকে আসতে দেখলে তক্ষুনি চা বসিয়ে দেন।

কাপে হালকা একটা চুমুক দিয়ে একসময় নিখিলেশ বললেন, 'আজকাল ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াবার জন্যে সর্বক্ষণ প্রস্তুত হয়েই আছি। এবার তোমার তোপ দাগতে শুরু কর।'

অর্থাৎ খবরের কাগজের লোকেরা যে তাঁকে নানাভাবে নাজেহাল করছে এবং সামনাসামনি দেখা হলে আরও নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে, সেই কথাটাই মজার ভঙ্গিতে বললেন নিখিলেশ।

অরিজিৎ এমনিতে সাংবাদিক হিসাবে অত্যন্ত তুখোড়। ছুরির ফলার মতো শাণিত বুদ্ধি। পড়াশোনাও করেছে প্রচুর। তবে স্বভাবে একটু ফাজিল ধরনের। এই মুহূর্তে অবশ্য ফাজলামোর ধার দিয়েও গেল না। বেশ গম্ভীর মুখে বলল, 'আমি আপনাকে ফায়ার করতে এখানে আসি নি নিখিলেশদা।'

অরিজিতের চোখে চোখ রেখে নিখিলেশ বললেন, 'তা হলে কী জন্যে এসেছ?'

প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে অরিজিৎ বলল, 'কলকাতার কাগজগুলোতে, এমনকি আমাদের 'তালবনি সমাচার'-এও আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু বেরিয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি মন্ত্রী বা এম এল এ হবার আগে আপনি যেমন ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনি অনেস্ট আছেন।' একটু চুপ করে থেকে বিষণ্ণ গলায় বলল, 'আই ফিল ফর ইউ।'

এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না নিখিলেশ। অরিজিতের আন্তরিকতা তাঁর বুকের ভেতরকার কোনও একটা সূক্ষ্ম তারে যেন মৃদু ঝংকার তুলে গেল। যোগেন মাস্টার বা আরতি ছাড়া বাইরের আর কেউ এভাবে তাঁকে বলে নি। খবরের কাগজ থেকে শুরু করে সবাই তাঁর সততা সম্বন্ধে সন্দিহান। প্রায় সকলেরই ধারণা, ক্ষমতা হাতে পাওয়ার

পর তাঁর নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে, তিনি লোভী হয়ে উঠেছেন, ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করেছেন।

কৃতজ্ঞ, অভিভূত নিখিলেশ গভীর দৃষ্টিতে অরিজিতের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অরিজিৎ বলতে লাগল, 'এবার আপনি তালবনিতে আসার পর সাধারণ মানুষের কাছে যখন যেতে লাগলেন তখন অনেকেই ভেবে নিয়েছিল, পরের ইলেকশানের চিন্তা মাথায় নিয়ে জন-সংযোগ করছেন। আমার কিন্তু তা একেবারেই বিশ্বাস হয় নি।'

শ্বাসরুদ্ধের মতো নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ভেবেছিলে তুমি?'

অরিজিৎ বলল, 'ভেবেছিলাম নিখিলেশ মজুমদার শেষ বয়েসে তাঁর পলিটিক্যাল রুটে ফিরে যেতে চাইছেন। অ্যাম আই কারেক্ট?'

তাকিয়েই ছিলেন নিখিলেশ। বললেন, 'ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট।'

'মানুষের কাছে একজন সৎ রাজনৈতিক নেতার অনেক দায়বদ্ধতা থাকে। কেননা মানুষই তাকে নেতা তৈরি করে, তার ইমেজ ব্রাইট করে তোলে। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার যদি কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে পিপলের কাছে জবাবদিহি করতে সে বাধ্য। এটা আপনি মানেন?'

'নিশ্চয়ই মানি।'

'ছেলেমেয়ের জন্যে আপনার পুরনো ইমেজ অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে নিখিলেশদা। লস্ট গ্লোরি ফিরে পেতে গেলে জনগণের কাছে গেলেই শুধু চলবে না।'

'কী করতে হবে তা হলে?'

'কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে।'

'কী পরীক্ষা?'

তক্ষুনি উত্তর দিল না অরিজিৎ। কিছুক্ষণ বাদে দ্বিধান্বিতভাবে বলল, 'সেটা বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না।'

তীব্র আগ্রহ বোধ করছিলেন নিখিলেশ। বললেন, 'হেজিটেট ক'রো না। আমি জানি তুমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। যা বলবে সেটা আমার ভালর জন্যেই—'

অরিজিৎ বলল, 'নিখিলেশদা, আমি চাইব আপনি কাগজে একটা স্টেটমেন্ট বা ইন্টারভিউ দিয়ে জানিয়ে দিন, আপনার সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট যেন সি বি আই এনকোয়ারি শুরু করে। থরোলি ইনভেস্টিগেট করে দেখুক আপনি সত্যিই অপরাধী কিনা। বলবেন, যদি অপরাধ প্রমাণিত হয়, যে শাস্তি প্রাপ্য তা মাথা পেতে নেবেন এবং জীবনে রাজনীতির সঙ্গে কোনও রকম সংস্রব রাখবেন না।'

নিখিলেশ চমকে উঠলেন। পরক্ষণে মনে হল, হারানো মর্যাদা, মানুষের বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা ফিরে পেতে হলে জন-সংযোগ ছাড়াও এটাই হল আসল উপায়। সি বি আই তদন্ত হলে তাঁর সম্বন্ধে অস্বস্তিকর কিছুই পাওয়া যাবে না। তিনি সসম্মানে বেরিয়ে আসতে পারবেন। মানুষের কাছে তাঁর ইমেজের দীপ্তি বহুগুণ বেড়ে যাবে।

অরিজিৎ ফের বলল, 'অবশ্য এটা করলে অন্য দিক থেকে দুশ্চিন্তার কারণ আছে। শুধু দুশ্চিন্তা নয়, বিরাট সমস্যাও দেখা দেবে।'

নিখিলেশ অরিজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের সমস্যা?'

'ইনভেস্টিগেশন হলে আপনার ছেলেমেয়েরা কিন্তু রেহাই পাবে না।' অরিজিৎ বলতে লাগল, 'পুরনো ইমেজ ফিরে পেতে হলে পারিবারিক অশান্তি কিন্তু অনিবার্য।'

অরিজিৎ থামে নি, 'অনেক সময় কিছু পেতে হলে কিছু হারাতে হয় নিখিলেশদা। ফ্যামিলি লাইফ, স্ত্রী সন্তান, এ সব খুব বড় ব্যাপার। কিন্তু সারা জীবন যে আদর্শের জন্যে যুদ্ধ করে গেলেন সেটাও কম ইমপর্টান্ট নয়।'

নিখিলেশ ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন। বলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ অরিজিৎ। আমি বেশ কিছুদিন ধরেই এ সম্বন্ধে চিন্তা করছি। তবু আরেকটু ভাবতে দাও।'

অরিজিৎ বুঝতে পারছিল, এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব সহজ নয়। মনস্থির করতে খানিকটা সময় লাগবে। বলল, 'ঠিক আছে, ভাবুন। তবে —'

'তবে কী?'

'আমার একটা আর্জি আছে।'

'কিসের আর্জি?'

অরিজিৎ বলল, 'যদি সত্যিই ঠিক করেন নিজের বিরুদ্ধে সি বি আইকে দিয়ে এনকোয়ারি করাবেন, সেই খবরটা যেন আমি প্রথম পাই। আপনার সঙ্গে আমার এতদিনের রিলেশান। সবার আগে খবরটা আমাদের কাগজে ছাপা হোক, দাবি বলুন বা আবদারই বলুন, এটা নিশ্চয়ই আমি করতে পারি।'

নিখিলেশ হাসলেন, 'প্রফেশানের ব্যাপারটা এক সেকেণ্ডের জন্যেও বুঝি ভুলতে পার না? সব সময় অন্য সকলের আগে সেনসেশানাল খবর চাই, তাই না?'

অরিজিৎও হেসে হেসে বলে, 'কী করি বলুন; আমি আউট অ্যান্ড আউট একজন প্রফেশানাল তো। এত বছর ধরে খবরের কাগজে ঘষতে ঘষতে ব্যাপারটা একেবারে ব্লাডের ভেতর ঢুকে গেছে।'

নিখিলেশ বললেন, 'আর তেমন কোনও খবর না থাকলে বুদ্ধি খাটিয়ে তৈরিও করে নাও।'

'কিরকম?'

'এই যে আমাকে দিয়ে সি বি আই এনকোয়ারির ব্যাপারটা কবুল করিয়ে নিতে চাইছ। আমি রাজি হলেই কাগজে ছেপে দেবে।'

অরিজিৎ হকচকিয়ে গেল, 'না নিখিলেশদা, না। বিশ্বাস করুন আপনার ইমেজের জন্যে সি বি আই-এর কথা বলেছিলাম। খবরের কাগজের ব্যাপারটা সেকেন্ডারি। আপনার সম্বন্ধে আমার কতটা শ্রদ্ধা তা কি আপনি জানেন না?'

অরিজিতের একটা হাত ধরে গভীর গলায় নিখিলেশ বললেন, 'জানি অরিজিৎ, ভাল করেই জানি। যোগেনবাবু আর তুমি ছাড়া আমার শুভাকাঙ্ক্ষী খুব বেশি নেই। তোমাকে একটু ঠাট্টা করছিলাম।'

অরিজিতের মুখের চেহারাটা স্বাভাবিক হয়ে এল। কিছু বলল না সে।

নিখিলেশ এবার বললেন, 'খবরটা তোমার কাগজেই প্রথম ছাপা হবে। আর ইউ

হ্যাপি?'

কৃতজ্ঞতার সুরে অরিজিৎ বলল, 'থ্যাংক ইউ নিখিলেশদা। মেনি মেনি থ্যাংকস। এখন তা হলে উঠি।'

প্রায় ঘন্টাদেড়েক কাটিয়ে সাড়ে দশটায় চলে গেল অরিজিৎ। সময়টা বেশ ভালই কাটল নিখিলেশের। একজন ঝানু সাংবাদিক হলেও চটচটে কেচ্ছার খোঁজে সে তাঁর কাছে আসে নি। আজকালকার চালু প্রথা অনুযায়ী খবরের কাগজগুলো চমকপ্রদ ঘটনার পেছনে অনবরত হন্যে হয়ে ঘুরছে। কাগজ চালানোর জন্য ইদানীং চমক বা চাঞ্চল্যটা ভীষণ জরুরি। কিন্তু নিখিলেশকে অরিজিৎ সেনসেশানের রগরগে মশলা হিসেবে ব্যবহার করতে চায় না। সে তাঁর সত্যিকারের শুভার্থী। চিন্তাভাবনার দিক থেকে ওর সঙ্গে তার কোথায় যেন মিল রয়েছে। টিউনিং বলে একটা কথা আছে, সেটা অরিজিতের সঙ্গে তাঁর ভালই জমে। সি বি আই-এর ব্যাপারটা তিনি আগেই ভেবেছেন। আশ্চর্য, সেই একই পরামর্শ দিয়ে গেছে অরিজিৎ।

অরিজিৎ চলে যাবার পর আধ ঘন্টা কেটে গেল। এখন ওয়াল ক্লকে কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা। কিন্তু কল-কারখানার মালিকদের কেউ এসে পৌঁছন নি। পরিমল এবং সত্যজিতেরও এগারোটাতেই আসার কথা। কেননা এ অঞ্চলে পার্টির কৃষক সংগঠন এবং ট্রেড ইউনিয়ন, দুটোই ওঁরা দেখেন। কল-কারখানার ব্যাপারে ওঁদের মতামতের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু তাঁরাও আসেন নি।

নিখিলেশ খুবই নিয়মানুবর্তী। তাঁর খাওয়া দাওয়া ঘুম বিশ্রাম বা কাজ, সব কিছুই ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। নিখিলেশের কাছে এগারোটা মানে এগারোটাই — সাড়ে এগারোটা বা বারোটা নয়। ঢিলেঢালা ভাব তিনি আদৌ পছন্দ করেন না।

এগারোটা দশে সত্যজিৎ আর পরিমল এসে হাজির। নিখিলেশের নিয়ম শৃঙ্খলা এবং সময়ানুবর্তিতার কথা তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন। কাঁচুমাচু মুখে জানালেন, যে সাইকেল রিকশায় চড়ে আসছিলেন সেটার চেইন বার বার খুলে যাচ্ছিল। চেইনটা ঠিকমতো লাগানোর জন্য রিকশাওলাকে গাড়ি থামাতে হচ্ছিল। সে জন্য পৌঁছুতে দেরি হয়ে গেছে।

কৈফিয়ৎটা শুনেই গেলেন নিখিলেশ। কোনও উত্তর দিলেন না।

সময় কাটতে লাগল।

সাড়ে এগারোটা, বারোটা পেরিয়ে একটা বাজতে চলল কিন্তু আমন্ত্রিতদের কারও দেখা নেই। অথচ নিখিলেশ যখন মন্ত্রী ছিলেন, ডাকতে হ'ত না, তিনি তালবনি এলে কারখানা-মালিকরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসত। মনটা হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে যায় নিখিলেশের।

এর মধ্যে স্নানের জন্য বারকয়েক তাড়া দিয়ে গেছেন আরতি। উঠি উঠি করেও ওঠেন নি নিখিলেশ। তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন, কারখানা-মালিকদের জন্য একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।

একটা বাজতে যখন মিনিট তিনেক বাকি সেই সময় একটি লোক একখানা চিঠি নিয়ে হাজির হল। টাইপ-করা চার লাইনের চিঠি। জানানো হয়েছে, অনিবার্য কারণে আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীরা আপনার সঙ্গে আজ দেখা করতে না পারার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। বন্ধ কারখানার বিষয়ে বর্তমান এম এল এ মাননীয় নিবারণ হালদার এবং শ্রমমন্ত্রী মাননীয় মনোরঞ্জন চাকলাদার মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছে। আপনার সহায়তার প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে সাক্ষাৎ করব। আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন। বিনীত —

চিঠির নিচে তিনজনের সই আছে। রাজনাথ আগরওয়াল, সূরযনারায়ণ জৈন এবং প্রাণগোপাল বসাক।

চিঠিটা পড়ার পর নিঃশব্দে সত্যজিতকে দিলেন নিখিলেশ। সত্যজিতের হাত ঘুরে সেটা গেল পরিমলের কাছে। দু'জনের মুখ শক্ত হয়ে উঠল।

সত্যজিৎ একসময় বললেন, 'আগে এরা আমাদের কাছে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকত। এখন নিবারণ হালদারদের কাছে গিয়ে ভিড়েছে।'

পরিমল ফ্যাকাসে একটু হেসে বললেন, 'এটাই নিয়ম সত্যজিৎ। ওরা এখন পাওয়ারে। লোক তো ওদিকেই ভিড়বে।'

সত্যজিৎরা আর বসলেন না। কারখানা-মালিকদের কেউ যখন আসবেনই না তখন আর অপেক্ষা করার মানে হয় না। তা ছাড়া নিখিলেশের স্নান-খাওয়া এবং বিশ্রাম আছে। আরও দেরি হলে তাঁর শরীর খারাপ হবে।

সত্যজিৎরা চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন নিখিলেশ। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। তিনজন কারখানা-মালিক তবু লোক পাঠিয়ে উত্তর দিয়েছে। অন্যেরা সেই সৌজন্যটুকুও দেখাবার প্রয়োজন বোধ করে নি। নির্বাচনে একটা পরাজয় সব কিছু ওলট পালট করে দিয়েছে।

তেরো

অন্য দিন দুপুর পর্যন্ত তালবনির রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার পর ফিরে এসে খেয়ে বিছানায় শরীর এলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে দু চোখ জুড়ে ঘুম নেমে আসে। আজ কিন্তু ঘুমোতে পারলেন না। ক'বছর আগে যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা এখানে একটা কারখানা বসাতে কিংবা শ্রমিক আন্দোলন হলে তা মিটিয়ে দেবার জন্য তাঁর কাছে ছুটে আসতেন, আজ আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও ওঁদের একজনও এসে দেখা করলেন না। এটা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানজনক। মুখ ফুটে অবশ্য তিনি এ বিষয়ে সত্যজিৎ বা পরিমলকে কিছু বলেন নি, তবে চাপা একটা কষ্ট বুকের ভেতর অদৃশ্য কাঁটার মতো বিঁধে আছে।

কলকাতার কাগজ এসে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ সেগুলো নাড়াচাড়া করেছেন নিখিলেশ কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর মানসিক অবস্থাটা কোনও কিছু খুঁটিয়ে পড়ার মতো নয়। চোখের সামনে সারিবদ্ধ ছাপা হরফগুলোর ভেতর যে নানা ধরনের দেশ বিদেশের জরুরি খবর

রয়েছে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করেন নি তিনি। খাটের পাশের নিচু সাইড টেবলে কাগজগুলো ডাঁই হয়ে পড়ে আছে।

বিকেলে সাড়ে চারটে নাগাদ বাইরে থেকে উঁচু গলার ডাক ভেসে এল, 'নিখিলেশবাবু আছেন? নিখিলেশবাবু—' ডাকের সঙ্গে অনেকের মিলিত কণ্ঠস্বরও শোনা গেল।

ধড়মড় করে উঠে পড়লেন নিখিলেশ। খাট থেকে নেমে বাইরের বারান্দায় আসতেই চোখে পড়ল অনেকগুলো যুবক, প্রায় পঁচিশ তিরিশজন, বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মধ্যে ট্রেনের সেই ছেলে দু'টি, ললিত এবং দীনেশকেও দেখা গেল। ললিতকে নিখিলেশের একেবারেই ভাল লাগেনি। অত্যন্ত চোয়াড়ে আর বদমেজাজী। কথাবার্তার ধরন জঘন্য। বয়স্ক লোককে সম্মান দিতে জানে না। লক্ষ করা গেল, ললিতের সঙ্গীদেরও কেমন একটা হিংস্র মারমুখী ভাব। ভেতরে ভেতরে খুবই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগলেন নিখিলেশ। তিনি কিছু বলার আগে ললিত বলে উঠল, 'স্যার, সেদিন ট্রেনে বলেছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করব। তাই চলে এলাম।' সঙ্গের যুবকদের দেখিয়ে বলল, 'এরাও আসতে চাইল। তাই নিয়ে এলাম। আরও অনেকের আসার ইচ্ছা ছিল। তাদের বলেছি, এখন গিয়ে ভিড় বাড়াতে হবে না। দরকার হলে পরে যাস।'

উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন নিখিলেশ।

অনেকের গলা শুনে ওধারের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন আরতি। বারান্দার এক কোণে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। এতগুলো যুবককে দল বেঁধে বাড়ির সামনে জটলা করতে দেখে তাঁর অস্বস্তি হচ্ছিল। মুখে কিছু বললেন না, শুধু সতর্কভাবে ললিতদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

নিখিলেশের চোখেমুখে খুব সম্ভব উৎকণ্ঠা ফুটে বেরিয়েছিল। সেটা লক্ষ করে ললিত বলল, 'ঘাবড়াবেন না স্যার, আমরা এখানে কোনও রকম ঝামেলা টামেলা করতে আসি নি। শুধু একটা জিনিস দেখাতে এনেছি।'

কী দেখাতে চায় ললিত? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। অস্ফুট গলায় নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী এনেছ?'

ললিতের হাতে যে দুটো মোটা কভার ফাইল ছিল, আগে নজরে পড়ে নি। সে দুটো উঁচুতে তুলে সে বলল, 'এগুলো স্যার—'

অবাক হয়ে নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী আছে ফাইলগুলোর মধ্যে?'

প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে ললিত বলল, 'আমরা ভেতরে আসতে পারি?'

ছোকরাগুলোর মতলব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একসঙ্গে সবাই ঢুকে পড়ুক, নিখিলেশ তা চাইছেন না। বললেন, 'তুমি একা আসতে পার—'

'অল রাইট স্যার —'

সঙ্গীদের দাঁড়িয়ে থাকতে বলে কাঠের আগড় ঠেলে উঠোন পেরিয়ে সোজা নিখিলেশের কাছে চলে এল ললিত। মোটা ফাইল দুটোর বাঁধন খুলে বলল, 'দুই ফাইলে সবসুদ্ধু একশ' ছাপ্পান্নটা অ্যাপ্লিকেশনের জেরক্স কপি আছে।'

বিস্ময়টা বাড়ছিলই। নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের অ্যাপ্লিকেশন?'

'এর মধ্যেই ভুলে গেলেন স্যার! লাস্ট দুটো ইলেকশানের সময় আমরা যারা আপনার হয়ে চান-খাওয়া ভুলে, না ঘুমিয়ে ডে অ্যান্ড নাইট দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার মেরেছি, স্ট্রিট কর্নার মিটিং করেছি, ভোটার লিস্ট বানিয়ে বাড়ি বাড়ি ক্যামপেন করেছি তাদের সব্বাইকে প্রমিস করেছিলেন চাকরি দেবেন। অ্যাপ্লিকেশনও চেয়ে নিয়েছিলেন। এগুলো তার জেরক্স কপি।'

হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন নিখিলেশ। টের পেলেন গল গল করে ঘামতে শুরু করেছেন। মনে পড়ল, সত্যিই তিনি এদের কাছ থেকে চাকরির দরখাস্ত চেয়ে নিয়েছিলেন। নির্বাচনের সময় এরা তাঁর মতো একজন সৎ আদর্শবাদী জননেতার জন্য প্রাণ দিয়ে খেটেছিল। দু'বেলা টিফিন ছাড়া আর কিছুই তিনি দেন নি। নির্বাচনী প্রচারের দায়িত্বে যারা ছিল তারা ওদের টাকাপয়সা দিতে চেয়েছিল কিন্তু ওরা কিছুই নেয় নি। মনে পড়ল, অন্যান্য প্রতিশ্রুতির মতো চাকরি দেবার ব্যাপারটাও তিনি রাখেন নি। তালবনির যুবকদের ক্ষোভ হওয়া একান্ত স্বাভাবিক।

রাস্তায় যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের ভেতর থেকে একজন কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমাদের কাঁধে চড়ে দু দু'বার মিনিস্টার হয়েছেন। চাকরির আশা দিয়ে এই খচড়ামোটা না করলেই পারতেন স্যার—'

আরও দু-চারজন ভিড়ের মধ্যে থেকে নোংরা মন্তব্য ছুঁড়ে দিতে লাগল।

হাত তুলে তাদের থামিয়ে দেয় ললিত। তারপর নিখিলেশকে বলে, 'স্যার, ওদের কথায় কিছু মনে করবেন না। বছরের পর বছর বেকার বসে থাকলে সবারই মেজাজ খিঁচড়ে যায়। তখন কারও মুখ থেকে ভাল ভাল, মাখন-মাখানো বাত বেরুতে চায় না। একটা কথা শুনে রাখুন —'

রুদ্ধস্বরে নিখিলেশ জিজ্ঞেস করেন, 'কী?'

'আমাদের মতো বেকারদের ভরসা দিয়ে আর কখনও ডুবিয়ে দেবেন না। আচ্ছা চলি স্যার—'

এত সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে ভাবতে পারেন নি নিখিলেশ। তাঁর মনে হয়েছিল, ললিতের দিক থেকেই আক্রমণটা আসবে সব চেয়ে বেশি করে। কিন্তু সে-ই তাঁকে বাঁচিয়ে দিল।

হাতের কভার ফাইল দুটো নিখিলেশকে দিয়ে ললিত বলল, 'আপনার কাছে রেখে দিন—'

বিমূঢ়ের মতো নিখিলেশ বললেন, 'কী হবে এগুলো দিয়ে?'

'ফিউচারে এগুলো দেখলে, কাউকে ফলস প্রমিস করতে দশ বার চিন্তা করবেন। মনে রাখবেন, যাদের পেটে ভাত নেই তাদের কাঁধে চড়ে ইলেকশানে জিতে তাদের লাথি মেরে ফেলে দেওয়াটা ডেঞ্জারাস।'

হাতজোড় করে নিখিলেশ বললেন, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে। কোনও প্রতিশ্রুতি

দিচ্ছি না। ভবিষ্যতে যদি কখনও কিছু করার সুযোগ পাই, তোমাদের কথা আমার মনে থাকবে।'

ললিতরা আর দাঁড়াল না, সামনের রাস্তা ধরে বাঁ দিকে চলে গেল।

চোদ্দ

শুধু ভৌমিকরা বা যদুনাথ কুণ্ডুরাই না, যত দিন যাচ্ছে তালবনির আরও অনেকে যোগেন মাস্টারের বাড়ি এসে তারকদের বিরুদ্ধে নিখিলেশের কাছে নানা ধরনের অভিযোগ জানিয়ে যেতে লাগল।

নির্বাচনের রেজাল্ট বেরুবার কয়েক মাস পর প্রথম যেদিন তিনি ডাউন ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্ট থেকে তালবনির স্টেশনে নামলেন, ধিক্কার, টিটকারি, বিদ্রূপ অশ্লীল গালাগাল ছাড়া আর কিছুই জোটে নি। কিন্তু মাত্র দু সপ্তাহের মধ্যে এখানকার মানুষজনের মনোভাব যে পালটাতে শুরু করেছে তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। আসল ব্যাপারটা হল জন-সংযোগ, মাটি কামড়ে তৃণমূলে পড়ে থাকা। বিপরীতমুখী যে ঢলটা নেমেছিল সেটা এখন থমকে গেছে। আসলে সাধারণ মানুষ এককভাবে খুবই দুর্বল। ভরসা করার মতো কাউকে পেয়ে গেলে তাকেই তারা আঁকড়ে ধরে। এই ক'দিনে তাঁকে তালবনিবাসীরা যে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে।

তারক সেই যে ফোন করেছিল তার দিন তিনেক বাদে সন্ধেবেলায় যোগেন মাস্টার আর আরতির সঙ্গে বসে চা খেতে খেতে কথা বলছিলেন নিখিলেশ। সকালের দিকটায় তিনি তালবনির নানা এলাকায় যান। দুপুরে ফিরে আসার পর আর বেরোন না। দিনটা রবিবার। ছুটির দিনে যোগেন মাস্টারের টিউশন থাকে না, তাই বাড়িতেই আছেন।

যোগেন মাস্টার বলছিলেন, 'তালবনির সব এলাকা তো আপনার ঘোরা হয়ে গেছে। শুধু তালবনি টাউনটাই না, আপনার কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যে চারপাশের গ্রামগুলোও পড়ে। আমার মনে হয়, এবার আপনার ওই জায়গাগুলোতে যাওয়া দরকার।'

চায়ে হালকা একটা চুমুক দিয়ে নিখিলেশ বললেন, 'আমিও তাই ভেবে রেখেছি। দু-একদিনের ভেতর গ্রামের দিকে যাব। গ্রাম তো একটা-আধটা নয়, পঁচিশ ত্রিশটা। ভাবছি রোজ একটা করে গ্রাম ঘুরব।'

'সেই ভাল। বেশি ধকল নেওয়া ঠিক হবে না।'

একটু চাপচাপ।

তারপর যোগেন মাস্টার বললেন, 'আপনি মশাই ম্যাজিক জানেন—'

একটু অবাক হয়ে নিখিলেশ বললেন, 'কিরকম?'

'রাস্তাঘাটে আজকাল আপনার প্রশংসা শোনা যাচ্ছে। যেভাবে আপনি লোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন তাতে তারা খুব ভরসা পাচ্ছে।' যোগেন মাস্টার বলতে লাগলেন, 'আর আমি দেখতে পাচ্ছি সেই পুরনো ডেডিকেটেড, পলিটিক্যাল ওয়ার্কার নিখিলেশ মজুমদার আবার আপনার মধ্যে ফিরে এসেছে।'

যোগেন মাস্টার মানুষটা আবেগপ্রবণ নন। অত্যন্ত কাঠখোট্টা ধরনের। ভাল মন্দ যা-ই হোক না, বলেন চাঁছাছোলা ভাষায়। তাঁর এখনকার কথাগুলো নাটকের সাজানো সংলাপের মতো শোনালেও, বেশ আন্তরিক। নিখিলেশের খুব ভাল লাগল। তিনি কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বাইরে বহু মানুষের হইচই শোনা গেল। মনে হল, তারা যেন এদিকেই ছুটে আসছে।

নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

যোগেন মাস্টার উঠে বাইরের বারান্দায় চলে গেলেন। নিখিলেশ আর আরতিও বসে থাকলেন না, যোগেন মাস্টারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

রাস্তার দিক থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ জনের উত্তেজিত এক জনতা হুড়মুড় করে উঠোনে ঢুকে পড়ল। তাদের চোখে মুখে শুধু উত্তেজনাই নেই, সেই সঙ্গে আতঙ্কও।

নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাই?'

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন মাঝবয়সী ভদ্র চেহারার লোক বলে উঠল, 'আপনার কাছেই এসেছি স্যার। দয়া করে মেয়েটাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন। আপনি ছাড়া কেউ ওকে রক্ষা করতে পারবে না।' বলতে বলতে সমানে কাঁদছিল সে।

একেবারে হকচকিয়ে গেলেন নিখিলেশ। এই লোকটি কে, তার মেয়েকে কোত্থেকে উদ্ধার করতে হবে— কিছুই বুঝতে না পেরে নিখিলেশ বললেন, 'কী হয়েছে আপনার মেয়ের?'

মাঝবয়সী লোকটিই শুধু নয়, তার সঙ্গীরা সবাই সমস্বরে বলতে শুরু করল। ফলে এমন একটা চেঁচামেচির সৃষ্টি হল যাতে একটি শব্দও বোঝা যাচ্ছে না।

হাত তুলে অন্যদের থামতে বলে নিখিলেশ লোকটিকে বললেন, 'এবার বলুন।'

লোকটা কান্নাজড়ানো, ভাঙা ভাঙা গলায় যা বলল তা এইরকম। তার নাম সুধাকর বন্দ্যোপাধ্যায়। তালবনির পুব দিকে ব্যানার্জিপাড়ায় তারা থাকে। বাজারে তার কাপড়ের দোকান আছে। স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে—এই নিয়ে তার সংসার। মেয়েটি বড়, নাম করবী। তালবনি কলেজে বি. এ ফাইনাল ইয়ারে পড়ছে। বেশ কিছুদিন ধরে তরকরা তার পেছনে লেগেছে। করবী শক্ত ধরনের মেয়ে, তাই মস্তানগুলো ঠিক সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। তাই অনবরত শাসিয়ে যাচ্ছিল। আজ কলেজ করে, এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে কী সব নোট টোট টুকে সন্ধেবেলা তার বাড়ি ফেরার কথা।

সুধাকর তার দোকানে খদ্দেরদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এমন সময় খবর এল তারকরা করবীকে জোর করে একটা জিপে তুলে নিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার লোকজন সঙ্গে নিয়ে থানায় ছুটে গিয়েছিল সুধাকর। কিন্তু ওসি তারকদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই কানে তুললেন না। বললেন, প্রমাণ ছাড়া কোনও অ্যাকশন নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আসলে ওরা নিবারণ হালদারের পোষা মস্তান, থানা কিছুই করবে না। এদিকে সুধাকরের স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, ছেলেটা কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে সে নিখিলেশের কাছে ছুটে এসেছে।

সব শোনার পর নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'তারকরা যে আপনার মেয়েকে জোর

করে ধরে নিয়ে গেছে, এ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত?'

সুধাকর বলল, 'ওরা ছাড়া তালবনির আর কারও পক্ষে এমন নোংরা কাজ সম্ভব নয়।'

'করবীকে তুলে নেবার সময় কেউ তারকদের দেখেছে?'

'দেখেছে। যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে সেই জায়গাটায় মিউনিসিপ্যালিটির লাইটগুলো খারাপ হয়ে আছে অনেকদিন। অন্ধকার হলেও যারা কাছাকাছি ছিল, শরীরের কাঠামো দেখে মোটামুটি তাদের মনে হয়েছে, ওরা তারক আর তার গ্যাং না হয়ে যায় না।'

কয়েক মুহূর্ত কী ভাবলেন নিখিলেশ। মনস্থির করে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, চলুন—' উঠোনে নামতে যাবেন, পাশ থেকে যোগেন মাস্টার বললেন, 'আমিও আপনার সঙ্গে যাব।'

মুখ ফিরিয়ে নিখিলেশ বললেন, 'না। আমি চাই না, এই ব্যাপারটায় আপনি জড়িয়ে পড়ুন। যা করার আমাকেই করতে হবে।' বলে জনতার ভেতর নেমে গেলেন।

পনেরো

সুধাকরদের নিয়ে তালবনি থানায় চলে এলেন নিখিলেশ। ও সি প্রমথেশ চাকলাদারকে ওখানেই পাওয়া গেল।

প্রমথেশকে অনেকদিন ধরেই চেনেন নিখিলেশ। তাঁকে দেখে প্রথমটা চমকে উঠলেন ওসি। নিখিলেশ যে সদলে এসময় এখানে আসবেন সেটা ছিল তাঁর কাছে একেবারেই অভাবনীয়। হতভম্বের মতো কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাতজোড় করে বললেন, 'স্যার আপনি!'

নিখিলেশ বললেন, 'আসতে বাধ্য হলাম। সুধাকর ব্যানার্জির মেয়েকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। আপনি তাকে উদ্ধারের কী ব্যবস্থা করেছেন?'

প্রমথেশ ব্যস্তভাবে বললেন, 'এখনই চারদিকে লোক পাঠাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার, মেয়েটিকে খুঁজে বার করবই।' হাঁকাহাঁকি করে সাব-ইন্সপেক্টরকে তাঁর ঘরে আনিয়ে বললেন, 'দাশগুপ্ত, কিছুক্ষণ আগে সুধাকরবাবু যখন এসেছিলেন, তাঁর মুখে ওঁর মেয়ে করবীর কিডন্যাপড হবার কথা শুনেছ। এক্ষুণি বেরিয়ে পড়। তুমি একদিকে যাবে, অমরেশ আর বিপ্লবকে অন্য দিকে পাঠাবে।' নিখিলেশকে দেখিয়ে বললেন, 'স্যার নিজে চলে এসেছেন। সারা তালবনি টাউন চষে যেখান থেকে পার করবীকে খুঁজে বার করবে।'

'ঠিক আছে প্রমথেশদা—' সাব-ইন্সপেক্টর দাশগুপ্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিখিলেশ বললেন, 'আমি খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি, এতবড় একটা সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ঘটল, সুধাকরবাবু অন্তত ঘন্টাখানেক আগে এসে জানিয়ে গেছেন, অথচ কিছুই আপনারা করেননি, চুপচাপ বসে ছিলেন। স্ট্রেঞ্জ!'

প্রমথেশ মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, 'স্যার, মেয়েটিকে খোঁজার জন্যে কাকে কাকে কোথায় পাঠাব ভাবছিলাম, এই সময় আপনি এসে পড়লেন। এমন একটা সিরিয়াস ব্যাপার, আমি কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি?'

সারা জীবন রাজনীতি করছেন নিখিলেশ। মনুষ্য চরিত্রটা তিনি ভালই বোঝেন। প্রমথেশকে কম দিন দেখছেন না। পৃথিবীতে এমন চতুর সুদক্ষ মিথ্যেবাদী আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ। তিনি থানায় না এলে প্রমথেশ করবীকে খোঁজার জন্য আদৌ লোক পাঠাতেন কিনা, কিংবা পাঠালে কবে পাঠাতেন, কে জানে।

নিখিলেশ বললেন, 'আপনার বিরুদ্ধে সিরিয়াস অভিযোগ আছে প্রমথেশবাবু।'

প্রমথেশের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'কিসের অভিযোগ স্যার? আমি কি কোনও অন্যায় করেছি?

'সুধাকরবাবু যখন তাঁর মেয়ের কিডন্যাপিংয়ের কেস লেখাতে এসেছিলেন তখন সেটা নেননি কেন?'

প্রমথেশ তটস্থ হয়ে ওঠেন, 'নিতাম স্যার, কিন্তু উনি কিডন্যাপারদের নিজের চোখে দেখেননি। যারা দেখেছে তারা নাকি ওঁকে বলেছে লোকগুলোর চেহারা অনেকটা তারকদের মতো। বললেও কিডন্যাপাররা সত্যিই তারক এবং তার বন্ধুরা কিনা সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীরা শতকরা একশ' ভাগ সিওর নয়। কারণ প্লেস অফ অকারেন্সটা অন্ধকার ছিল। এই অবস্থায় কী করে এফ আই আর লিখিয়ে নিই আপনিই বলুন! যদি কোর্টে কেস ওঠে তখন প্রমাণ করতে না পারলে বিপক্ষের ল'ইয়াররা আমার জিভ বার করে ছাড়বে। বুঝতেই—'

প্রমথেশকে থামিয়ে দিয়ে সোজাসুজি তাঁর চোখের দিকে তাকান নিখিলেশ। জিজ্ঞেস করেন, 'এখানকার ওসি হিসেবে তারকদের খুব ভাল করে আপনার চেনা উচিত।'

প্রমথেশ ঢোক গিলে বললেন, 'চিনি স্যার। তবে—'

কঠোর স্বরে নিখিলেশ বলেন, 'শুনেছি, ওদের বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ লেখাতে এলে আপনারা তাকে ভাগিয়ে দেন।'

প্রমথেশ আঁতকে ওঠেন, 'না স্যার, এ সব ফলস। ডাহা মিথ্যে। আমাদের নামে বাজে অ্যালিগেশন দিয়ে ফাঁসাবার জন্যে চক্রান্ত চলছে। ওই সব বদমাইশ লোকের কথায় কান দেবেন না স্যার।'

বোঝা যাচ্ছিল, লোকটা নিবারণ হালদারের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে। নিবারণের পোষা মস্তান তারকদের গায়ে পারতপক্ষে সে একটা আঁচড়ও কাটবে না। নিখিলেশ বললেন, 'মনে রাখবেন, আপনি পাবলিক সারভেন্ট।'

'নিশ্চয়ই স্যার, সব সময় সেটা আমি মনে রাখি।'

'এখন তারকদের বিরুদ্ধে কিডন্যাপিংয়ের অভিযোগটা লিখে নিন।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রমথেশ বললেন, 'ঠিক আছে স্যার, আপনি যখন বলছেন—'

এফ আই আর লেখা হয়ে গেলে নিখিলেশ বললেন, 'করবীকে তো খুঁজে বার করবেনই, তারকদেরও অ্যারেস্ট করতে হবে।'

'দেখছি স্যার—'

'আমি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের টিচার যোগেনবাবুর বাড়িতে আছি।'

'জানি স্যার। আপনি এবার যেদিন তালবনিতে এলেন সেদিনই খবরটা পেয়েছি।'

'করবীর ব্যাপারে আমি ভীষণ দুশ্চিন্তায় থাকব। ওর কোনও খবর পাওয়া গেলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবেন। ফোন নাম্বার দিয়ে যাচ্ছি। যত রাতই হোক, আমাকে কনট্যাক্ট করবেন।'

'নিশ্চয়ই স্যার।'

'আরেকটা কথা। এই কিডন্যাপিংয়ের কেসটায় কোনও রকম গাফিলতি হলে তার ফল কিন্তু ভাল হবে না।'

'না স্যার, গাফিলতি হবে না।'

থানা থেকে বেরিয়ে সুধাকর এবং তাঁর সঙ্গীরা বলল, 'পুলিশ পুলিশের মতো করবীকে খুঁজুক। আমরাও রাতভর খুঁজব।'

ষোল

সারা রাত আদৌ ঘুম হয়নি নিখিলেশের। মাঝে মাঝে দু চোখ জুড়ে এলেও তক্ষুনি তন্দ্রা কেটে গেছে। পাছে ঘুমিয়ে পড়লে ফোনের আওয়াজ শুনতে না পান, তাই একরকম জোর করে নিজেকে জাগিয়ে রেখেছেন তিনি। কিন্তু প্রমথেশের কাছ থেকে বাঞ্ছিত ফোনটি আসেনি।

পরদিন সকালে বিছানা থেকে উঠে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে নিখিলেশ টের পেলেন রাতে ঘুমোতে না পারার কারণে চোখ জ্বালা করছে, কপালের দু পাশের শিরাগুলো সমানে লাফাচ্ছে আর সমস্ত শরীর জুড়ে কেমন যেন গভীর অবসাদ। দৈহিক কষ্ট তো আছেই, সেই সঙ্গে রয়েছে তীব্র অস্থিরতা। করবীর কোনও খবর না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই।

এদিকে যোগেন মাস্টার এবং আরতিও উঠে পড়েছিলেন। আরতির চা তৈরিও হয়ে গেছে।

বাইরের ঘরে বসে চা খেতে খেতে তিনজনের মধ্যে কথা হচ্ছিল। নিখিলেশ বলছিলেন, 'ওসি কেন যে ফোন করলেন না, বুঝতে পারছি না।'

আরতি বললেন, 'খুব সম্ভব মেয়েটির খোঁজ পাননি। তাই—'

নিখিলেশ বললেন, 'চা খেয়েই একবার থানায় যাব। প্রেসার না দিলে এখানে কাজ হবে না।'

যোগেন মাস্টার বললেন, 'মেয়েটার জন্যে আমারও ভীষণ খারাপ লাগছে। আমি আপনার সঙ্গে যাব নিখিলেশবাবু।'

নিখিলেশ বললেন, 'আচ্ছা—'

চা খাওয়া শেষ হলে ওঁরা উঠতে যাবেন, সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। সেটা তুলে নিখিলেশ 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে প্রমথেশের বিমর্ষ, ভারী গলা ভেসে এল, 'স্যার, একটা খুব খারাপ খবর আছে।'

বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল নিখিলেশের। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খবর?'

'করবীকে পাওয়া গেছে।' প্রমথেশ বলতে লাগলেন, 'মেঘাই নদীর পারে, আনকনশাস অবস্থায় পড়ে ছিল।'

শ্বাসক্রিয়া মুহূর্তের জন্য থমকে গেল নিখিলেশের। উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'করবী এখন কোথায়?'

'আমি আপনার কাছে গিয়ে সব বলছি স্যার।'

'আপনাকে আসতে হবে না। আমিই যাচ্ছি।'

যোগেন মাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নিখিলেশ। রাস্তায় একটা ফাঁকা সাইকেল রিকশা থামিয়ে উঠে বসতে বসতে বললেন, 'থানায় চল—'

খানিকটা যাবার পর দেখা গেল, উত্তেজিত বিশাল এক জনতা তাঁদের দিকেই আসছে। ওরা কাছাকাছি এলে রিকশা থেকে নেমে পড়লেন নিখিলেশ আর যোগেন মাস্টার।

জনতা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ভিড়ের সামনের দিকে যারা আছে তারা একসঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আমরা আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। করবীর সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

নিখিলেশ লক্ষ করলেন, ভিড়ের ভেতর ব্যানার্জিপাড়ার লোকগুলোও রয়েছে। এরা কাল রাত্তিরেও এসেছিল। তবে সুধাকরকে দেখা গেল না।

লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করে যা জানা গেল তা এইরকম। কাল সমস্ত রাত তারা করবীকে খোঁজাখুঁজি করেছে। শেষ পর্যন্ত সকাল বেলায় মেঘাই নদীর পারে ওকে দেখতে পায়। পরনের সালোয়ার কামিজ ছিঁড়ে ফালা ফালা। প্রায় উদোম শরীরটা ছিল রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত, কোনও হিংস্র জন্তু যেন গা থেকে খুবলে খুবলে মাংস তুলে নিয়েছে। ওর জ্ঞান ছিল না। মেঘাই নদীর পারে ফেলে যাবার আগে যে ওকে ধর্ষণ করা হয়েছে তা বোঝা গেছে।

লোকগুলো করবীকে দেখামাত্র থানায় খবর দেয়। পুলিশ এসে ওকে তুলে নিয়ে যাবার পর ওরা নিখিলেশের কাছে যাচ্ছিল, রাস্তায় দেখা হয়ে গেল।

নিখিলেশ বুঝতে পারছিলেন, করবীকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে পুলিশের কোনও ভূমিকা নেই। যা করার এই লোকগুলোই করেছে।

নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'সুধাকরবাবু এখন কোথায়?'

একটা লোক বলল, 'ওদের বাড়িতে। একেবারে ভেঙে পড়েছে।'

'খুব স্বাভাবিক। আগে আমি সুধাকরবাবুর সঙ্গে দেখা করব। তারপর থানায় যাব।'

নিখিলেশ আর যোগেন মাস্টার রিকশায় উঠে পড়লেন। রিকশা ফের চলতে শুরু করল। জনতা পিছু পিছু চলল।

ব্যানার্জিপাড়ায় এসে দেখা গেল, আচ্ছন্নের মতো বসে আছে সুধাকর। কাল করবীকে জোর করে তুলে নিয়ে যাবার খবরটা শুনে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সুধাকরের স্ত্রী। আজ সকালে কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান ফেরার পর আবার বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। দু'দিন কেঁদে কেঁদে ওদের ছেলেটার গলা ভেঙে গেছে।

সুধাকরের কাঁধে একখানা হাত রেখে অপার সহানুভূতির সুরে নিখিলেশ বললেন, 'আপনার যা ক্ষতি হয়েছে তা কোনওদিন পূরণ করা যাবে না। তবে দোষীদের যাতে শাস্তি হয় তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করব।'

সুধাকরদের বাড়ি থেকে সোজা থানায় চলে এলেন নিখিলেশ আর যোগেন মাস্টার। সঙ্গে সঙ্গে সেই জনতা।

প্রমথেশকে তাঁর চেম্বারেই পাওয়া গেল।

শশব্যস্ত প্রমথেশ উঠে দাঁড়িয়ে, হাতজোড় করে নিখিলেশকে বসতে বললেন।

নিখিলেশ বসলেন না। বললেন, 'খবর পেলাম, করবীকে আপনারা খুঁজে বার করেননি। তালবনির সাধারণ মানুষ আপনাদের কাজটা করেছে।'

মুখ শুকিয়ে যায় প্রমথেশের। শুকনো গলায় বললেন, 'আমরা, ওরা—সবাই খোঁজাখুঁজি করছিল। ওরা আগে দেখতে পেয়েছে—এই আর কি। নইলে আমরা ঠিকই বার করে ফেলতাম স্যার।'

'সে যাক। করবী এখন কোথায়? সে কি বেঁচে আছে?'

'আছে স্যার। তাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছি। পুলিশ প্রেটেকশন দেওয়া হয়েছে। কণ্ডিশন ভাল না।'

নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'তারকদের ব্যাপারে কী করেছেন?'

সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে প্রমথেশ বললেন, 'ওদের পাওয়া যাচ্ছে না স্যার।'

'আমি আপনাকে পুরো একদিন সময় দিলাম। এর ভেতর ওদের যেভাবেই হোক অ্যারেস্ট করতে হবে।'

'আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না।'

থানা থেকে সোজা হাসপাতালে। ডাক্তাররা সসম্ভ্রমে নিখিলেশকে একটা কেবিনে নিয়ে এলেন।

সেখানে ধবধবে বেডে শুয়ে আছে করবী। সারা শরীর চাদরে ঢাকা। শুধু মুখটাই যা দেখা যাচ্ছে। তার চোখদুটো বোজা। মাথায় বিরাট ব্যান্ডেজ। নাকে সরু নল ঢোকানো। ওকে ব্লাড দেওয়া হচ্ছিল।

কেবিন থেকে বাইরে বেরিয়ে নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মনে হচ্ছে—বাঁচবে?'

ডাক্তাররা জানালেন, বাহাত্তর ঘণ্টা না কাটলে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।

সতেরো

থানাকে একদিন সময় দিয়েছিলেন কিন্তু তার ভেতর প্রমথেশরা তারকদের ধরে লক অপে পুরতে পারেনি।

অগত্যা নিখিলেশ তাঁর পার্টির ছেলেদের ডাকিয়ে এনে থানার সামনে তেরপল খাটিয়ে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ধরনায় বসলেন। চারিদিক পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ। সেগুলোতে লেখা আছে 'পুলিশ-ক্রিমিনাল আঁতাত ধ্বংস হোক', 'ধর্ষণকারী, খুনী তারকদের শাস্তি চাই' ইত্যাদি।

শুধু পার্টির কর্মীরাই না, তালবনির বহু মানুষও ধরনায় নিখিলেশের পাশে এসে

বসেছে। এখানকার বাসিন্দারা চায় অ্যান্টি-সোসালদের উৎপাত চিরকালের মতো বন্ধ হোক।

রোজ সকালে যোগেন মাস্টারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা থানায় চলে আসেন নিখিলেশ, সন্ধে পর্যন্ত কাটিয়ে ফিরে যান। একজন প্রাক্তন মন্ত্রী অপরাধীদের শাস্তির জন্য থানায় ধরনা দিচ্ছেন তা কাগজে নিয়মিত বেরুচ্ছে। ফলে দারুণ এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। প্রমথেশরা যে ভয় পেয়েছেন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ধরনায় বসার পর থেকেই রোজ রাতে বেশ কিছু উড়ো ফোন পাচ্ছেন নিখিলেশ।

কেউ বলছে, 'এসব নকশাবাজি বন্ধ করুন স্যার।'

কেউ বলছে, 'যখন তারকরা আপনার হয়ে ভোটে খেটেছে তখন ওরা ছিল দেশপ্রেমী; জনসেবক—তাই না? আর এখন আপনার চোখে ক্রিমিনাল! ফাস্ট কেলাস! শালা—'

একজন তো হুমকিই দিয়েছে, 'এই সব ঝুটঝামেলা না থামালে মুশকিলে পড়বে চাঁদু। তোমার দু-দু'বার স্ট্রোক হয়ে গেছে। তেরপলের তলায় সারাদিন বসে থেকে ফায়দা হবে না, স্রেফ আরেকটা স্ট্রোক হয়ে যাবে। তার চেয়ে কলকাতায় ফিরে গিয়ে বউয়ের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাক গে। হারামজাদা, মাকড়া—'

শাসানি, বিদ্রূপ, নোংরা গালাগাল—এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে নিখিলেশের।

আজ ধরনার তৃতীয় দিন।

রোজই যোগেন মাস্টারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখিলেশ প্রথমে আসেন হাসপাতালে। করবীর খবর নিয়ে থানায় যান।

আজও এই কর্মসূচিতে কোনও হেরফের ঘটল না। হাসপাতালে এসে তিন দিন ধরে যা শুনেছেন, আজও তাই শুনলেন। করবীর জ্ঞান এখনও ফেরেনি। তার বাঁচার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ ভাগও নয়।

হাসপাতাল থেকে থানা। প্রথম দিন ধরনায় যত লোক ছিল, আজ তা পাঁচগুণ বেড়ে গেছে।

সারাদিন পর সন্ধেবেলায় রোজই বেশ কিছু লোকজন নিখিলেশকে যোগেন মাস্টারের বাড়ি পৌঁছে দেয়। বারণ করা সত্ত্বেও তারা শোনে না। রোজ ঘন্টার পর ঘন্টা ধরনা দিয়ে আবার তাঁর সঙ্গে এতটা রাস্তা কেউ যাক, এতে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেন নিখিলেশ।

আজ কিন্তু তিনি কারও কথা শুনলেন না। সন্ধের পর পার্টির একটি যুবক কর্মী রমেশকে নিয়ে রিকশায় উঠলেন। রিকশাওলা জানে তাকে কোথায় যেতে হবে। কেননা এই ক'দিন রোজই সে নিখিলেশকে যোগেন মাস্টারের বাড়ি থেকে নিয়ে আসছে এবং রাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

রিকশা চলতে শুরু করেছিল। রমেশের সঙ্গে এলোমেলো কথা বলছিলেন নিখিলেশ।

মিনিট পাঁচেক পর ওঁরা একটা নির্জন জায়গায় এসে পড়েছিলেন। এখানে রাস্তার দু ধারে প্রচুর ঝোপঝাড়, নিচে নয়ানজুলি। এ দিকটায় মিউনিসিপ্যালিটির আলোগুলো বেশ কিছুদিন ধরে খারাপ হয়ে আছে। ফলে চারপাশটা বেশ অন্ধকার।

আচমকা বন্দুকের শব্দ কানে এল নিখিলেশের। পরক্ষণে অনুভব করলেন, পিঠের ডানদিকে কিছু একটা আমূল ঢুকে গেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় আর্ত চিৎকার করে হুড়মুড় করে নিচের রাস্তায় পড়ে গেলেন তিনি।

কী ঘটে গেল, বুঝতে একটু সময় লাগল রমেশের। তারপর রিকশাওলাকে নিখিলেশের কাছে রেখে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চিৎকার করতে করতে থানার দিকে ছুটে গেল।

রিকশাওলা তার সিট থেকে দ্রুত নেমে এসে নিখিলেশের মাথাটা নিজের কোলে তুলে উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে বাবু?'

আস্তে মাথা নাড়লেন নিখিলেশ, 'হ্যাঁ।'

কতক্ষণ কেটে গেছে, কে জানে। নিখিলেশ টের পাচ্ছেন, পিঠ থেকে ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। হাত-পাগুলো যেন শরীর থেকে আলগা হয়ে খসে পড়বে। চোখ দুটো ক্রমশ বুজে আসছে।

একসময় তুমুল হইচই শুনে আস্তে আস্তে খুব কষ্ট করে তাকালেন নিখিলেশ। তাঁর চারপাশে অজস্র মানুষ। রমেশ গিয়ে খবর দিতেই-সত্যজিৎ এবং পরিমল পার্টির কর্মীদের নিয়ে ছুটে এসেছেন। শুধু কি এরাই, সারা তালবনি এখানে ভেঙে পড়েছে।

একটু পরেই জিপে করে ক'জন আর্মড গার্ড নিয়ে প্রমথেশ এলেন। এল হাসপাতালের গাড়ি।

বিশাল জনতা নিখিলেশের জন্য যেমন উৎকণ্ঠিত তেমনি ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত। তারা চিৎকার করছিল, 'এ তারকদের কাজ। ওদের শেষ করে ফেলব।'

হাসপাতালের লোকেরা একটা স্ট্রেচারে নিখিলেশকে শুইয়ে অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর নিয়ে গেল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যেতে হবে।

যাত্রা শুরু হল। সবার আগে আগে পুলিশের জিপ। তার পর অ্যাম্বুলেন্স, পেছনে উত্তাল জনসমুদ্র।

অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর শুয়ে প্রাণপণে তাকিয়ে থাকতে চেষ্টা করছেন নিখিলেশ। কিন্তু চোখের সামনে দৃশ্যমান সমস্ত কিছুই যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। তবু চেতনার শেষ অন্তরীপটি গভীর অন্ধকারে ডুবে যাবার আগে তিনি জেনে যেতে পারলেন, তাঁর সমস্ত ক্ষমতা বা শক্তির উৎস যে মানুষ, তারা আবার তাঁর কাছে ফিরে এসেছে।